প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীশ্যামল সেন

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজশাহ রোড, নয়া দিল্লী ১১০০০১
৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা ৭০০০২৯
২১ হ্যাডস রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০৬
১৭২ নইগাঁও ক্রশ রোড, বোম্বাই ৪০০০১৪

১৫ নবেম্বর, ১৯৬০

শ্রীমুদ্রণ ৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত ও সাহিত্য অকাদেমি,
নয়া দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি

সংকলন প্রসঙ্গে

কৃষ্ণভাবিনী দাস সেকালের একজন আধুনিক মহিলা ছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রাম—চোয়ায় ; সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী হিন্দু পরিবারে। তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সাল বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১] তাঁর পিতার নাম ছিল জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। তখনও তাঁর জন্মস্থানে আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি। গ্রামে তখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ও রীতি ছিল না। শিক্ষিত পিতার কাছেই তাঁর হাতে-খড়ি হয়। তবে কৃষ্ণভাবিনীর প্রকৃত শিক্ষা শুরু বিবাহের পর। তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস নিজে ভালো ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৬ সালে বি. এ. পাস করে প্রথম পর্যায়ে বিলেত যান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে।

কৃষ্ণভাবিনীর জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। সেই কারণে তিনি তাঁর স্বামীকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করেন এবং শোনা যায় স্বামীর বিলেতযাত্রার ব্যয়ভার বহন করার জন্য সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করেন। স্বামীর বিলেত প্রবাসকালে নানাবিধ দুঃখকষ্ট এবং শোক কৃষ্ণভাবিনী নিজেই সহ্য করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাত্র পাঁচ মাস কাল দেশে অবস্থান করার পর দেবেন্দ্রনাথের পুনরায় বিলেত যাওয়া স্থির হলে কৃষ্ণভাবিনীও জ্ঞানার্জনের জন্য স্বামীর অনুগামিনী হন। ছ'বছরের একমাত্র কন্যাসন্তান তিলোত্তমাকে ছেড়ে তাঁকে স্বামীর অনুগামিনী হতে হয়েছিল। স্বামীর সাহচর্যে কৃষ্ণভাবিনী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে বসে অনেক বিদ্যাভ্যাস করলেন, জ্ঞান সঞ্চয় করলেন ; কিন্তু এসবের মধ্যেও মেয়ের কথা মনে পড়ত সর্বক্ষণ। হঠাৎ একদিন সংবাদ পান তাঁর প্রাচীনপন্থী শ্বশুর ন'বছরের নাতনির এক ধনী ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। তবে পাত্র সুপাত্র নয়। কৃষ্ণভাবিনী মর্মাহত হলেন। প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবিনী ইংলন্ডে বসে এ বিবাহ বন্ধ করতে পারেননি। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগে শ্বশুরমশাই এইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস কলকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বড় ভাই উপেন্দ্রনাথ দাস নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক

১. কৃষ্ণভাবিনীর জন্মস্থান এবং জন্মসাল সম্পর্কে কেউ বলেন নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গায় ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম। আর একটি মত অনুযায়ী বহরমপুর অঞ্চলের কাজলা গ্রামে কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম। আমরা এখানে বহুল প্রচলিত যে মত তাই গ্রহণ করেছি।

হিশেবে ১৮৭০-এর দশকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করেই তিনি তৎকালীন বৃটিশ সরকারের রোষে পড়েন এবং দণ্ডিত হন। বৃটিশ সরকার উক্ত সময়েই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৬৯ সালে বিধবাবিবাহ করে তিনি পরিবার পরিজন এবং পরিচিতজনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জীবনের সীমিত সাফল্য নিয়েই তিনি বিলেতে চলে যান। দেবেন্দ্রনাথের মেজো ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস উচ্চশিক্ষিত এবং আইনজীবী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার তিনি একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর প্রকাশিত 'সময়'[২] পত্রিকার পাতায়। পত্রিকাটির আয়ু অল্পদিনই ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও, নতুন আইনে তাঁর বয়স বেশি বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি চাকুরি পাননি। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ। জ্ঞানের প্রতি, ভাষাশিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ, একান্ত অনুরাগ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ যেমন ছিল, অনুরূপভাবে গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ফার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বহু বছর লন্ডনে বাসকালে তিনি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের অধ্যাপনা করেন। ১৮৯০/১৮৯১ সালে দেশে ফিরে দেবেন্দ্রনাথ বরিশালে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেঞ্চুরী কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে ফিরে দেবেন্দ্রনাথ পিতৃগৃহে আশ্রয় পাননি, কন্যাকেও কৃষ্ণভাবিনী নিজের কাছে আনতে পারেননি, দেখতেও পারেননি। অপাত্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তাঁর কন্যার জীবনেও শোচনীয় দুঃখ নেমে আসে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁদের কন্যা তিলোত্তমা পিতামাতার কাছে ফিরে আসেন।

২

শিক্ষিত পরিমণ্ডল এবং প্রগতিশীল পরিবারে কৃষ্ণভাবিনীর বিয়ে হয়েছিল বলেই হয়ত তাঁর জীবনধারা এবং সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে দীর্ঘ ৭/৮ বছর ইংলন্ডে থাকায় কৃষ্ণভাবিনী তাঁর জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে বাড়িয়ে তোলেন এবং সংস্কারমুক্ত উন্নত চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময়ী 'আধুনিক' মনোভাবাপন্ন 'নারী'-রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। নারী-স্বাধীনতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীমুক্তির তিনি নতুন করে ব্যাখ্যা খুঁজে পান। বিশ্লেষণ করেন স্ত্রী-স্বাধীনতাকে। আর তাঁর এই বিশ্লেষণে প্রেরণা যোগায় ইংলন্ডের স্ত্রীস্বাধীনতা।

১৮৮৫ সালের অগস্ট মাসে কৃষ্ণভাবিনীর প্রথম গ্রন্থ 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' প্রকাশিত হয়। সম্ভবত বাংলাভাষায় বিলেতযাত্রার এত বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনী এই গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। গ্রন্থের সূচনা হয়েছে সেকালে ইংলন্ডে যাবার পথের বিস্তৃত বর্ণনা

২. 'সময়' ছিল সাপ্তাহিক ; ১২৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত। রাজনীতি, সাহিত্য-সংবাদ এবং বাণিজ্যিক বিষয়ক সংবাদ পরিবেশিত হতো। 'সঞ্জীবনী'র মতো এই পত্রিকারও মূল্য ছিল দুই পয়সা।

দিয়ে। ইংরেজদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারার বিচার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, ইংলন্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিবাহ, ধর্ম, উৎসব, গার্হস্থ্য-জীবন, মহারানী ভিক্টোরিয়া, তাঁর সংসার, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিচয় তিনি উৎসাহের সঙ্গে দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থে লেখিকা মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। ইংরেজ মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে কৃষ্ণভাবিনী কটাক্ষ করলেও ইংরেজ মহিলারা যে আদর্শস্থানীয়া তিনি সে কথা বার বার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইংলন্ডে যাবার পথে কৃষ্ণভাবিনী ফ্রান্স এবং ইটালী দেশে গিয়েছিলেন। সেখানকার মহিলাদের দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। ভারতীয় নারী এবং ইউরোপীয় নারীদের মধ্যে তুলনা প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় নারীদের শ্রেষ্ঠ এবং উন্নততর বলেছেন : 'আমার মতে ইহারা (ইংরেজ মহিলারা) বরং পুরুষদের যথার্থ অর্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলোকে সচরাচর যেরূপ পুরুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। নারীর উচিত কাজ ব্যতীত ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা দোকান চালায়, কেরানীগিরি করে, স্কুলে শিক্ষা দেয়, পুস্তক ও সংবাদপত্রে লেখে, সভা করিয়া বক্তৃতা দেয় * * *। দেশের স্ত্রীলোকেরা জাতির অর্ধভাগ; তাহারা কেবল অতি যৎসামান্য কাজ করিয়া কিম্বা অলসভাবে থাকিয়া জীবন যাপিলে সমস্ত জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।'

কৃষ্ণভাবিনী ইংরেজ মহিলাদের পোশাকের জাঁকজমক, বিলাসিতা এবং স্বামী অন্বেষণে পাগল হয়ে বেড়ানোর আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু ইউরোপীয় মহিলাদের কর্মক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে ভারতবর্ষে বিশেষ করে তৎকালীন বঙ্গদেশে ভদ্রলোক পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তবে শিক্ষিতদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবও প্রসারিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন 'প্রগতিশীল' হয়েও, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী নিজে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেননি, কিন্তু নিজেকে সুশিক্ষিত করেছিলেন।[৩]

সংকলিত প্রবন্ধগ্রন্থটিকে দুটি ধারার প্রবন্ধে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলিতে তিনি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ দেশের মেয়েদের, বিশেষ করে বঙ্গদেশের মেয়েদের জীবনধারা বিশ্লেষণ করেছেন—তাদের মানসিকতা, জীবনবোধ তুলনা করেছেন ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে।

তিনি দেখিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিতে এদেশের মেয়েরা পুরুষদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, জ্ঞান ও বিদ্যায় পুরুষদের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে মেয়েরা ; এখানেই মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষ্ণভাবিনীর মূল্যবোধ ও মনোভাবেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষদের মতো মেয়েরাও কাজ করুক তবেই পুরুষের মতো সমমর্যাদা

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণভাবিনীকে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

ও অধিকার মেয়েরা পাবে। তিনি বঙ্গললনাদের 'পায়ের শিকল ছিঁড়ে', 'পিঞ্জর কেটে' গৃহ-অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানান। উপযুক্ত পরিবেশ এবং উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেলে সামাজিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এ দেশের মেয়েরা নিজেদের উপযোগী এবং অপরিহার্যরূপে গড়ে তুলতে পারবে তার উদাহরণ কৃষ্ণভাবিনী প্রবন্ধের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন।

'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন : 'স্ত্রীজাতি যে বাস্তবিকই পুরুষজাতি হইতে নিকৃষ্ট ও পুরুযোচিতগুণে একেবারে বঞ্চিত, এ জগতে তাহার কোন প্রমাণ নাই।' এই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেন সংসারে স্ত্রীলোকের স্থান ও স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ চিরকালের জন্যে স্থির হয়ে গেছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল তা প্রতিপন্ন করে 'সভ্যজগতে এক মহা আলোড়ন উঠিয়াছে।' ভারতবর্ষেও কয়েক দশক ধরে নারীমুক্তি বিষয়ক যে সচেতনতার উদ্রেক হয় তাও এই আলোড়ন প্রসূত।

'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি' প্রবন্ধে তিনি ইংলন্ডে নারীশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করলেন : 'ইংরেজ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা রানী এলিজাবেথের সময় হইতেই একরূপ আরম্ভ বলিতে হয়। * * * তাঁর রাজত্বের পূর্ব্বে কেবল রাজরাণী ও বড়ঘরের মহিলারা যাহা কিছু লেখাপড়া শিখিতেন, তাহাও অতি সামান্য। রানী এলিজাবেথ ভ্রাতার সঙ্গে সমানে শিক্ষিত হওয়াতে তিনি নিজ রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় উৎসাহ দিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকদিগের আক্রোশ কমাইয়া দেন। কিন্তু তখনকার শিক্ষা এখনকার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট ছিল। কেবল ধনী ও দুচারজন মধ্যবিত্ত লোকের কন্যারা লেখাপড়া শিখিত, অন্যান্য সাধারণ বালিকারা বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত জানিত না।'

নারীর কোনোরকম ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে না। স্বামী, সন্তান এবং সংসারের জন্যই নিবেদিতপ্রাণ—তাঁর কোনোরকম স্বাধীন চিন্তা থাকবে না, স্বামীর মতেই মত দেবেন, স্বামীকে অনুসরণ করবেন—এ তত্ত্ব কৃষ্ণভাবিনী মেনে নিতে পারেননি : 'স্ত্রীজাতি এ জগতে জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া কেবল দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্তও তাহা গঠিত নহে। পরোপকার ও অন্যের জন্যে জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।'

তিনি মেয়েদের অবরোধপ্রথা ও পরনির্ভরতাকে মেনে নেননি। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশের নারীর জীবনচর্চাকে লক্ষ করেছেন : 'কাশ্মীর, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের পাহাড়ী স্ত্রীদের জীবন যে কত মার্জ্জিত, কর্ম্মিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, তাহা দেখিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই আহ্লাদিত হন। তাহাদের পরিচ্ছদ অতি ভদ্র, চালচলন অতি সুমার্জ্জিত—আর তাদের জীবন সংসারে পুরুষদের অপেক্ষাও অধিক উপকারী। তাহারা বিদ্যার নাম মাত্র জানে না ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে পুরুষজাতির সঙ্গে সমানে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহাদের জীবন এতদূর সাহসী, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয় যে, দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।'

'বিলাত ভেল্কি' নামক প্রবন্ধে বিলিতি সবকিছুকে ভালো বলার মনোভাবকে তিনি

লজ্জাজনক বলে অভিহিত করলেও, তাঁর ইংরেজপ্রীতি শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। নিজের দেশের ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুসংস্কার অথবা ক্ষুদ্রতাকে তিনি কটাক্ষ করেছেন, প্রতিতুলনা হিশেবে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, জীবনবোধ, নারী বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত করেছেন।

৩

উল্লিখিত সংকলনগ্রন্থের দ্বিতীয় ধারার প্রবন্ধগুলি শিশু, শিশুর প্রতি মায়ের কর্তব্য, শিশুর শিক্ষা, কিন্ডরগার্টেন শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং উন্নতভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। 'আজকালকার স্কুলের ছেলেরা' প্রবন্ধে শিশুদের বিশৃঙ্খল হবার কারণ দেখিয়ে লিখেছেন : 'হিন্দু বিশেষতঃ বঙ্গ বালকদের কাছে বিদ্যালয় এখন যেন দোকান মাত্র—যেখানে কয়েক বৎসর কিছু কিছু অর্থ দিয়া (সাধ্যমত যত সস্তায় হয়) দুই একটি 'পাশ' কিনিতে পারিলে কোন অফিসে একটি চাকরী মিলিবে—এই তাদের স্কুলে পড়ার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য।'

ছাত্রজীবনে, বিদ্যালয় জীবনে নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হওয়ার জন্য স্বদেশের গৃহ-অভ্যন্তর শৃঙ্খলাশূন্য ও অশিক্ষার স্থানে পরিণত হয়েছে। শৈশব থেকে শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা শিশুর ভবিষৎকে দৃঢ় করে এবং জাতীয় জীবনকে উন্নত করে। ভালো মা হবার জন্য এবং সন্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বলে কৃষ্ণভাবিনী মনে করতেন।

কৃষ্ণভাবিনী যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অবহেলিত হয়েছিল তাঁর মাতৃস্নেহ। তাই বুকে অপার দুঃখ ছিল তাঁর। একমাত্র মেয়ে তিলোত্তমাকে চোখের দেখা দেখবারও উপায় ছিল না। কৃষ্ণভাবিনী মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন ; কিন্তু জাতিচ্যুত বাবা-মা একঘরে। শ্বশুরবাড়িতে তিলোত্তমা বন্দিনী হয়েছিলেন ; কৃষ্ণভাবিনী বাইরে থেকে মেয়ের কান্না শুনতেন। স্বামী-পরিত্যক্তা, নির্যাতিতা তিলোত্তমা একত্রিশ বছর বয়সে সমাপ্ত করেছিল তার জীবন পাঁচালী। আনুমানিক ১৯০৯ খ্রীঃ কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর মৃত্যু হয়। তার একুশদিন বাদে তিলোত্তমার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণভাবিনী বিলিতি সাজপোশাক খুলে ফেলেছিলেন। কন্যার মৃত্যুর পর মোটা খদ্দরের থানের ওপর চাদর জড়িয়ে সনাতনী বিধবা সাজলেন, খালি পায়ে পিচঢালা তপ্ত পথে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নির্যাতিতা মেয়েদের উদ্ধার করে এনে শিক্ষিত করে নতুন জীবন দেবার দায়িত্ব নিলেন। সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে ভুলতে চেয়েছিলেন একমাত্র কন্যা তিলোত্তমা ও স্বামীকে হারানোর ব্যথা। পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 'ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলে'র তিনটি শাখা কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯১৬ খ্রীঃ ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের অধীনে তিনি একটি বিধবাশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেন। সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৯১১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন, সেই সময় 'স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসও আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কবিবরের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়োই

আনন্দিত হইলেন এবং ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন।' সরলা দেবী কৃষ্ণভাবিনীর সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'কলিকাতার ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের শাখার কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করি। কৃষ্ণভাবিনীর দাসের চেষ্টাযত্নে ইহা একটি প্রকৃত সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্তঃপুরে বিধবা, কুমারী ও অনাথা নারীগণকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা হয়।' ১৯১৯ খ্রীঃ সমাজসেবী নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণভাবিনী দাসের জীবনাবসান হয়।

কৃষ্ণভাবিনী সুললিত ছন্দে আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের দৃশ্যমালা' লেখেন। উল্লিখিত সংকলনগ্রন্থে কৃষ্ণভাবিনী বিভিন্ন সময়ে ভারতী ও বালক, বামাবোধিনী পত্রিকা, প্রদীপ, প্রবাসী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় অনায়াস, স্বচ্ছন্দ গদ্যভাষায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার বেশ কিছু সংকলিত হয়েছে। তবে বানানের সমতা সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি। মূলের প্রবন্ধগুলি অবিকৃত রেখেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্যের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর সমর্থনজনিত সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা শেফালী মৈত্র, অভিজিৎ সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ীকে।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ

এই পরিবর্ত্তনশীল ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরাতন প্রথা ও আচার ব্যবহার সকল যেমন দ্রুতবেগে এক দিক দিয়া বিলোপ পাইতেছে সেইরূপ নানা প্রকার নূতন রীতি নীতি অন্য দিক দিয়া সকল সভ্য দেশেরই সমাজ ও কাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু শিক্ষিত ও মার্জ্জিত লোকদের মধ্যে সংসারে স্ত্রীলোকের পদ ও স্ত্রীপুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া যে মহা আন্দোলন, তাহাতে মানব সমাজের মূলে যেরূপ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে এরূপ অন্য কিছুতে নহে। ঐ উভয়জাতির সম্বন্ধ স্বভাবের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই ভাবিয়া বহুদিন ধরিয়া লোকে নিশ্চিন্ত রহিয়াছিল, ও ঐ সব গুরু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বা উহা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেও সাহস পাইত না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, অন্যান্য পুরাতন রীতিনীতির ন্যায় উক্ত বিষয় লইয়াও এখন সকলেই নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তর্ক করিতে প্রস্তুত। সংসারে নারীজাতির পদ ও অধিকার লইয়া সমস্ত সভ্য জগতে এক মহা আলোড়ন উঠিয়াছে। আর ঐ আলোড়ন প্রভাবেই সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির নানা উপায় খোলা হইয়াছে। অনেক দেশে নারীরা ডাক্তার, কেরাণী ইত্যাদি পদে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছে, এবং বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধীয় আইনেরও সংশোধন ঘটিয়াছে। আর আমাদের ভারতবর্ষেও যে নূতন স্ত্রীজীবনের সঞ্চার, তাহাও ঐ মহা আন্দোলনেরই ফল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে সমগ্র জগতে নারীজাতির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু রমণীকুল ও তাঁহাদের হিতৈষীগণ ঐ সকল শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইলেও গুরুতর অনিষ্টকারী বিপক্ষ মত সকল এখনও আমাদের উচ্চগতির পথ আটক করিয়া রহিয়াছে। ঐ বেড়া ডিঙ্গাইয়া নারীজাতিকে পুরুষজাতির সঙ্গে এক পদে বসাইতে যে কত তর্ক, কত বিবাদ, কত পরিশ্রম, ও কত সময়ের আবশ্যক হইবে তার ঠিক নাই। আজকাল স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি পুরুষদের ঘৃণা বা উপহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এক ভয়ঙ্কর শত্রুভাবের উদয় হইয়াছে। তবে ঐ বৈরভাব যে চিরস্থায়ী হইবে না তাহা নিশ্চয়। কেন না স্বভাবের দ্বারা স্ত্রীপুরুষ যেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি যেরূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট তাহাতে এ অস্বাভাবিক শত্রুভাব চলিয়া গিয়া শেষকালে উভয়জাতির মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ ও বন্ধুভাবের স্থিতি হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাবের আলোচনা কালে তিনটী প্রশ্ন একে একে আমাদের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১ম,—অতীতকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সকল দেশীয় ও সকল জাতির সমাজে স্ত্রীলোকেরা কিরূপ পদ পাইয়াছে? ২য়,—কি কি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কারণ বশতঃ তাহারা ঐরূপ পদ পাইয়াছিল ও পাইয়া থাকে? ৩য়,—সমাজের গতি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা কি এখনও তাহাদিগকে ঐ পুরাতন রীতিনীতি অনুসারে রাখিতে চায় ও রাখা ভাল বিবেচনা করে, না উহা সংসারে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সমান অধিকার ও সমান সম্বন্ধ আনিতে চাহে?

আমরা সমস্ত নারীজাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস খুঁজিলে এই দেখিতে পাই যে, সকল সময়ে সকল জাতীয় পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন ছিল ও আছে। দুএকজনের বিষয় বাদ যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত স্ত্রীজাতি সকল কালে ও সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত বলবান পুরুষ জাতির সম্পূর্ণরূপে হস্তগত ও বশীভূত। সভ্যতার দ্রুতগতি ও মার্জ্জিত-ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির উপকার ও উন্নতির অনেক চেষ্টা পাইলেও সর্ব্বসাধারণের, এমন কি স্ত্রীজাতির নিজেদেরই এই মত বিশ্বাস যে, পরাধীনতাই তাহাদের উপযুক্ত পদ, তাহারা পরিবারে নিজ নিজ আত্মীয় পুরুষদের সম্পত্তি স্বরূপ, সুতরাং পুরুষজাতির ইচ্ছা রুচি বিচার ও সুবিধা অনুসারে স্ত্রীজাতির জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা অবলম্বনের ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে স্ব স্ব জীবনের কর্ম্ম সমাধার বাসনা দেখিলেই, উহা রমণী স্বভাব সূচক কোমলতা ও নম্রতার বিরুদ্ধাচরণ ভাবিয়া লোকে সর্ব্বত্রই উপহাস বা তিরস্কার দ্বারা উহা দমনে রাখিবার প্রয়াস পায়।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন—ইহার কারণ কি? কি কারণে সমস্ত বিশ্বব্যাপী নারীজাতির ইতিহাসে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন ছিল ও আছে? ভদ্রতা, সদাচার ও এমন কি আদর, মান্য বা পূজা, যে নামেই উহাকে আচ্ছাদন করা যাক্ না, এ পরাধীনতা কে অস্বীকার করিবে? স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা যথার্থই নীচ, এরূপ স্বীকার ভিন্ন সকল সময়ে ও সকল অবস্থার এ প্রকার বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী পরবশতার কারণ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য বোধ হয়। কেননা, ইহা বোধযোগ্য নয় যে, উভয় জাতিই সমান বলবান হইলে একদল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অপরদলের বশীভূত হইয়া থাকিত ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের মধ্যে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও দীর্ঘকালব্যাপী কলহ চলিত। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, দুই দলের পরিশ্রম ও কার্য্যক্ষমতায় বিঘ্নদায়ী নারীপুরুষের ঐ মহা যুদ্ধ নিবারণের জন্য উহাদের মধ্যে একজাতি অন্যের অপেক্ষা এরূপ স্বল্প পরিমাণে দুর্ব্বল হওয়া উচিত যে, তাহাতে কলহ বিবাদও বন্ধ থাকিবে ও দুই দলে অবাধে নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্য্য সাধনে সক্ষম হইবে ; ইহাই সমাজের গতি ও উন্নতির পক্ষে যথার্থ উপকারী। কিন্তু স্ত্রীজাতি যে বাস্তবিকই পুরুষজাতি হইতে নিকৃষ্ট ও পুরুষোচিত গুণে একেবারে বঞ্চিত, এ জগতে তাহার কোন প্রমাণ নাই। উহাদের বিভিন্নতা আছে কিন্তু তাহা ডান হাত ও বাঁ হাতের প্রভেদের মত। অভ্যাস করিলে ডান হাতের সকল কাজই বাঁ হাত দিয়া সমান রূপে সম্পন্ন করা যায়, আর ন্যাটা লোকেরা স্বভাবত বাঁহাত দিয়া সকল কাজ আরো ভালরূপে করিতে পারে, তবে ইহা সত্ত্বেও দক্ষিণ হস্তের যে অল্প শ্রেষ্ঠতা আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

এবং এই অতি অল্প বিভিন্নতার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের হাত আরো অধিক ভারী শিকলের দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ঐ সামান্য অভেদ না থাকিলেও স্বভাবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকাজের ব্যবস্থায়—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উপর সন্তানধারণ ও বহুদিন ধরিয়া অক্ষম শিশুদের লালনের ভারার্পণ হওয়াতে নারীজাতি কেন সর্ব্বদা পুরুষের অধীন থাকে, আহার ও আশ্রয়ের জন্য ঐ জাতির উপর একান্ত নির্ভর করে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। এখন আমাদের এই দেখা উচিত, যে, পুরুষের ঐ স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ও অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারে—নারীজাতিকে কেবল 'স্ত্রীলোক' বলিয়া মানব সমাজের সুখস্বচ্ছন্দতা তাহাদিগকে সংসারের ও সাধারণ সমস্ত অধিকার হইতে কতদূর পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চায়। দেখা যাক্, আমাদের এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কিরূপ সুবিচার পূর্ব্বক দেওয়া হইতে পারে।

ইহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় যে, জগতের বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা মানব-জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কারণে সমাজের অসভ্য ও অমার্জ্জিত অবস্থায়, নারীজাতি শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাবশতঃ নিজেদের ও সন্তানদের রক্ষার জন্য পুরুষের একান্ত অধীন,—এই যুক্তিই শেষ যুক্তি। কেননা, ঐরূপ অবস্থায় সংসারক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধ করিবার সময় মানুষ কেবল হস্তপদের বলের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষার গতির সঙ্গে মানুষ যত মার্জ্জিত হইতে থাকে, ততই তাহারা শারীরিক বল উপেক্ষা করিয়া সবল, দুর্ব্বল সকলেরই জীবন, সম্পত্তি ও স্বত্ব সমানভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদনুসারে আইন প্রস্তুত করে ; আর যে সমাজ যত সুসম্পন্নরূপে সভ্য, তাহা তত অপক্ষপাতীরূপে সবল দুর্ব্বলকে সমান চক্ষে দেখে। অন্যতঃ, যদিও জাতি বৃদ্ধি ও রক্ষা করা অন্যান্য ইতর জন্তুর ন্যায় মানব জীবনেরও প্রথম উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাদের মত মানুষের জীবনের উহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ; বরঞ্চ যে সকল উন্নত ও স্বর্গীয় মানস পূরণের জন্য পরমেশ্বর মানুষকে পশুদিগের ন্যায় কেবল জড়শরীর দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই ও যে উন্নত জীবনের সুখতৃপ্তি আশায় মানুষ শারীরিক সুখভোগকেও তুচ্ছ বোধ করে, সেই পবিত্র উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত মানুষের মনের সঙ্গে শরীরেরও আবশ্যক।

আর ইহাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে এ পর্য্যন্ত কোন জাতিই কেবল শারীরিক বলের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে নাই বা প্রধান বলিয়া পরিচিত হয় নাই। মানসিক বুদ্ধিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের দ্বারাই এক জাতি অপর এক জাতির উপরে উঠিতে পারে। যদি শাবীরিক বলই জগৎ শাসনের প্রধান শক্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানুষ অনেক নীচে পড়িয়া থাকিত। কেননা, জন্তুদিগের মধ্যে মানুষই স্বভাবত অধিক অসহায় ও দীর্ঘ শিশুকাল বশতঃ কিছু দিন তাহারা নিতান্তই নিরুপায়। অথচ জ্ঞান ও মস্তিষ্ক দ্বারাই মানবজাতি জগতের প্রভুত্ব পাইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী পশুদিগকেও নিজেদের বাধ্য ও দাসস্বরূপ করিয়াছে। সমস্ত মানব জীবনের ইতিহাসেও ক্রমাগত ঐরূপ দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নীতিবান ও বুদ্ধিমান জাতিরাই অন্যান্য মানব জাতি অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হইয়াছে। আবার দেখ, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি মানব জীবনের যত উন্নত বিষয় ও কর্ম্ম সকলের সঙ্গে জীবন যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই। যে

ব্যক্তিদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় ও বুদ্ধিশক্তি দ্রুত, তাঁহারাই কেবল ঐ সব কর্ম্মক্ষেত্রের যোদ্ধা স্বরূপ ; উহাতে শারীরিক বিভিন্নতা বা অক্ষমতা কিছুই করিতে পারে না।

ঐ উপরি উক্ত যুক্তি অনুসরণ করিলে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতই যে নারীজাতি সংসারের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে, মানসিক হীনতা তাহাদিগকে পুরুষের নীচে রাখিয়াছে—এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে। এখন আমাদের এই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কতদূর সত্য?

আমরা যদি এই বিষয়ে এক অতিবাদ সীমায় যাই, (কেননা, সচরাচর লোকদিগের মনে উহা ঐরূপ ভাবই ধরিয়া থাকে,) আর বলি, যে, প্রতি স্ত্রীলোক স্বভাবত প্রতি পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট, তাহা হইলে ঐ স্বাভাবিক অক্ষমতা নিতান্তই ভয়ানক বোধ হয়। কিন্তু একটু চাহিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, স্ত্রীপুরুষ জাতির প্রতি ব্যক্তির মধ্যে ওরূপ বিশ্বব্যাপী কোন হীনতার প্রভেদ নাই। উভয় জাতির দোষগুণ কেবল গড়ে ধরিলেই সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর গড়ে পুরুষদের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। আমরা যদি কেবল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির উদাহরণ লই তাহা হইলে দেখিতে পাই অনেক স্ত্রীলোক সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ ; আর কতক নারী কেবল কতিপয় মহাপুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক প্রধান। লোকে ক্রমাগত বলিয়া থাকে, স্ত্রীজাতি বিবেচনা, গভীর চিন্তা ও ধ্যান, দীর্ঘকাল ব্যাপী মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদিতে স্বভাবত অপারগ, আর তাহাদের কোন নূতন বিষয় কল্পনার ক্ষমতা বা রহস্যজ্ঞান নাই। কিন্তু ঐ সকল দোষারোপ যে অমূলক, অনেক বিখ্যাত নারীদের জীবন ও কাজের দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক ও সামাজিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মানবজীবনের সমস্ত কাজে ও কঠিন পরীক্ষায় পুরুষের সঙ্গে সমানে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তবে দুই একটা বিষয়ে যে এখনও তাহারা পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ যে কেবল মাত্র বুদ্ধির হীনতা নহে, কোন বিচক্ষণ ও অপক্ষপাতী ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিবেন না। আমরা যখন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে স্ত্রীলোক জীবন যুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে সমানে যুঝিবার সময় কত বাধা ও ক্লেশ, অসুবিধা ও গঞ্জনা, উপহাস ও যন্ত্রণা সহিতে বাধ্য হয়, তখন ঐ সকল সামাজিক ও শারীরিক বাধা অতিক্রম করিয়া তাহারা যে অধিকাংশ বিষয়ে পুরুষের সমানে উঠিয়াছে, ইহাতেই তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দৌড় স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

স্ত্রীপুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমানতা সম্বন্ধেও ভয়ানক মতবিরোধ দেখা যায়। কেন না, অনেকে ঐ দুই বিষয়ে নারীজাতির শ্রেষ্ঠতা বা সমানতা স্বীকার করিলেও সাধারণ কর্ম্মে তাহাদের অক্ষমতার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এক দিকে লোকে বলে, যে রমণীর চরিত্র পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সে কারণে সাধারণ জীবনের কর্ম্মভূমিতে তাহারা প্রবেশ করিলে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ঐ বিশুদ্ধ ও পবিত্র স্বভাব সমল ও নীচ হইয়া যাইবে। অন্যদিকে আবার ইহা বলা হইয়া থাকে, যে, নারীজাতি উন্নত ও নৈতিক গুণে বঞ্চিত, সেই হেতু বলবান, ধর্ম্মশীল ও সদাশয় পুরুষের শাসনাধীনে থাকিয়া তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন এই দুইটি ধারণার কোনটী সত্য তাহা আমাদের খুঁজিয়া দেখা উচিত। রমণীরা ধর্ম্মগুণে বঞ্চিত, এই শেষ ধারণা লইয়া

আমরা প্রথম আরম্ভ করিব।

ঐ উক্তি মতে স্ত্রীজাতি সাহস, সত্যবাদিতা, সততা, সদাশয়তা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সকলে স্বভাবত বঞ্চিত, আর তাহাদের হৃদয় প্রবঞ্চনা, নীচাশয়তা, অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, প্রতিহিংসা, ভাণ প্রভৃতি যত নীচগুণে আসক্ত। কিন্তু যদিও অতীত ইতিহাস ও প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এই সব আরোপ যে ভুল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখায়, ও স্ত্রীলোকেরা যে কঠিন মানসিক পরিশ্রমে স্বাভাবিক অপারগ সে ধারণারও মূলচ্ছেদ করে, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্ত স্ত্রীজাতির বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী পরাধীন-জীবন পুরুষজাতির বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনের সহিত তুলনা করিলে পুরুষের অপেক্ষা গড়ে স্ত্রীলোকদিগকে ঐ সব দোষে অধিক প্রবণ দেখা যায়। কিন্তু যেরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমরা দুই জাতির তুলনা করি, উভয়ের মধ্যে যদি সে অবস্থার বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে নারীজাতি যে ঐ সব মন্দগুণে অধিক আসক্ত, তাহা কেবল অবস্থার দোষে, সমস্ত স্ত্রীজাতির দোষে নয়। স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের হৃদয়ও ঐ সব নীচগুণে প্রবণ, কিন্তু স্বাধীনতার পবিত্র বাতাসে উহা সর্ব্বদা উড়াইয়া দেয়। আর যে দেশে উভয় জাতির জীবন, সম্পত্তি, সুখস্বচ্ছন্দতা ও মান্য সমানরূপে ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে, সেই দেশেই আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে নারীদিগকে সাধারণ পুরুষদিগের তুলনায় উক্ত শ্রেষ্ঠতর গুণে অধিক আসক্ত দেখা যায়। ইহাতে কি প্রমাণ করে?

আবার অহঙ্কার ও নীচাশয়তা, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও মনের অপ্রশস্ততা কেবল স্ত্রীজাতির প্রতিই আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুই জাতিই এক অবস্থায় জীবন যাপন করিলে উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে ঐ সব মন্দগুণ দেখা যায়। যে কোন সময়ে ও যে কোন দেশে যথেচ্ছাচারিতা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অত্যাচার পুরুষদিগকে জীবনের সমস্ত সাধারণ কাজ ও স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, সেই সেই কালে ও সেই সেই দেশে আমরা দেখিতে পাই যে অকর্ম্মণ্য বা অলস পুরুষেরা নিজ নিজ শ্রেণীর স্ত্রীদিগের সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ঐ সব মন্দগুণে পূর্ণ হইয়া থাকে। শুধু তাহা নয়, অনেক সভ্য ও স্বাধীন দেশেও সমান শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষদিগকে অনেক সময় অধিক পরিমাণে নীচ কর্ম্মাসক্ত হইতে দেখা যায়।

এখন, যে মত নারীজাতির প্রতি বিশেষ বিশেষ দোষের পরিবর্ত্তে বিশেষ বিশেষ গুণ আরোপণ করিয়া থাকে, আমরা সেই মত দেখিব। ঐ সব গুণের মধ্যে নম্রতা সর্ব্ব প্রধান; উহার সঙ্গে অবশ্য কোমলতা, লজ্জা, আত্মবিসর্জ্জন, দ্রুত বিবেচনা ও কল্পনা শক্তি ও ধর্ম্মভাব ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা যদি পূর্ব্বের মত সমস্ত পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া দেখি, তাহলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীলোকেরা সচরাচর ঐ সব ধর্ম্মগুণে ভূষিত হইলেও উহা তাহাদের বিশেষ রূপে স্বভাবজাত নয়। ইহা অনেকে নজর করিয়া থাকিবেন যে তরুণকালে ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই এক রূপ নম্র ও লজ্জাশীল থাকে, কিন্তু ভগিনী উহার জন্য সর্ব্বদা প্রশংসা পায় আর ভ্রাতা হাস্যাস্পদ হয়। সে জন্য বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যুবক উহা ঝাড়িয়া ফেলে, আর যুবতী যত্নে উহাকে পুষিয়া রাখে। কাজেই

বয়সকালে কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যেই নম্রতা ও লজ্জা দেখিয়া, উহা তাহাদের বিশেষ গুণ, আমরা এইরূপ ভাবিয়া থাকি। তা ছাড়া, যে সকল অসভ্য জাতিদের মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির লজ্জা ইত্যাদির বিষয়ে কিছুই গ্রাহ্য করে না, সেখানে নারীরা ঐ সব গুণে একেবারে বঞ্চিত ; উহা যে স্ত্রীদের জাতিসিদ্ধ গুণ নয়, এই ঘটনা, তার প্রমাণ দিতেছে। অন্যদিকে, যে পরিবারের পুরুষেরা রমণীদের লজ্জা ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত অভিমানী, সেইখানেই উহা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

আবার কোমলতা ও তাহার সঙ্গী দয়া প্রকৃত নারীজীবনের ন্যায় প্রকৃত পুরুষ জীবনেরও এক অংশ স্বরূপ। আর স্ত্রীলোকেরা সংসারের অপ্রশস্ত ক্ষেত্রে সর্ব্বদা নানা ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও তাহাদের আলোচনাবশতঃ দ্রুত বিবেচনা ও সুরুচিতে অধিক অভ্যস্ত। তবে, ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে যদি কোন পুরুষ গৃহে স্ত্রী অভাবে বা কৃপণতার দরুণ সর্ব্বদা ঐ সব ছোটখাট বস্তুর প্রতি নজর রাখিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবিলম্বে দ্রুত বিবেচনা ও বোধশক্তিতে স্ত্রীজাতির ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আত্মসমর্পণ সদাশয়তার অন্য এক নাম মাত্র ; যে কোন মহানুভব ব্যক্তি নিজের প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু বা উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান দ্রব্য দ্বারা পরের উপকার করিতে পারেন না, তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া সদাশয়তা করিয়া থাকেন। উহা দুই জাতিরই মহচ্চরিত্র লোকদিগের মধ্যে দেখা যায়। আর ধর্ম্মভাব যে কেবল স্ত্রীলোকদেরই বিশেষ গুণ তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, এ পর্য্যন্ত কেবল পুরুষেরাই যত ধর্ম্মের স্থাপক ও প্রচারক হইয়াছেন। আর যেখানে যে কোন ধর্ম্ম—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পূজিত হইয়া থাকে, সেইখানেই পুরুষেরা উহার একচেটিয়া করিয়া থাকেন, নারীদের হাতে কখন উহার ভারার্পণ করেন না। তবে অনেক সময়ে, কোন ধর্ম্ম ভ্রম ও কুসংস্কারময় হইলেও, স্ত্রীরা যে পুরুষের অপেক্ষা উহার প্রতি অধিক বিশ্বাসী ও অনুরক্ত দেখা যায়, তাহার কারণ, তাহারা সমস্ত সভ্য জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গতি হইতে একেবারে বহিষ্কৃত আছে। জ্ঞান ও বিদ্যার গতির সঙ্গে মানব জাতির মন এরূপ প্রশস্ত হয় যে উহা দ্বারা পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিশ্বাস মানসিক কল্পনা বা ধারণার পক্ষে অপ্রশস্ত বোধ হইলে মানুষ স্বভাবতঃ উহা ত্যাগ করিযা মনের নূতন অভাব অনুসারে কোন এক নূতন ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে বা স্থাপন করে। সে কারণে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীজাতির সচরাচর বিমর্ষজনক, সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় জীবনে ধর্ম্মই কেবল অসীম, উজ্জ্বল জগতের আলো প্রবেশের একমাত্র দ্বার স্বরূপ। ঐ একমাত্র জানালা দ্বারা তাহাদের আত্মা বহির্জগতের আলো দেখিতে পায়, ও যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শুধু আহার নিদ্রা, স্বর্ণালঙ্কারে তৃপ্ত হয় না, সেই প্রকৃত জীবনের পবিত্র বায়ু সেবিতে পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রীজাতির যে শোচনীয় অবস্থা তাহাদের জীবনে ঐ একমাত্র জানালাকে এত আবশ্যকীয় করে, তাহাই আবার সদা সর্ব্বদা উহাকে কুসংস্কার ও ভ্রমজালে এরূপ আচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার করিয়া রাখে যে বিশুদ্ধ আলো বা নির্ম্মল বাতাস কিছুই উহার ভিতর দিয়া তাহাদের আত্মায় প্রবেশ করিতে পারে না।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও নীতিক্ষমতার তুলনা দ্বারা আমরা স্পষ্ট দেখিতে

পাইতেছি যে উভয়ের মধ্যেই মানবচরিত্র ও স্বভাব এক প্রকার। তবে জগতের সৃষ্টি হইতে দুই জাতি বরাবর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছে ; ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছে ; ভিন্ন প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন কাজে উৎসাহ পাইয়াছে, প্রতিজাতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বিশেষরূপে শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়াছে, সেই কারণে উহাদের মানসিক ভাবের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর সেই জন্যই 'এটা পুরুষের কাজ', 'ওটা স্ত্রীলোকের কাজ' 'ওটা পুরুষের গুণ' 'ওটা স্ত্রীর গুণ'—এই সব কথা ও ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

যাহাহৌক এখন উভয়জাতির মধ্যে এক চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রভেদ—অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে শারীরিক ব্যবস্থার দ্বারা সন্তান ধারণ ও জননীর কর্ম্মভার স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হইয়াছে—সেই প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখা আমাদের কাজ। প্রকৃতির বিধানানুসারে নারীজাতি সন্তান ধারণ ও লালন করিবে, আর পুরুষজাতি স্ত্রী ও তাহার শিশুদের রক্ষা ও ভরণপোষণ করিবে। মাতার কর্ত্তব্য নারীকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখে, সেজন্য বাহিরের সমস্ত কাজ পুরুষের উপরেই পড়ে।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে মানবের আদিম সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থামতে স্ত্রীজাতির অধীনতা ও পরবশতা ক্রমাগত এক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, আর যেখানে নারীজাতি, কেবল "মেয়েমানুষ" বলিয়া অবহেলিত ও ঘৃণাস্পদ হইয়াছে ও যেখানে উহাদের মানসিক ও নৈতিক ইচ্ছা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য পূর্ব্বক, যেরূপে হৌক তাহাদের বিবাহ দিয়া তাহাদের দায় হইতে মুক্ত হইলেই হইল—পুরুষেরা এইরূপ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যথেচ্ছাচার আচরণ করিয়াছে, সেখানে ঐ দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য ও সংসারে অধিকার লইয়া কখন কোন তর্ক উঠে নাই।

আর প্রায় সব সভ্য দেশেই কুমারী নারীদের উপর বিবাহিতাদের প্রাধান্য স্বীকার ও যেরূপে হৌক পুরুষের আবশ্যকের অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদিগকে সমাজ হইতে দূর করা—ঐ আদিম ও অমার্জ্জিত ব্যবস্থারই অন্য নাম মাত্র। আমাদের দেশে ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে বহুবিবাহ, শিশু কন্যাদের হত্যা ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম ও—পুরুষের ব্যবহার ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য আবশ্যক নাই—ইহাও সেই আদিম ধারণার ফল। আর ঐ ধারণা বশতঃই অল্প দিন হইল, ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত-কন্যাগণ ধর্ম্মাশ্রমে বা 'কন্‌ভেন্টে' গিয়া চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত।

আমরা উভয় জাতির তুলনা দ্বারা ইহা উত্তমরূপে দেখিতেছি যে স্ত্রীলোকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক নীচতা সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে উহারা সামাজিক ও অন্যান্য সাধারণ অধিকার হইতে কখন বহিষ্কৃত হইতে পারে না। এখন এই পুরাতন ও দীর্ঘস্থায়ী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে, রীতিনীতি, আইন ও মানুষের মতানুসারে যত যুক্তি আছে সে সব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

প্রথম, রাজনীতি ও আইনের যুক্তি ;—অন্যান্য বিষয়ে মতভিন্নতা থাকিলেও এ যুক্তিতে সকলেরই এক মত। স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পরাধীন ও পরদাসী স্বরূপ থাকিয়া আসিয়াছে সেজন্য তাহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দিলে স্বভাবের বিপরীত

দিকে যাওয়া হয়, ও সংসারে মহাবিপ্লব আনা হয়। এই যুক্তির মাথায় আমরা নির্ভয়ে এই উত্তর দিতে পারি, যে, প্রকৃতিকে নিজেই নিজের রক্ষার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আর সমাজের গতি, ক্রমাগত পুরাতন অনিষ্টকারী প্রথা ত্যাগ করিয়া উহার নূতন অভাবানুসারে নূতন রীতিনীতির গ্রহণ হইতেই চলিয়া থাকে। তবে আজকাল যখন যত কঠিন আইন ও নিয়মের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মহাআন্দোলন ও তর্ক উঠিতেছে, ও জগতের গতির সঙ্গে সঙ্গে একে একে উহারা অন্তর্হৃত হইতেছে, তখন কেবল নারীজাতির সম্বন্ধে আইন ও আচার ব্যবহারই যে অসংশোধিত বা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ইহা বড় কঠিন আচরণ বলিয়া বোধ হয়।

এই যুক্তির পরে নারীজাতির কর্ম্মক্ষেত্রে সমান অধিকার বিষয়ে বিপক্ষবাদীদের তর্ক আমাদের সম্মুখে আসে। তাঁরা বলেন যে, সুমিষ্ট, সুকোমল ও সুপবিত্র রমণীকে জীবন যুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে কঠিন কর্ম্ম করিতে দিলে, তাহার মিষ্টতা, কোমলতা ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে, স্ত্রীপুরুষজাতির মধ্যে পরস্পর আলাপের মধুরতা ও কবিতার বিনাশ পাইবে, আর দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের যত সৌজন্য ও আদরের পরিবর্ত্তে উহাদের মধ্যে এক কর্কশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইবে। আর ঐ বিষম আড়াআড়িতে স্ত্রীজাতি নিশ্চয়ই পদভ্রষ্ট হইয়া আরো নীচে পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু বোধ হয়, যে ব্যক্তিরা ঐরূপ প্রমাণ দেখান, তাঁরা সাধারণ স্ত্রীজাতিকে না লইয়া তাঁদের পরিচিত গুটিকতক মহিলাদের কথা ভাবিয়া থাকেন। যে রমণীরা দাস দাসীতে বেষ্টিত হইয়া মনের শান্তিতে নিজ নিজ অট্টালিকায় বসিয়া থাকেন ও সতত এরূপ আদর ও যত্নে রক্ষিত হন যে বাতাস পর্য্যন্ত তাঁদের কোমল আননের উপর জোরে বহিতে ভয় পায়, সেই অল্প সংখ্যক মহিলাদিগকে তাঁহারা জগতের সমস্ত নারীজাতির প্রতিকৃতি স্বরূপ ভাবেন। সে কারণে, জীবনযুদ্ধে অপারগ ঐরূপ কল্পনা-সৃষ্ট নারীজাতিকে মন হইতে দূর করিয়া—তাহাদের স্ত্রীসুলভ নম্রতা, পবিত্রতা ও মিষ্টতা যে এরূপ অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর রূপে গঠিত নয় যে, কাঁচের আল্‌মারীতে পোরা না থাকিলে অক্ষুণ্ণ থাকে না—ইহা স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কি অধিক শ্রেয় নয়? আর সব দিক দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদের আশঙ্কা—স্বাধীন জীবনের সরল ও মার্জ্জিত পথে ও গভীর পরিশ্রমের মধ্যে নহে, পরাধীন জীবনের কুটিল পথে ও অলসতা অকর্ম্মণ্যতাই উহার আকর।

এখন স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরা কি রূপ ভাবে, আমরা সে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিব। ঐ মতে স্ত্রীলোকেরা একেবারে নীচ জাতি, ও কেবল পুরুষের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই তাদের সৃষ্টি ; সে কারণে নারীদিগকে পুরুষের সঙ্গে সমান পদে বসাইবার প্রয়াস পাইলে, সকলে উহাকে যেন উচ্চজাতির প্রাধান্য ভাঙ্গিতে উদ্যত ভাবিয়া খড়্গহস্তে ঐ প্রয়াসের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। আদিম কাল হইতে স্ত্রীজাতির চিরস্থায়ী ও বংশপরম্পরা পরাধীনতাই ঐরূপ সাধারণ বৈরভাবের কারণ। ঐ ভাব সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের লোকদের মধ্যেই দেখা যায় ; সর্ব্ব জাতির উন্নত সাহিত্যে ও নিম্নশ্রেণীদের সঙ্গীতেও ঐ ভাব সমান রূপে রাজত্ব করে ; আর ঐ উঁচু নীচু ভাব লোকের মনে এরূপ

বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে উহা শুনিলে কিছুই আশ্চর্য্য বা অসাধারণ বোধ হয় না।

যত কবি, দার্শনিক, উপন্যাস লেখক ও ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরাও অন্যান্য সাংসারিক লোকদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের অক্ষমতা ও অধীনতা বিষয়ে এক ভাবে গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গে আবার নারীরা নিজেও অভ্যাসসিদ্ধ বোধ অনুসারে আপনাদের নীচতার গানে যোগ দেন। রোমান কবি লিওপার্ডি[১] এই বলিয়া স্ত্রীদের নামে দোষারোপ করেন যে, "কোন প্রসিদ্ধ কবি বা পণ্ডিত যদি কুৎসিত কিম্বা অঙ্গহীন হন, তাহা হইলে নারীগণ তাঁহাকে ঘৃণা করে।" আর একজন বিখ্যাত জর্ম্মণ দার্শনিক স্ত্রীদের বিষয়ে বলিয়া গিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদের হইতে আমরা কি আশা করিতে পারি? তাহাদের চুল বড় আর মন ছোট।" তা ছাড়া আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও নারীজাতির অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে গান ও কবিতার অভাব নাই। কবি ও পণ্ডিতদের ঐ সব উক্তি পড়িলে আমাদের লজ্জা করে অথচ হাসি পায়। কেন না ইহা সকলেই জানেন যে স্ত্রীদের অপেক্ষা পুরুষেরা নির্গুণ সৌন্দর্য্যের অধিক আদর করিয়া থাকেন। আর রূপবান অথচ নির্গুণ পুরুষকে অতি অল্প নারীই দয়ার চক্ষে দেখে। তবে ইহা সত্য, যে, স্ত্রীলোকেরা বহুদিন পরাধীনা থাকিয়া অনেক উচ্চগুণ হারাইয়াছে, তথাচ দুই একজন নারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে ক্ষুদ্রমতি ইত্যাদি নাম দেওয়া কবি ও দার্শনিকদের উচিত নয়। বিশেষ, ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পুরুষেরাই প্রথম হইতে স্ত্রীদের উপর নানা কৃত্রিম দোষারোপ করাতে তাহারা এখন ক্রমে অতি হীনাবস্থায় আসিয়াছে; আর তাহাদিগকে ঐ রূপ নীচ ভাবার অভ্যাস হইতেই তাদের প্রতি সকলের ঘৃণা ক্রমে বাড়িয়াছে।

কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসভ্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্য জ্ঞান ও সম অধিকার লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক ও সাংঘাতিক বাধা। আমরা দেখিতে পাই যে এই ধারণা বর্ব্বর ও অমার্জ্জিত জাতিদের মধ্যে এরূপ দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নারীরা যে কেবল পুরুষের সাংসারিক সুবিধার জন্য এ জগতে জন্মায় না, এ উন্নত ভাব তাহারা মনে ধরিতেও অক্ষম। এমন কি, ইউরোপেও যে জাতিরা সভ্য ও মার্জ্জিত বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত, তাহাদের মধ্যেও ঐ পুরাতন বিশ্বাসের অনেক চিহ্ন দেখা যায়। বিশেষ, স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের ঐ প্রভুত্ব হইতে যে কত আঁধার ও দুঃখময় ঘটনা এ জগতে নিরন্তর ঘটিয়া থাকে, এই একটী প্রবন্ধে সেই সব ভয়ঙ্কর শোচনীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমাদের সাধ্য নয়। কিন্তু আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে শীত গ্রীষ্ম-প্রধান প্রায় সমস্ত দেশে ও সভ্য অসভ্য প্রায় সকল জাতির সমাজেই স্ত্রীজাতির প্রতি ঐ পশুভাব এত অনিষ্টের মূল হইয়াছে যে, লোকে নারীদিগকে সচরাচর নিকৃষ্ট পদার্থ ভাবিয়া সংসারে তাহাদিগকে মানুষের যত স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করে; পরে কেবল স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য, তাহাদের শরীর, মন ও আত্মা পর্য্যন্ত জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। সে কারণে, যত দিন না স্ত্রীজাতিও জগতে মানবজাতি ও পুরুষের সমান, বরং উঁচু বই নীচু নয়, এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইবে, ও বালক ও তরুণ অবস্থা হইতে পুরুষের মনে নারী সম্বন্ধে যেরূপ নীচ

ভাবের দ্বারা বিপ্লব ঘটে, যতদিন না সেই ভাবের বিনষ্ট সহকারে তাহাদের হৃদয় নীতিধর্ম্ম বলে মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া রমণী-কুলের প্রতি উপযুক্ত মান্য ও ভক্তি প্রবণ হইবে, আর যত দিন না, পুরুষ যেমন কেবল স্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, নারীও সেইরূপ শুধু পুরুষের নিমিত্ত জন্মায় নাই—এই বিশ্বাস মানুষের শিরায় শিরায় বসিয়া যাইবে, ততদিন মানবসমাজকে ঐ বিপদজনক ও সাংঘাতিক পীড়ার ফল হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

ঐ সব উপরিউক্ত তুলনা ও দুই জাতির দোষ গুণের আলোচনা দ্বারা আমরা এই এক সিদ্ধান্ততে আসি, যে, স্ত্রীজাতির অতি অল্প স্বাভাবিক হীনতা ও জননীর কর্ত্তব্য একত্র হওয়াতে পুরুষজাতির প্রতিই উভয়ের কর্ত্তৃত্ব ও শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। তথাচ তাহাদের ঐ অক্ষমতা এরূপ নহে যে তাহার জন্য নারীজাতি সামাজিক ও সাধারণ সমস্ত কাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত থাকিতে পারে, কিম্বা মানবজাতির যে সব অধিকারে পুরুষের দখল আছে, সেই সব স্বত্ব হইতে তাহারা বঞ্চিত ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে ইহাও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, "আচ্ছা, যদি সচরাচর ঐ সিদ্ধান্তই ঠিক বলিয়া ধরা যায়, ও স্ত্রীজাতির কেবল সামান্য স্বাভাবিক অক্ষমতা ভিন্ন, তাহাদের প্রতি আইন ও রীতিনীতি দ্বারা আরোপিত যত কৃত্রিম বাধা ও অপারগতাকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ ও নারীগণ ঐ নূতন ব্যবস্থা হইতে কি উপকার পাইতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরদান কালে সদ্যপ্রাপ্ত ও ভবিষ্যৎপ্রাপ্ত ফলের প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ গার্হস্থ্য, সামাজিক ও সাধারণ জীবনের সমস্ত বিষয়ে স্ত্রীজাতির অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অনেক বংশ লাগিবে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ভাবিতেও পারেন নাই যে মানব সমাজ ক্রীতদাস বিনা কখন গঠিত ও স্থিত হইতে পারে। সেইরূপ আমরা এখনও—যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমানে দাঁড়াইবে, ও সংসারের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুরুষের সঙ্গে সমান স্বত্বভোগ করিবে—এরূপ সুন্দর ও উন্নত মানব সমাজের গঠন পরিষ্কাররূপে মনে করিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বোধ হয়, যে, স্বাভাবিক নিয়ম সকলের স্বাধীন ও অবাধ ব্যবহার ও চালনা দ্বারা সময়ে ঐ নূতন ব্যবস্থা ও সম্বন্ধ দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবে, আর সমাজের ঐ নূতন বাঁধুনী এখনকার অপেক্ষা আরো অধিক শক্ত ও নিরাপদ হইবে, কেননা স্বেচ্ছাচারী ও কৃত্রিম প্রভেদের পরিবর্ত্তে দুই জাতির মধ্যে কেবল স্বাভাবিক বিভিন্নতার উপর উহার ভিত্তি নির্ভর করিবে।

যাহাহৌক উহা হইতে কতক সদ্যপ্রাপ্ত ফলও পাওয়া যাইতে পারে। সকল প্রকার শিক্ষা ও সাধারণ কাজে স্ত্রীজাতিকে প্রবেশ করিতে দিলে, উহা তাহাদের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিতে নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগাইয়া তুলিবে। আর অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলারা যখন পতি বা পিতার অবর্ত্তমানে অনাথিনী হইয়া পড়েন, তখন তাঁরা নিজের ও সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। আর ঐরূপে ভদ্র ও স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে জানিলে হাজার হাজার দরিদ্র বিধবা অর্থের জন্য লোভাকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবে না। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে আমরা

দেখিতে পাই, পরিবারের কর্ত্তা পীড়িত বা কর্ম্মে অপরাগ হইলে তিনি তাঁর অসহায়া স্ত্রী ও শিশুদের দুরবস্থা দেখিয়া যারপর নাই ক্লেশ পান, কিন্তু তাঁর পত্নী যদি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, কেরাণী বা ধাত্রী ইত্যাদি কোন কর্ম্মের দ্বারা ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিক্ষিত হন, তাহা হইলে ঐ পীড়িত ব্যক্তির হৃদয় শেষকালে ঐরূপ ভবিষ্যৎ ভাবনাতে অত আকুল হইবে না, আর তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর পরিবারও দুঃখক্লেশ ও অভাবে চিরজীবনের মত কষ্টে পতিত রহিবে না। আর স্ত্রীলোকেরা বাল্যাবস্থা হইতে সকল কাজ নিয়মমত করিতে শিক্ষিত হওয়ায় তাঁদের সংসার আরো অধিক সুশৃঙ্খলাময় ও ধর্ম্মের আশ্রয় হইবে।

আর ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে উভয়জাতির কার্য্যক্ষমতা ও কর্ম্মশক্তি একত্র হইলে মানব সমাজ আরো অধিক বল পাইয়া অধিক কর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে। আর সকল কাজে স্বাধীনভাবে সমান ও অনাটক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়াতে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই যত প্রধান কাজ পাইবেন, সুতরাং সকল কর্ম্ম অধিক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আবার অন্যদিকে ইহাও আমাদের দেখা উচিত যে, ঐ মহালাভের জন্য সমাজ অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হইবে কি না। কেননা, অনেকে এ রকম ভয় করিয়া থাকেন যে উভয় জাতিতে জীবনযুদ্ধে সকল কাজে সমানভাবে আড়াআড়ি করিলে উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহা বিনাশ পাইবে। আর তাহা হইলে লোকে বিবাহ বন্ধনকে তত মান্য করিবে না বা পরিণয়ে ইচ্ছুক হইবে না। তাহা ছাড়া, নারীগণ বিবাহ ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রতা ও সামাজিক পদ পাওয়াতে উদ্বাহের ভার ও বন্ধন বহিতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু এ সকল ভয় একেবারে অমূলক ভাবিয়া সহজেই মন হইতে দূর করা যাইতে পারে। যতদিন মানব-স্বভাব এখনকার ন্যায় একরূপ থাকিবে, ততদিন উহার শারীরিক ও নৈতিক বাসনা স্ত্রী পুরুষকে একত্র আকৃষ্ট করিবে ও বরাবর উহাদের মধ্যে কোন দীর্ঘস্থায়ী বিপক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারিবে না। বিশেষ এই সকল স্ত্রী সম্বন্ধীয় তর্কেতে আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রীদের প্রায় সমসংখ্যক পুরুষ নারীজাতির পক্ষ লইয়া থাকেন, আর সমসংখ্যক বা অধিকাংশ রমণী পুরুষদের দিকে, অর্থাৎ নিজেদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করেন। আর যে সব লোক "আমরা স্ত্রীদের পুরুষ বানাইতে চাই," এই বলিয়া নারীজাতির প্রকৃত উন্নতির বিপক্ষতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, যে প্রকৃতি দেবীকে স্বাধীনতা দিলে উহা অন্যান্য দেবীর ন্যায় নিজেই নিজের পথ দেখিয়া এরূপ সতর্কভাবে চলিবে যে, তাহাতে স্ত্রীপুরুষ জাতির মধ্যে কখন কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বা শত্রুভাব ঘটিতে পারিবে না ; আর স্ত্রীজাতিও কখন পুরুষজাতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে না।

আবার, যেমন পরিবার-বন্ধন সভ্য সমাজের ভিত্তি স্বরূপ, সেইরূপ সামাজিক আইনের বিশেষ নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষের যাবজ্জীবন বন্ধন অর্থাৎ বিবাহ পরিবারের মূলস্বরূপ। সে কারণে মানুষের কথা কহিবার শক্তির ন্যায় উহাও একেবারে মানবীয় ; সুতরাং যতদিন মানবসমাজ প্রচলিত থাকিবে, ততদিন বিবাহও নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। মানবজাতির সভ্যতা যত প্রকৃত ও উন্নত হইবে, ঐ পরিবার-বন্ধন ও উহার মূল তত দৃঢ় ও পবিত্র হইবে। আর উভয়

জাতির মধ্যে যে সব পাপ সম্বন্ধ ও পশুভাব হইতে সমাজে ও সংসারে মহা অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, সমাজ তখন নিজেই সে সকলকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।

অবশ্য স্ত্রীজাতিকে ঐ নূতন ও প্রকৃত স্বাধীনতা দিলে প্রথম প্রথম কিছুদিন তাহার অপব্যবহার ঘটিতে পারে ; কেন না শত শত বৎসরের কৃত্রিম ও অনুচিত বন্ধনে বদ্ধ থাকাতে নারীজাতি যে সব দোষ ও দুর্ব্বলতাতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা অবিলম্বে দূর হইবে না। কিন্তু স্বাভাবিক-গতিসিদ্ধ যন্ত্রণা ও দণ্ড দ্বারা উহার শিকড় উপাড়িতে হইবে ; আর আমরা শিশুকাল হইতে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে যে সব অভ্যাস, রুচি ও ইচ্ছাতে আসক্ত হইয়াছি, যে সকল চিন্তা ও ভাব আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে, সেই সব প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অভিলাষ ও ভাবকে অনেক কষ্টে মন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। কারণ, মানবজাতির উন্নতগতির প্রতি সোপানই ঐরূপ আন্তরিক অভ্যাস ও চিন্তার পরিবর্ত্তন দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে ক্ষণেকের জন্য ক্লেশ পাইলেও উহা হইতে চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যাইবে।

আর ইহাও আমাদের একান্ত বিশ্বাস, যে যখন স্ত্রীলোক ও পুরুষ জীবনের সকল কর্ম্মে ঐরূপ সমানভাবে পরস্পরের সাহায্য করিবে ও সকল অধিকার ও কর্ত্তব্যের সমান ভাগ লইবে ; যখন ধর্ম্মনীতিভাব উভয়জাতির উঁচুনীচু জ্ঞানের উপর নির্ভরের পরিবর্ত্তে মানবজাতির যথার্থ স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে ; ও যখন পবিত্র ধর্ম্ম ও মানের অর্থ স্ত্রীপুরুষে সমানভাবে প্রকৃতরূপে বুঝিবে, তখনই কেবল আমরা মানব সমাজকে যত আবর্জনা হইতে পরিষ্কৃত ও ধৌত দেখিবার আশা করিতে পারি ; তখনই কেবল মানব পরিবার স্থিরভাবে ও উঁচুমুখে অসভ্যতার উপর সভ্যতার ও পশুভাবের উপর মানবীয় ভাবের জয় সাধনে অগ্রসর হইবে ; আর তখনই কেবল মানুষ, জীবনের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে অবিনাশী ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

ইংরেজ সমাজ

আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় একটা পুরাণ কথা আছে, 'যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরুণী' ;—বাস্তবিক এ কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি। কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে ঘর না করিলে তাহার উপরভিতর ভালমন্দ কখন সম্যকরূপে বুঝা যায় না। মানবচরিত্র সকল স্থানেই এরূপ বিচিত্র যে, লোকে সর্ব্বদাই অপরিচিত বা পরের কাছে যেন একটা মুখোস পরিয়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া থাকে। ঐ মুখোস খুলিয়া প্রতি ব্যক্তি বা প্রতি জাতির আসল মুখ দেখিবার ইচ্ছা হইলে, ঠাকুরের আসল মুখ দর্শনের ন্যায়—সুধু প্রণামি দিয়া ঐ আশা পূরাইবার যো নাই ; উহার জন্য তাহাদিগের সহিত ঘর করিয়া রাতদিন তাহাদের কাছে থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা সময়ে মুখোস ভেদ করিয়া আসল মুখের সহিত প্রকৃতরূপে পরিচিত হইতে পারি। সেইরূপ কোন দেশের অবস্থা ভাল করিয়া জানিতে বাসনা হইলে, তাহার অধিবাসীর সহিত সকল বিষয়ে মিশিয়া একত্র বাস না করিলে উহার বাহির ভিতর পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করা একেবারে অসম্ভব।

'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'য় আমি ইংরেজ জাতির গার্হস্থ্য ও দৈনিক জীবন প্রভৃতি সাধ্যমত আঁকিয়া দেশীয় ভ্রাতাভগিনীদিগের সম্মুখে ধরিয়াছিলাম ; কিন্তু তখন ইংলণ্ডের আসল মুখ অর্থাৎ সমাজের সহিত আমার উত্তমরূপে পরিচয় না হওয়ায়, উহা তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারি নাই। সুতরাং এই প্রস্তাবে সেই চিত্রটী তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। কোন অপরিচিত দেশে আসিলে, প্রথম প্রথম তাহার সকল দ্রব্যই ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। বিশেষ, কোন দেশ সভ্য বা অসভ্য এই জ্ঞানানুসারে আমরা সেই স্থানের সকল বিষয়ের ভাল বা মন্দ কেবল এক পাশ হইতেই দেখিতে পাই। আমরা যদি আফ্রিকার কোন অসভ্যজাতির মধ্যে বেড়াইতে যাই, তাহা হইলে হয়ত অভ্যাসসিদ্ধ জ্ঞানানুসারে আমরা তাহাদের 'সকল বিষয়ই মন্দ'—অনায়াসে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকি। আর ইউরোপের কোন দেশে ভ্রমণ করিলে হয় ত কোন কোন স্থানের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া, 'তাহার সমস্তই ভাল'—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু ঐ উভয় দেশে উহার অধিবাসীদিগের সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলে, আমরা অসভ্য কুলুদিগের সমাজ ও জীবনে যেরূপ অনেক ভাল ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হই, সেইরূপ ইউরোপীয় সভ্য জাতিদের মধ্যেও নানা প্রকার বীভৎস আচার ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হই। বিশেষ, কোন সভ্য লোকদের সমাজে কোন প্রকার মন্দ রীতিনীতি প্রচলিত থাকিলে, তাহারা ঐ সকল বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ঢাকিয়া, সোনার শালগ্রামের ন্যায় অপরিচিতদিগের নিকট সমাজের স্বাভাবিক মুখ মুখোসে বা খোলে আবৃত রাখিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু যদি কেহ নাছোড়বান্দা হইয়া দিন রাত তাহাদের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে অন্ততঃ স্নান বা উৎসবের সময়, ঐ আসল প্রতিমূর্ত্তি দর্শন তাহার অদৃষ্টে ঘটে। পাঠক পাঠিকারা মনে করিবেন না, যে, আমি ইংরেজসমাজকে একটী কাল পাথরের নোড়ার মত বর্ণনা করিতেছি, উহার গায়ে সাদা বা লাল কোন উজ্জ্বল বর্ণের রেখা নাই। তবে আমার

এ সকল লিখিবার কারণ এই যে সাত বৎসর ইংলণ্ডে 'হত্যা' দিয়া এতদিনের পর আমি উহার আসল মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছি, আর ঐ প্রকৃত মুখ হইতে যাহা কিছু ফুল চন্দন পাইয়াছি তাহাই কুড়াইয়া, দেশে লইয়া যাইবার জন্য, থলিতে পূরিয়া রাখিয়াছি।

কিন্তু পাঠকেরা যদি আবার জিজ্ঞাসা করেন, যে 'ইংরেজ সমাজ কি সুধুই ফুল চন্দনময়?' তাহা হইলে আমার উত্তর এই—যে, রোগীরা যখন বিশ্বেশ্বরের নিকটে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন জাগিয়া ও স্বপ্নে ঔষধের সঙ্গে তাহারা কত প্রকার ভয়ঙ্কর ও বীভৎসজনক দ্রব্য দেখিতে পায়, কিন্তু ঐ সব কাদা মাটী, আল্‌কাতরা প্রভৃতি হইতে বাছিয়া তাহারা কেবল ধন্বন্তরী ঔষধটী লইয়াই ঘরে ফিরিয়া আইসে ও উহা সেবনে স্বাস্থ্য লাভ করে। সুতরাং আমাদের এ পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়, এখন সাধ্যমতে অন্য জাতির পীড়ার কারণগুলি ত্যাগ করিয়া তাহাদের ঔষধগুলি আহরণ করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? আর উহাই আমার উদ্দেশ্য। তথাচ, আমরা মানবজাতি এরূপ জঞ্জালপ্রিয় যে, ইংরেজ সমাজের কেবল ফুলচন্দন সংগ্রহের বাসনা থাকিলেও আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দু একটা কাঁটাঘাসও কুড়াইয়াছি, আশা করি, উহা পাঠক পাঠিকাদের হাতে ফুটিবে না।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যেরূপ অসীম প্রভেদ, হিন্দু ও ইংরেজ সমাজও সেইরূপ মহাসাগরের দুই সীমার দুইটী দেশের ন্যায় সম্পূর্ণরূপ পৃথক। আমাদের দেশে জাতি অনুসারে সমাজ গঠিত হয়, আর এদেশে ধন ও পদের দ্বারা উহা বিভক্ত হইয়া থাকে। গড়ে ইংলণ্ডে তিনটী সমাজ প্রচলিত। 'অ্যারিষ্টক্র্যাটিক সোসাইটী' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত সমাজ, 'মিড্‌ল ক্লাস্' বা মধ্যশ্রেণীয় ও 'লোয়ার ক্লাস্' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর সমাজ। কিন্তু "সোসাইটী" বা সমাজ বলিলে এদেশে প্রায় সম্ভ্রান্ত সমাজই বোঝায়। কেননা, মধ্যশ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইলেও তাহারা ঐ উচ্চ সমাজেরই অনুকরণ করিয়া চলে। আর নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে আমাদের দেশের ধোবা, নাপিত, তাঁতি, গোয়ালা প্রভৃতির ন্যায় অতি অল্পই সমাজের রীতিনীতির পালন, বা নির্দ্দিষ্ট সামাজিক জীবন দেখা যায়। ঐ তিন সমাজই সচরাচর নিজ নিজ শ্রেণী বা দলের মধ্য হইতে স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে।

যুবরাজ, যুবরাণী প্রভৃতি মহারাণীর পরিবার সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রধান সভ্য, তাঁহাদের পর যত ডিউক, মার্কুইস, আর্‌ল পদধারী "লর্ডেরা।" ইহাদিগের পরে বিদেশীয় দূত, পার্লামেন্টের সভ্য প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেরা সমাজের আসন গ্রহণ করেন। মধ্যশ্রেণীদের সমাজ অতি বিস্তৃত ; দেশের যত বড় বড় ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী, অধ্যাপক, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী প্রভৃতি লোকেরা—অর্থাৎ যে লোকেদের মাসে তিন চারি হাজার হইতে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা আয়—তাহারা সকলে মধ্যশ্রেণীর সমাজের সভ্য। আর ঐরূপ ধনী লোক ইংলণ্ডে যে কত আছে, তাহার ঠিক নাই। ঐ দুই সমাজ বাদে অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত অধিবাসীরা নিম্ন সমাজের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের দেশের ন্যায় বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা উৎসবাদির সময়ে সমাজের লোকদিগকে কেবল খাওয়ালেই এদেশের সামাজিক প্রথা পালন করা হয় না। এখানে প্রতি সমাজ একতার সূত্রে এরূপ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ যে একজন সভ্যকে আঘাত করিলে, অন্যান্য সভ্যেরা পর্য্যন্ত গায়ে ব্যথা পায়, একজনের মিথ্যা নিন্দা করিলে অন্যেরা কষ্ট অনুভব করে, এবং একজনের অনিষ্ট সাধন করিলে সকলে একত্র

মিলিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়। ইংলণ্ডের যে এত তেজ, বল ও কার্য্যশক্তি, সে সমুদায় প্রধানতঃ উহার উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ফল। আমরা জগৎ সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, যতদিন কোন জাতির সমাজ পুরাতন ও অনিষ্টকারী রীতিনীতি সকল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে থাকে, ততদিন সেই জাতির শ্রীবৃদ্ধি ও বিক্রমের পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর যেই উহার সমাজ অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, অম্‌নি সে জাতিও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। গ্রীস, রোম ও স্পেনের প্রাচীন ইতিহাস হইতে আমরা উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। আবার ফরাসীজাতির প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস ও রাজবিপ্লবেও উহা স্পষ্ট দেখা যায়।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইর পিতা, পিতামহ ও তাঁহার নিজের রাজ্যেও ঐ দেশের সমাজ এরূপ অলস ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে যে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে উহা কলঙ্কস্বরূপ দাঁড়ায়। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের উন্নতি ও ধর্ম্মালোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় ভোগ ও বিলাসে রত থাকে, রাজা ও ডিউকেরা প্রজা ও সাধারণ লোকদের প্রতি নানা অত্যাচার পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্ত করে। আর ফরাসী সম্ভ্রান্ত-সমাজ হিংসা, আড়ম্বর, পরনিন্দা অহঙ্কার ও ব্যভিচার প্রভৃতি যত ঘৃণিত রিপু ও অভ্যাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। ক্রমে দেশ ধারকর্জ্জ, আলস্য ও বিবাদে অধঃপাতে যাইবার যো হয়। কিন্তু সাধারণ ফরাসীদের কার্য্যক্ষমতা ও চঞ্চল স্বভাব দ্বারা ফ্রান্স ঐ মহা পতন হইতে রক্ষা পায়। তত্রাচ ঐ উদ্ধারের জন্য সে দেশে যে কত রক্তপাত ও ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যখন বিলাস মগ্ন সম্ভ্রান্তদের উৎপীড়ন সহিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন কাটান অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন যত শ্রমজীবী ও কৃষকেরা মিলিত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইল ; ও যত সম্ভ্রান্তদের ও রাজপরিবারের বিনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। কত পরিশ্রম, রক্তপাত, হত্যা ও যন্ত্রণা দ্বারা ফরাসীরা যে তাহাদের দেশকে ঘৃণিত সমাজের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া উহাতে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী ও ভিন্নরূপ সংশোধিত সাধারণ সমাজের ব্যবস্থা স্থাপন করে, তাহা, যাঁহারা ফরাসী রাজবিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। ঐ মহা বিপ্লবে রাজা রাণী ও রাজপরিবারের যত প্রধান প্রধান সভ্যেরা নিজেদের আলস্য, অপব্যয় ও স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ডস্বরূপ সাধারণদিগের হাতে প্রাণ হারায়। তা ছাড়া কত অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবার যে সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিও ঐ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস ঘটনা অতি দুঃখের বিষয় তথাপি সমস্ত জীবন ঘৃণা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় বহিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা ওরূপ মৃত্যু শতাংশে শ্রেয়। বিশেষ, কোন সমাজ বা জাতিকে গোড়া হইতে সংশোধন ও উন্নত করা যেরূপ মহৎ ব্যাপার, সেইরূপ নানা মহৎকাণ্ড সাধন ব্যতীত উহাতে সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়া অসম্ভব।

ইংলণ্ডের কী ধনী, কি দরিদ্র সকল সমাজই ক্রমাগত উহার অন্তর্গত যত পুরাণ ও অনিষ্টকারী রীতিনীতি সংশোধন করিয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত উন্নত করিবার প্রয়াস পায়। প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য মুটে পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে আরো অধিক উন্নত, সমাজকে আরো দলবদ্ধ ও দেশকে আরো ধনপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী দেখিবার ইচ্ছা করে।

অবশ্য আমাদের দেশেরও প্রায় সকলেই আপনাদিগকে আরো উন্নত ও ধনী দেখিবার বাসনা করেন। কিন্তু ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসীতে এই প্রভেদ যে, আমরা কেবল ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি ; আর ব্রিটনবাসীরা যতক্ষণ না সেই বাসনা পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ প্রাণপণে খাটিতে এক দণ্ডের জন্য ক্ষান্ত হয় না। কাজেই ইংলণ্ডের প্রধান সমাজে প্রতি বৎসর যে সব সভ্য অলস, বিলাসী বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, নিম্নশ্রেণীর সমাজ হইতে তাহার দ্বিগুণ লোক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে উহাতে প্রবেশ করিয়া ঐ অকর্ম্মণ্য সভ্যদিগকে পদচ্যুত করে। সুতরাং সমাজ সর্ব্বদাই কার্য্যক্ষম, পরিশ্রমী, সৎ ও অধ্যবসায়ী সভ্যে পূর্ণ হইয়া ক্রমে উন্নত ও মার্জ্জিত হইতে থাকে।

আসিয়া ও ইউরোপের অনেক জাতিরা কিছুদিনের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত হইয়া আবার অবনত হইয়া পড়িয়াছে, সেজন্য সকলে এরূপ মনে করেন যে ইংলণ্ড এখন যেরূপ প্রসিদ্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উহারও শীঘ্র অধোগতি হইবে। সময়ে যে ইংলণ্ডও অন্যান্য জাতিদের ন্যায় নীচে নামিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থা উহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত হইতে দিবে না। যতদিন ব্রিটন সমাজে বর্ত্তমান কার্য্যশক্তি, মানের ভয় ও মনের তেজ থাকিবে ততদিন ব্রিটনের ক্ষমতা অটল রহিবে। কিন্তু যে দিন উহার ঐ উচ্চ গতি থামিবে, সেই দিন উহা নীচের দিকে নামিবে। কেন না, স্বভাবের নিয়মানুসারে এ জগতের কোন বস্তু বা বিষয় কখন স্থির থাকে না।

আরো স্ত্রীলোক ও পুরুষের মিশ্রিত সমাজ দ্বারা ইংলণ্ড যে কত উপকার পায়, তার শেষ নাই। উভয়জাতি একত্র মিশামিশি, আলাপ ও কার্য্য করাতে সমাজের রীতিনীতি ও চালচলন সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার ও পাপের প্রতি দুই জাতিরই সমান ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। সর্ব্বদা মাতা ভগিনীর নিকট থাকাতে বাল্যকাল হইতে পুরুষদের স্বভাব যেমন ধর্ম্মশীল ও নম্র হইয়া আসে, সেইরূপ পিতা ভ্রাতার সহিত সর্ব্বদা অবস্থিতির দরুণ স্ত্রীলোকেরা অন্য দিকে তেজ, সাহস ও নির্ভয়তা শিক্ষা পায়। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে শুধু খেলিবার দ্রব্যের ন্যায় ভাবে না, সুতরাং ইংরেজ মহিলারা আত্মাভিমান বুঝিয়া যাহাতে বিদ্যা, জ্ঞান ও কথাবার্ত্তায় পুরুষ জাতির আদরণীয় হইতে পারে, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে। আর নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে এই প্রকার সুখ পাওয়াতে এদেশের শিক্ষিত লোকেরা আমোদ বা বিলাসের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া কখন অন্যত্র যায় না।

উচ্চশ্রেণীয় সমাজে প্রতি বালক ও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পুরুষ বাইশ বৎসর ও স্ত্রীলোক আঠার বৎসরের সময়—তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা মহাআনন্দে যত বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে মহারাণী ও রাজপরিবারের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। উহাকে ইংরেজীতে "প্রেজেন্টসন্ ইন সোসাইটী" বলে। ঐ সাধারণ পরিচয়ের পর তাহারা সমাজভুক্ত হয় ও সামাজিক সকল কাজে অধিকার পায়।

সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মাঝে মাঝে নাচ গান ও ভোজ দিয়া থাকেন। ঐ সকল নাচ ও ভোজে স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র মিশিয়া আলাপ পরিচয় ও গানবাজনা করে। আমাদের দেশের অন্যান্য আচার ব্যবহারের ন্যায় এদেশের নাচ ও ভোজও ভারতবর্ষীয় নাচ ও ভোজ হইতে একেবারে ভিন্ন। এখানে বাই বা খেম্‌টা নাচের প্রথা নাই। আর এদেশের ভোজে

কদাচ পাঁচ শত লোকের অধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র হয়। আমাদের দেশের মত পাড়াসুদ্ধ বা গ্রামসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ, ও ছোট বড় সকল ব্যক্তিকে মুক্ত হস্তে খাওয়ানর রীতি ইংলণ্ডে দেখা যায় না। স্বার্থপর ইংরেজদিগের অন্যান্য কাজের ন্যায় নাচগান ও ভোজেও কেবল আত্মতুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সচরাচর বিশেষ আলাপী বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভিন্ন কোন বাহিরের বা অজানা লোক উহাদের আমোদ আহ্লাদ ও ভোজনে যোগ দিতে পারে না। আর নিম্নশ্রেণীয় সমাজের লোকেরা উহাদের গৃহে উঁকি মারিতে পর্য্যন্ত ভয় পায়। যত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, বিশেষ যুবক যুবতীরা এক এক জোড়া, পরস্পরের কোমরে হাত দিয়া নিজেরাই নাচিয়া থাকে ও দুই চারি জনে বাজনা বাজায় ও গান করে। আপনাদিগের মধ্যে এইরূপ নাচগানে পরস্পরের সঙ্গে অধিক মিশামিশি হয়, ও উহারা অনলস ও কার্য্যতৎপর থাকে। কিন্তু ঐ নাচের একটা বিষয় আমাদের চক্ষে অতি লজ্জাস্কর ও নিন্দনীয় বোধ হয়; ঐ সব 'বল' বা নাচের জন্য ইংরেজ মহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ পরে, তাহা অতি অসভ্য ও সুরুচি বিরুদ্ধ। এত সভ্যতার গৌরব করিয়া উহারা যে কি প্রকারে ওরূপ নির্লজ্জভাবে সজ্জিত হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সুখের বিষয় আজকাল শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যে ঐ ঘৃণিত পোষাকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ দেখা যায়, সে জন্য আশা হয় সময়ে অন্যান্য অনেক মন্দরীতির ন্যায় উহাও ইংরেজ সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে।

ইংরেজ সমাজের আর একটি দোষ, উহা মানুষকে বাহ্যাড়ম্বর, অহঙ্কার, বিলাস, দম্ভ প্রভৃতি অনেক মন্দগুণ শিক্ষা দেয়। সকলের চেয়ে বেশী ধনী বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অনেকে আয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া জাঁকজমক দেখায়, অবশেষে আর আড়াআড়ি করিতে না পারিয়া দেউলে হইয়া পড়ে। নাচগান দেখার সময় উহারা অত্যন্ত অপব্যয় করে; শুনিয়াছি একজন লোক কেবল ফুলে বাড়ী সাজাইয়া কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল। অবশ্য, আমাদের দেশের ধনী লোকেরাও পূজা ও যাত্রা ইত্যাদিতে হাজার হাজার টাকা জলে ফেলিয়া দেন; কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভোজ ও নাচগানে এই প্রভেদ যে সেখানে একজন ধনীলোকের কল্যাণে কত গরীব দুঃখীরা খাদ্য ও আনন্দ পায়, আর এখানে একলসেড়ে ইংরেজরা আপনাদের লইয়াই ব্যস্ত। আর ধনী মহিলাদের ত কথাই নাই,— কিসে সর্ব্বাপেক্ষা দামী ও সুন্দর পোষাক ও গহনা পরিয়া সকলের চক্ষু আকর্ষণ করিবেন, কেবল মাত্র এই চিন্তাই যেন নিরন্তর তাঁহাদের মনে জাগরূক। নাচগান করা, থিয়েটরে যাওয়া, ঘোড়া বা গাড়ী চড়িয়া বেড়ান ও পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাতেই তাঁহাদের সমস্ত জীবন ও সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা ইহা পড়িয়া ভাবিবেন না যে সমগ্র ইংরেজ সমাজই ঐরূপ আড়ম্বর ও বিলাসের আকর; কেবল সম্ভ্রান্ত সমাজকেই ঐরূপ বিনাকর্ম্মে জীবন কাটাইতে দেখা যায়। এদেশের মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ লোকদের পরিশ্রম পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করা যেরূপ প্রধান কাজ, ঐসব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা আমোদ আহ্লাদে অর্থব্যয় করা সেইরূপ প্রয়োজনীয় ভাবে। কাজেই এক দল যেমন অপচয় করে, অন্যদল তেমনি সঞ্চয় করে, সেজন্য দেশ বা সমাজের উহাতে কোন অপকার হয় না। বিশেষ, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের এদেশে এই একটী গুণ দেখা যায়, তাহারা জীবিকা ইত্যাদির জন্য না খাটিলেও একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন কাটায় না। কোন না কোন

বিষয়ে মন ও শরীরকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখায় উহারা কার্য্যক্ষম হয়, ও সময়ে সময়ে ঐ কার্য্যশক্তির উদাহরণ দেয়। আপনারা আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত থাকিলেও স্বদেশের প্রতি তাহাদের কোন অবহেলা নাই। সাম্রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, উহাতে কখন্ কি চলিতেছে, সে সব বিষয়ে তাহারা সর্ব্বদা চোক রাখে। আর দেশের শাসন বা সামাজিক রীতিতে কোন দোষ দেখিলে উহারা তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পায়।

সবদিক দেখিলে ইংরেজ সমাজে দু একটী মন্দ রীতি নীতি চলিত থাকিলেও উহা অন্যান্য সকল সমাজেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি

পূর্ব্বে স্বদেশীয় ভগিনীদিগকে দেখাইয়াছি যে ইংরেজ মহিলারা ভারতনারীগণের তুলনায়—শুধু ভারতীয় কেন—প্রায় সমস্ত আসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশীয় নারীগণের তুলনায় অনেক শিক্ষিত ও স্বাধীন। তাহারা ঐ শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপে ও কতদিনে পাইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের ভারতবর্ষের অন্তঃপুর-ব্যবস্থার মত ইংলণ্ডে কোন পরিবারে স্ত্রীলোকের পুরুষ হইতে একেবারে পৃথক বাসের বন্দোবস্ত দেখা যায় না। তবে ইংরেজ নারীরা যে পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অনেক আটকে থাকিত ও প্রায় সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মতানুযায়ী চলিত তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর সাধারণ স্থানে বেড়াইবার সময় বা অপরিচিত লোকের সম্মুখে যাইবার সময় ইহাদের মধ্যে যে ঘোমটা দিবার রীতি ছিল তাহারও প্রমাণ আমরা ইতিহাস ও উপন্যাস ইত্যাদিতে অনেক পাই। বিখ্যাত সর ওয়াল্টর স্কটের 'আইভেনো'তে লেডি রয়েনা যখন দেখিলেন, টেম্পলার তাঁর প্রতি অভদ্রভাবে কটাক্ষপাত করিতেছে, তিনি অমনি ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিলেন। আরো, 'টুর্‌নেমেন্ট' বা ক্রীড়া যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা মুখে দিয়া বসিয়া পুরুষের লড়াই দেখিত, ইত্যাদি। ইংরেজ রমণীর বর্ত্তমান মুখাবরণও (ইংরেজীতে যাকে ভেল বলে), সেই পূর্ব্ব অবগুণ্ঠনের অপভ্রংশ মাত্র। আর যদিও আজকাল অধিকাংশ ব্রিটন বাসিনীরা কেবল বিরূপ বা বয়স ঢাকিবার আশায় মুখে ভেল পরে, তথাচ, এদেশে দুচারজন এমন স্ত্রীলোকও পাওয়া যায় যাঁহারা যথার্থ লজ্জা বা নম্রতাবশত সাধারণ স্থানে ভেল ব্যবহার করেন। তবে মুখ আচ্ছাদনের রীতি না থাকিলেও এদেশের ভদ্র স্ত্রীলোকদের টুপি এখন তাহাদের ঘোমটার কাজ করে। আমাদের দেশে যেমন কোন ভদ্রমহিলা মুখ না ঢাকিয়া কখন বাড়ীর বাহির হন না, এখানেও ভদ্রস্ত্রীরা সেইরূপ খোলামাথায় কখন রাস্তায় বাহির হন না। উহা করিলে যে জাত যায় তা নয়, তবে রীতিনীতির জোর সব দেশেই সমান, যা বরাবর চলিয়া আসিতেছে কেহ তার বিরুদ্ধে গেলেই লোকে তাহাকে অভদ্র বা লজ্জাহীন বলে।

উক্তরূপ মুখ আচ্ছাদন প্রথা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যদায়ী টুপি ব্যবহারের মত নানা আটক ও অত্যাচার তাড়াইয়া ইংরেজ রমণীরা যে কত যত্ন ও পরিশ্রমে উহাদের অধুনাতন সুন্দর স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহা লিখিতে গেলে সমস্ত ব্রিটনের ইতিহাস তোলপাড় করিতে হয়, এই প্রবন্ধ তাহা হইলে এক প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে ; সে কারণে আমি অধিক দূরে না গিয়া কেবল দুতিন শত বৎসর হইতে বর্ত্তমান ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অবস্থা যত সংক্ষেপে পারি লিখিব।

ইংরেজ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা রাণী এলিজাবেথের সময় হইতেই একরূপ আরম্ভ বলিতে হয়। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাট আকবরের সমকালীন ছিলেন। তাঁর রাজত্বের পূর্ব্বে কেবল রাজরাণী ও বড় ঘরের মহিলারা যাহা কিছু লেখাপড়া শিখিতেন, তাহাও অতি সামান্য। রাণী এলিজাবেথ ভ্রাতার সঙ্গে সমানে শিক্ষিত হওয়াতে তিনি নিজ রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় উৎসাহ দিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকদিগের আক্রোশ

কমাইয়া দেন। কিন্তু তখনকার শিক্ষা এখনকার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট ছিল। কেবল ধনী ও দুচারজন মধ্যবিত্ত লোকের কন্যারা লেখাপড়া শিখিত, অন্যান্য সাধারণ বালিকারা বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। সেজন্য এলিজাবেথের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাও আবার ইংলণ্ড হইতে একরূপ চলিয়া যায়। তারপর ইংরেজ মহিলারা পুনরায় পূর্ব্বের মত মূর্খতা ও কুসংস্কার ইত্যাদিতে ডুবিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের ঐ অজ্ঞানতার অন্ধকার অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই কেননা, ইংলণ্ডে নানা কুসংস্কারময় কাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে হ্রাস ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধর্ম্ম প্রটেষ্টান্টদের প্রাদুর্ভাব ও স্থিতি হওয়ার সঙ্গে স্ত্রীজাতির অবস্থাও উন্নত হইতে থাকে। তথাপি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের ইংরেজ মহিলাদিগের অবস্থা খুঁজিলে আমরা তাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান শিক্ষা, স্বাধীনতা ও কার্য্যশক্তির রেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। তখন এম্ এ, বি এ, এম্ ডি, প্রভৃতি উপাধিধারী স্ত্রীলোকদের নাম ব্রিটনবাসীদের কাছে স্বপ্নস্বরূপ ছিল, আর স্ত্রীদিগের উচ্চশিক্ষার নামে নারী ও পুরুষ উভয় জাতিই খড়্গহস্ত হইতেন। ব্রিটনের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে রাণী অ্যানের সময় ইংরেজ স্ত্রীদের অবস্থা বর্ত্তমান ভারতমহিলাদিগের অধিক ঊর্দ্ধে ছিল না, বরং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক নীচে ছিলেন। তাঁহাদের ঐ সময়কার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মহা শিক্ষা ও উপকার নাই। অল্পশিক্ষা যে অজ্ঞতার অপেক্ষাও অপকারী ও বিপদের আকর, তাহা উহাতে স্পষ্ট দেখায়।

রাণী অ্যানের আগে ব্রিটনের সাধারণ নারীরা কিছুই শিক্ষা পাইত না বলিলেই হয় ; কিন্তু তাহাতে তাহাদের বেশী ক্ষতি হইত না কেননা, অতি অল্প ইংরেজ পুরুষই তখন শিক্ষিত ছিল ; স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুই মূর্খ থাকাতে ইংরেজ সংসার, আমাদের ভারতবর্ষের কৃষিপরিবারের মত, বেশ চুপচাপ ও মিল শান্তিতে চলিত। পুরুষেরা নিজেদের কাজ লইয়া দিন কাটাইত, আর স্ত্রীরা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিত। রাণী অ্যানের সময়ে অ্যাডিসন, পোপ, ষ্টীল, সুইফট[২] প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারেরা ভাল ভাল প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া পুরুষদের মনে শিক্ষা ও জ্ঞানের রুচি জন্মাইয়া দিলেন ; তাহার পর যখন বিদ্যাবান স্বামী ও মূর্খা স্ত্রীর মিলনে ইংরেজ পরিবারে মহা গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইল তখন অমনি ব্রিটন নারীরা এক এক বই কিনিয়া লেখাপড়া শিখিতে বসিলেন। অতি অল্প বালিকার ভাগ্যেই যথার্থ শিক্ষা ঘটিল—কেননা, স্ত্রীলোকদের স্কুল বা কলেজ তখন কোথায়? অধিকাংশ ভদ্রলোকের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য 'কন্‌ভেন্টে' অর্থাৎ ধর্ম্মাশ্রমে গিয়া দুতিন বৎসর থাকিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা আমাদের দেশের বর্ত্তমান জেনানা-শিক্ষার মত—শিক্ষয়িত্রীরা নিজ নিজ ধর্ম্ম ও বিশ্বাস লইয়াই পাগল ; বালিকারা কিছু শিখুক বা নাই শিখুক, কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক, তাহাদিগকে একবার নিজ নিজ মতের মধ্যে আঁকড়াইতে পারিলেই হইল। কাজেকাজেই দেশে অল্প শিক্ষিত স্ত্রীলোকের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দম্ভ, অহঙ্কার, অলসতা, ও বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি যত মন্দগুণ আসিয়া ইংরেজ স্ত্রীদের হৃদয় অধিকার করিল। এমন কি ধনী সমাজের অনেক নারীদিগের চরিত্র পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিল, আর রাজ পরিবারের যত বড় বড় লোকদের মধ্যে নানা বিবাদ, কলহ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঘটিতে লাগিল। কারণ, মানুষ যতদিন

একেবারে মূর্খ থাকে, ততদিন তাহারা পাখাহীন শাবকের মত, নিজ নিজ বাসায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকে, কিন্তু অল্প শিক্ষিত লোক নূতন ডানাপ্রাপ্ত পাখীর ন্যায় দিন রাত ছট্ ফট্ করিয়া বেড়ায় ও খাদ্য ইত্যাদি লইয়া অন্যান্য পাখীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, আর অনেক সময়ে নিজের ক্ষমতাতীত দূরে উড়িয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে পড়িয়া যায় ও অবশেষে প্রাণ হারায়।

সুখের বিষয়, ইংরেজ স্ত্রীলোকদিগকে অধিক দিন ওরূপ মাঝ পথে দাঁড়াইতে হয় নাই। নানা কষ্ট, যন্ত্রণা, ঘৃণা ও অবমাননা সহিয়া প্রায় এক শ বৎসর পরে তাহারা আপনাদিগের অবস্থা সংশোধনে যত্নবতী হয়, সেই অবধি রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সঙ্গে ব্রিটনের অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় ব্রিটন মহিলারাও জ্ঞান ধর্ম্ম, শিক্ষা ও স্বাধীনতায় ক্রমশ উপরে উঠিতেছে। ইংরেজ স্ত্রীদিগের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা ও অবাধ স্বাধীনতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের ফলে হইলেও এবং স্ত্রী-হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ, প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মযাজক ও উপযাজকেরা নারীদের মানসিক উন্নতির জন্য নানা উপায় করিয়া তাহাদিগকে দলিত অবস্থা হইতে তুলিয়া সাধ্যমত উচ্চপদে বসাইবার প্রয়াস পাইলেও ব্রিটনবাসিনীদিগের এখনকার শিক্ষিত ও মার্জ্জিত অবস্থা তাহারা নিজেদের যত্ন ও পরিশ্রমবলেই পাইয়াছে। যেমন কাহারও কোন আভ্যন্তরিক পীড়া জন্মিলে তার গায়ের উপর হাজার ঔষধ ও প্রলেপ লাগাইলেও বিশেষ কোন ফল দর্শে না, সেইরূপ কোন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষদের যথার্থ উন্নতি অপর কোন জাতি বা দলের সাহায্যে সাধিত হয় না ; কিন্তু তাহারা নিজে একবার উহাতে মনোযোগী হইয়া উঠিলে—রীতিনীতির জোরই বল, আর সমাজের অত্যাচারই বল—সবই ঐ আত্ম উদ্যম ও আত্ম সাহায্যের কাছে একে একে বলি যায়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের সঙ্গে ব্রিটনে নানা বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও দেশের সকল বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধির ধূম পড়িল, কলের গাড়ী, কলের জাহাজ, ও টেলিগ্রাফে ব্রিটনের ভিতর ও বাহির তোলপাড় হইয়া উঠিল। সমস্ত ইউরোপেই এ সময় বিজ্ঞান চর্চ্চা ও নানা আবিষ্কারের ধূম পড়িলেও—অপরিসীম মূলধন, অধ্যবসায় ও কার্য্যশক্তির বলে ইংলণ্ড সকলের আগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল ; দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ ও লোক যাতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে লোকের চোকও ফুটিল। পুরুষেরা শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ কাজ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে চলিবে ও অনেক অর্থ সঞ্চয় হইবে আশায় ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল লোকেই পুত্রদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইতে লাগিলেন। সকল বড় বড় কর্ম্মে কঠিন পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশত যুবকেরা অবিলম্বে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঐসব চতুর ও শিক্ষিত যুবকদিগের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত স্ত্রী কোথায়? ইংলণ্ডে ত ভারতবর্ষ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত পিতামাতার দ্বারা পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন হয় না, সুতরাং সুশিক্ষিতা ও সুচতুরা না হইলে যুবকেরা যুবতীদিগকে পছন্দ করিবে কেন? পিতা মাতারা এই বিভ্রাট দেখিয়া দুই চারি জন শিক্ষিত পুরোহিতের স্ত্রী ও কন্যাকে কর্ত্রী করিয়া দু একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন। ক্রমে ছাত্রীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেরও সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নগর, জনপদ ও গ্রামে পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের স্কুল খোলা হইল। নিতান্ত গরীব ভিন্ন প্রায় সকল পিতামাতারা পুত্র কন্যাদিগকে সমানে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পার্লেমেণ্টের মতানুসারে

বোর্ডস্কুল হইয়া এমন এক আইন প্রচার হইল যে দরিদ্র ভিখারীগণের ছেলে মেয়েদিগকেও কোন এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্কুলে না পাঠাইলেই নয়। এদেশের ধনী-কন্যাগণ ৬।৭ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়েন, ইচ্ছা হইলে তাহার পরে তাঁহারা কলেজে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করেন। গরীবদের মেয়েরা সচরাচর ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে যায়।

এইরূপে, পূর্ব্বে পিতামাতাগণ কন্যাদিগকে সৎপাত্রে গচ্ছিত করিবার ইচ্ছায় যে রুচির সৃষ্টি করেন, এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র তাহা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটনে এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০ এক হাজার উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় বা কলেজ আছে; প্রতিটীতে গড়ে ৫০০ পাঁচ শ ছাত্রী ; তাহাদের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বৎসর। তাহা ছাড়া লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য ৬।৭টী বড় স্ত্রী-কলেজ আছে ; প্রতিটীতে গড়ে ৫০ জন ছাত্রী প্রতি বৎসর অধ্যয়ন করে। আর ছোট বালিকাদের স্কুলের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। যে দেশে গোয়ালা, ধোবা, নাপিত, মুদি, কসাই ও এমন কি ডোমের মেয়েরা পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিখে, সেখানে যে ছোট মেয়েদের জন্য কত সংখ্যক দৈনিক পাঠশালার আবশ্যক তাহা পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারেন। গরীবসন্তানদের শিক্ষা অতি সামান্য হইলেও—(নিজের ভাষায় একটু লেখা পড়া ও গোটা দুই আঁক কসামাত্র—) মধ্যবিত্ত ও ধনী কন্যাদের শিক্ষা অতি উত্তম। এদেশে এমন ভদ্র স্ত্রী একটীও নাই যে নিজের ভাষা উত্তম রূপে জানে না, বা পিয়ানো বাজাইতে পারে না। অনেকে উহার সঙ্গে ফরাসী ও লাতিন ভাষা জানে, আমাদের ভারতবর্ষে যেমন সংস্কৃতের আদর, সমস্ত ইউরোপে লাতিনের সেইরূপ গৌরব, সে জন্য সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিতা হইতে হইলে ইংরেজ বালকদিগের লাটিন জানা অতি আবশ্যক। কেহ কেহ জর্ম্মণ বা ইটালীয় শিখে, দু একজন একটু গ্রীক বা রুষ ভাষাও শিখে। অনেকে তার উপর চিত্রবিদ্যায় অভ্যস্ত হয়, কেহ বা জরির কাজে পারদর্শিতা লাভ করে, আর কেহ বা অন্য কোন শিল্পবিদ্যায় মন দেয়। এখন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত থাকা ভদ্র ইংরেজ মহিলাদের পক্ষে বড় লজ্জার কথা।

আজকাল বালিকারা উচ্চশিক্ষা পাইলেও কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের একটীও কলেজ বা উচ্চশিক্ষার কোনরূপ উপায় ছিল না। যখন ইংরেজ নারীরা মধ্যমরূপে শিক্ষিতা হইয়া আরো জ্ঞান লাভে অভিলাষী হইল, তখন তাহারা আপনাদিগকে উহাতে বঞ্চিত দেখিয়া শিক্ষিত ও মার্জ্জিত স্ত্রীলোক মিলিয়া দেশের সর্ব্বজনকে আপনাদিগের এই অভাব জানাইতে লাগিল এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া ও নানা সংবাদপত্রে লিখিয়া সর্ব্বত্র তোলপাড় করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে পার্লেমেণ্টে আবেদন পত্র পাঠাইল। অনেক তর্ক, আন্দোলন, বাদ, প্রতিবাদ ইত্যাদির পরে পার্লেমেন্ট স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষায় অনুমতি প্রদান করিল এবং তিন চারি বৎসর ক্রমাগত ঘোর আন্দোলনের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোক ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজ দ্বার উন্মুক্ত করিল। দুচার বৎসর তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট রহিল। কিন্তু সমস্ত দ্বীপের মধ্যে শুধু একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে কেন? তাহাদের ভ্রাতারা স্কুলের পাঠ শেষে প্রায় অধিকাংশ কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডে গিয়া বড় বড় উপাধি লয় ও বড় নাম পায় ; তবে তাহারা কেবল

'মেয়ে মানুষ' বলিয়া ঐ অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে কেন? আবার স্ত্রী পুরুষে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীন ও গোঁড়া পণ্ডিত ও প্রোফেসরদিগের সেকেলে মৎ বদলাইয়া তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী মতে আনিতে যে কত সময়, পরিশ্রম ও গোলমালের আবশ্যক হইয়াছিল তার ঠিক নাই। কিন্তু অসীম কার্য্যশক্তি ও অধ্যবসায় বলে ইংরেজ মহিলারা উহাতে সফল হয়। একজন বৃদ্ধ প্রফেসর লিখিয়াছেন যে, প্রথম যেদিন তিনি দেখিলেন তাঁর লেক্‌চারঘর স্ত্রীলোক ছাত্রীতে পূর্ণ, লেক্‌চার না দিয়া প্রথমটা তাঁহার পলাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তিনি যখন বালিকাদের সরল অথচ দৃঢ়সংকল্প ও জ্ঞানতৃষিত মুখের প্রতি চাহিলেন, তখন তাহাদিগকে শিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সময়ে অভ্যাসবশত তাঁহাদের ঐরূপ লজ্জা বা কুসংস্কারটুকু চলিয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজমহিলারা সঙ্গতি থাকিলে লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড বা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা করে ও পুরুষের সঙ্গে সমানে আড়াআড়ি করিয়া উপাধি লয়।

যে সব সুশিক্ষিত, কার্য্যক্ষম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে ইংরেজ স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার উপায় খোলা হয়, তার মধ্যে মিসেস্ বেসেণ্ট, মিসেস্ ফসেট, মিস অক্টেভিয়া হিল[৩] প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা প্রধান। মিসেস্ ফসেট ইংলণ্ডের পরলোকগত প্রসিদ্ধ অন্ধ পোষ্টমাষ্টার মান্যবর মিষ্টার ফসেটের স্ত্রী, তিনিই প্রথম নারী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লন। এই প্রবন্ধে তাঁর জীবনী লেখা যদিও অসম্ভব, তথাপি তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান, উদারতা, মহত্ত্ব ও কার্য্যশক্তি বিষয়ে গোটাকতক কথা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। তাঁর স্বামী একেবারে দৃষ্টিহীন হইলেও স্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাজকার্য্য চালাইতেন; তিনি পতির চক্ষুস্বরূপ ছিলেন ; তাঁর বুদ্ধি জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভাবে মিষ্টার ফসেট একদিনের জন্যও চক্ষুর অভাব অনুভব করেন নাই। এখন তিনি বিধবা ও বৃদ্ধা হইলেও তাঁহার কার্য্যশক্তি এবং সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি উদারভাব ও সহৃদয়তার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বরং নারীদের উন্নতি ও তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্যই তিনি যেন জীবন রাখিয়াছেন। মিসেস্ বেসেন্টের নাম অধিকাংশ ব্রিটন মহিলাদের কাছে গুরুমন্ত্রের স্বরূপ। পূর্ব্বে ইংরেজ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধীয় আইন বড় কড়া ও পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু তাঁর পরিশ্রম ও যত্নে এখন এদেশে বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় যত আইনের সংশোধন ঘটিয়াছে। এ পৃথিবীতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার করা এরূপ অভ্যাস যে কি সভ্য কি অসভ্য, কোন জাতিই সুবিধা পাইলে তাহা ছাড়ে না ; এই নিমিত্ত ঐ নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' না হইলে চলে না। কাজেই যখন মিসেস্ বেসেণ্ট দেখিলেন যে তাঁর কথা ও বক্তৃতায় পুরুষেরা বেশী কান দেয় না, বা 'মেয়ে মানুষের বকা রোগ' ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন, "ইংরেজ স্ত্রীদের দাসত্ব" "ইংরেজ স্ত্রীদের স্বাধীনতার উপায়" প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিতে লাগিলেন, যে তাহা পড়িয়া ছোট বড় যত ইংরেজ নারীদের নিজ নিজ অবস্থাসম্বন্ধে চোক ফুটিল ও তাহারা আপনাদের অবস্থা সংস্কারের জন্য মহা গোলমাল আরম্ভ করিল ; তখন পুরুষেরাও লজ্জা বা মানের খাতিরে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যা সম্বন্ধীয় যত আইন ও কুরীতি সংশোধন করিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার পথ পাইল না। একজন যথার্থ শিক্ষিত, উন্নত চরিত্র ও সহৃদয় স্ত্রীলোক হইতে দেশের

ও স্ত্রীজাতির কত উপকার হইতে পারে, আমরা মিস্সেস্ বেসেন্টে তার উদাহরণ পাই।

এখন রাণী অ্যানের সময়ের ও বর্ত্তমান ইংরেজমহিলাদের মিলাইয়া দেখ ; এই একশ বৎসরে উহাদের মধ্যে এত প্রভেদ দেখিয়া আমরা অবাক হই। শিক্ষাবলে তাহারা এখন মার্জ্জিতরুচি গুণবতী জ্ঞানবতী হইয়াছে, তাহাদের শরীর অলসতা ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষম হইয়াছে ; আর অনেক কাজে তাহাদের প্রবেশাধিকার থাকায় তাহাদের বুদ্ধিশক্তির দ্রুত বিকাশ চলিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ঐ পরিবর্ত্তন বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে সাধিত হয় নাই। ইংরেজ স্ত্রীরা তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সমাজ ও পুরুষদের কাছে কত বিদ্রূপ, উপহাস ও তাচ্ছিল্য সহিয়াছে, আর কত সাংসারিক বাধা অতিক্রম করিয়াছে তার ঠিক নাই। প্রথম প্রথম ইংরেজ বালিকারা যখন কলেজে গিয়া পুরুষের সঙ্গে সমানে শিক্ষা লাভ আরম্ভ করিল তখন লোকে তাহাদিগকে 'ব্লুষ্টকিং' বা নীল মোজা[৪] ইত্যাদি নাম দিয়া বিদ্রূপ করিত, কিন্তু তাহারা তাহাতে লজ্জা বা ভয় না পাইয়া এক মনে নিজ নিজ কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেখিয়া সকলে ক্রমে চুপ হইয়া গেল, এখন ঐরূপ উচ্চশিক্ষায় ইংরেজরা আর দোষ ধরে না, বরং শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত মান্য করিয়া চলে।

এইরূপে ইংরেজনারীদের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বাধীনতাও বাড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডে কখন অবরোধ প্রথা ছিল না, স্ত্রী ও পুরুষজাতি বরাবরই এক সঙ্গে মিশামিশি করিয়া আসিয়াছে, একত্র টেবিলে বসিয়া খাইয়াছে, একত্র খেলিয়াছে, বেড়াইয়াছে, ইত্যাদি। ক্রমে তাহাদের শিক্ষার সঙ্গে তাহাদের চালচলনও মার্জ্জিত হইয়া আসিল, ও কথাবার্ত্তায় মধুরতা জন্মিল। আর পুরুষেরা যখন দেখিল স্ত্রীলোকে নিজেরাই নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম, সর্ব্বত্র নিজেদের মান রাখিয়া চলিতে পারে, তখন তাহারা একে একে স্ত্রীলোকদিগের কৃত্রিম আটকগুলি খুলিয়া লইতে লাগিল ও নারীজাতিকে অনেক অধিক স্বতন্ত্রতা দিয়া তাহাদিগকে সংসারে অবাধে কাজ করিবার অবসর দিল।

কিন্তু আমাদের চোকে ইংরেজ মহিলাদের বর্ত্তমান স্বাধীন জীবন অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও আমেরিকার তুলনায় উহা অনেক নিকৃষ্ট। ইংরেজেরা সাধারণত অত্যন্ত গোঁড়া ; (এখানে আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়া বলিতেছি না), নিজেদের পুরাণ রীতিনীতি পরিবর্ত্তনে অধিকাংশ লোক বড় অনিচ্ছুক। এ পৃথিবীতে প্রায় সব জাতিই প্রাচীন আচার ব্যবহারে এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তার কোন অন্যথা দেখিলে লোকের চোকে যেন কাঁটা ফুটে, তাহারা প্রাণপণে উহার প্রতিবাদ করিবার প্রয়াস পায়, ইংরেজ জাতিও ঐ দোষে বাদ যায় না। অবশ্য, জ্ঞানী ও শিক্ষিত পুরুষরা মহিলাদিগকে সমান চোকে দেখেন, কিন্তু সাধারণ লোকেরা উহাতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। সাধারণতঃ ইংরেজ-স্ত্রী ভারতনারীদের তুলনায় অনেক স্বাধীন হইলেও তাদের অবস্থা একেবারে দোষ শূন্য বা কষ্টহীন নয়। দরিদ্র স্ত্রীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখময়, তাহারা অন্যান্য অনেক দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় দরিদ্রবালাদের অপেক্ষা নিজ নিজ স্বামী ভ্রাতা ইত্যাদির দ্বারা অধিক নিষ্ঠুরভাবে আচরিত হয়। আর এদেশে স্ত্রীকে প্রহার করিবার বিরুদ্ধে আইন থাকিলেও ছোট লোকদের মধ্যে

স্ত্রী পুরুষের মারামারি প্রায় ঘটিয়া থাকে ; ইহাতে বোধ হয় আমাদের দেশের মত ব্রিটিশ স্ত্রীজাতি নিঃশব্দে নির্দয় স্বামীদের দৌরাত্ম্য সহিলে এদেশে দুর্দ্দান্ত স্বামীদের অত্যাচারের শেষ থাকিত না। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ইংরেজেরা পূর্ব্ব কুসংস্কার ছাড়িয়া এখনও স্ত্রীদিগকে পুরুষের সমান স্থান করিতে পারে না। আর আজকাল সকল কাজে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে সমানে আড়াআড়ি করাতে পুরুষেরা অনেক স্থানে পদভ্রষ্ট হইয়াছে, সে জন্য স্ত্রীদের উপর তাদের বড় আক্রোশ জন্মিয়াছে। যাহারা বরাবর হেঁটমাথায় তাহাদের দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহারা যে এখন কানে কলম গুঁজিয়া ব্যাঙ্ক, পোষ্ট আফিস, ষ্টেশন, পাঠগৃহ, যাদুঘর, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি সকল জায়গায় তাদের সঙ্গে সমানে কাজ করিবে ও নিজেদের শ্রেষ্ঠতা বা কার্য্যক্ষমতা দেখাইবে, ইহা যেন পুরুষেরা সহিতে পারে না। আরো, তাহাদের আবার ভয় হয়, যে স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি না রোধ করিলে পাছে আমেরিক-মহিলাদের মত ইংরেজ বালারা বা কোন্ দিন হাইকোর্টে বসিয়া বিচার আরম্ভ করে।

ইহাতেই দেখা যায় শিক্ষিত ও উন্নতিশীল লোকেরা ইংলণ্ডে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ হইলেও সাধারণ লোকেরা উহাতে অসন্তুষ্ট বই খুসী নয়, সে জন্য তাহারা সাধ্যমত ঐ শিক্ষা ও স্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে বলিতে ছাড়ে না। কিন্তু অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ইংরেজ মহিলারা যেরূপ সকল কাজে জাঁকাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে ঐ সব অধিকার হইতে এখন বঞ্চিত করা কাহারও সাধ্য নয়। ইংরেজ পুরুষেরা যদি উহা করিতে সাহস পায় তাহা হইলে নারীগণ মুখামুখি যুদ্ধ ছাড়িয়া হাতাহাতি লাগাইবে।

আর ঐ রূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াই কি ইংরেজ মহিলারা স্থির রহিয়াছে? তাহারা এখন অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান পদ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নয় ; কিছু দিন ব্রিটন বাসে বা ইংরেজী সংবাদ পত্র পড়িলেই জানা যায় যে ব্রিটনবাসিনীরা নিজেদের অবস্থা আরো উন্নত ও সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও পদ পাইবার জন্য প্রতিদিন কত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রত্যহ দেশের কোথাও না কোথাও বক্তৃতা করিয়া নিজেদের অভাব ও অবস্থা পরস্পরকে জানাইতেছে। সতত পরস্পরের সাহায্য ও শিক্ষার জন্য সকলে প্রস্তুত রহিয়াছে। এদেশে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় স্ত্রীলোকদের মত দিবার আইন নাই, সে কারণে মিসেস্ ফসেট, মিসেস্ বেসেণ্ট প্রভৃতি শিক্ষিত মহিলারা সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন করিতেছেন ; শ্রম, একত্ব ও অধ্যবসায় বলে তাঁরা যে সময়ে ঐ অধিকার পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহাদের যত্নে অল্পদিন হইল, অনেক তর্ক ও বক্তৃতা ইত্যাদির পর ইংরেজ মহিলারা লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের সভ্য হইবার অনুমতি পাইয়াছেন, ও ইহার মধ্যে দশ বার জন স্ত্রীলোক মেম্বর হইয়াছেন।

প্রকৃত শিক্ষা ও স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রিটনবাসিনীদের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মন দৃঢ় ও চরিত্র সবল হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক পুরুষের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া আপনারাই আপনাদিগের ভরণপোষণের ভার লইতেছে। অনেক গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তক রচনায় মাসে দু তিন হাজার অর্থ উপার্জন করেন। এদেশে প্রায় ৫০ জন স্ত্রীলোক ডাক্তার আছেন, আর দু তিন শ উপাধিধারী নারী দেখা যায়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার

স্ত্রীলোক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, আশি হাজার বালিকা—(এদেশের বালিকা, আমাদের দেশে তাহারা দিদিমা হইয়া পড়ে),—কেরাণীর কাজ করে। তাছাড়া দোকান পসারে ও ছোট ছোট কাজে যে কত স্ত্রীলোক খাটিয়া জীবিকা উপার্জন করে তার শেষ নাই। অনেক সময়ে কন্যারা অর্থ উপার্জন করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাদিগকে পালন করে; ভগিনীরা চাকরী দ্বারা অনাথ শিশু-ভ্রাতা ভগিনীদিগকে বাঁচাইয়া রাখে; বিধবারা স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সমাজে নিজেদের মান্য ও সন্তানদের পদ বজায় রাখে। এইরূপে অনেক কাজে স্ত্রী পুরুষের সমানে খাটিবার অধিকার থাকাতে ইংরেজ সংসার ও সমাজ যে কত বল ও উপকার পায় তা লিখিয়া বলা যায় না। গ্রেট ব্রিটনে স্ত্রীলোক ও বালিকাদের প্রায় ৪৫ খানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আছে, অধিকাংশই স্ত্রীলোকদের দ্বারা চালিত। তার মধ্যে 'কুইন' নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সর্ব্ব প্রধান; উহার গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ। ছোট বড় মহিলাদের পরস্পরের মিলন ও আলাপের জন্য প্রতি নগর ও জনপদে দু চারটী সভা ও ক্লব আছে, সেখানে তাহারা বক্তৃতা দেয় ও কথাবার্ত্তা কহে। তাহা ছাড়া অনেক পরোপকারী ধনী ও শিক্ষিত নারীদের সাহায্যে ও যত্নে গরীব ও শ্রমজীবী স্ত্রীদের জন্য প্রতি নগরে কত ছোট ছোট সভা ও আড্ডা খোলা হইয়াছে। সেখানে তারা কাজ শেষে নানা প্রকার আবশ্যকীয় শিক্ষা পায় ও গান বাজনা ইত্যাদি নির্দোষ আমোদ আহ্লাদ করে। দেশের রাণী হইতে নিতান্ত দরিদ্রবালা পর্য্যন্ত আত্ম নির্ভর করিতে জানে ও পরস্পরের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

এই সব পড়িয়া স্বদেশীয় ভগিনীরা দেখিবেন ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা আমাদের চেয়ে কত উচ্চ, তাদের স্বাধীনতা কত প্রশস্ত ও তাদের জীবন সংসারে কত উপকারী। তথাচ ইংরেজস্ত্রীদের এত শিক্ষা, কার্য্যশক্তি ও এত দিনের স্বাধীনতার মধ্যেও আমরা যখন তাহাদের উপর পুরুষের আধিপত্য ও কর্কশ আচরণ দেখিতে পাই, তখন এত অল্প কালের মধ্যে ভারতীয় নারীদিগকে সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমভাবে গণ্য দেখিব কি প্রকারে? সময়ে যে ব্রিটন মহিলাদের ন্যায় আমাদের অবস্থাও উন্নত ও ভারত মহিলারা আবার সর্ব্বত্র পূজিত হইবেন তাহার কোন ভুল নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা রাণী অ্যানের কালের ইংরেজ স্ত্রীদের অবস্থার মত, আমরা সবে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি; যে দিন আমরা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিব সে দিন ভারতের অন্তঃপুরই বল, আর রীতি নীতিই বল, কিম্বা সমাজই বল—কিছুই আমাদের গতি আটকাইতে পারিবে না।

বিলাত-ভেল্কি

আমরা যখন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছিলাম, সেই সময়ে, আমাদের অঞ্চলে প্রথম কলের গাড়ী খোলা হয়। এই অভিনব যানের সৃষ্টিতে দেশে কি হুলস্থূলই পড়িয়া গিয়াছিল! গ্রামের বৃদ্ধেরা, যেখানে সেখানে দল বাঁধিয়া, রেলরোডের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; প্রবীণারা, পাড়াপড়্সীর বাড়ীতে উহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন ; ছোট ছোট বৌ-ঝীরা, পুকুর ধারে কাপড় কাচিতে কাচিতে ঐ নূতন ঘটনা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ; আর যাঁদের শ্বশুর বা বাপের বাড়ী ঐ কলের গাড়ীর পথে নয়, তাঁহারা মুখ বাঁকাইয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন।

ঐ সময়ে আমাদের গ্রামে, একজন বড় ডাকসাইটে স্ত্রীলোক কবি ছিলেন। আমি ঐ মৌখিক পদ্য-রচয়িত্রীকে কবি নাম দিলাম দেখিয়া, পাঠিকারা যেন চোক উল্টাইয়া না বসেন ; কেন না, যদিও 'ক-খ' বা কালি-কলমের সঙ্গে তাঁহার কখনও কোনও পরিচয় হয় নাই, তথাচ, সে সময়ে দেশে ছোট বড় এমন কোনও কার্য্য বা ঘটনা হয় নাই, যাহাতে তাঁহার ছন্দোবিন্যাসের ক্ষমতা অব্যাহত না ছিল। গ্যাসের আলো, ডেঙ্গুজ্বর, গঙ্গার সেতু—ইহার কিছুই তাঁহার কবিতায় বাদ যায় নাই ; সুতরাং, কলের গাড়ীর মত এত বড় ব্যাপারটা, পদ্যে ইতিহাসস্থ না করিলে চলে না। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে আবৃত্তি করিলেন,—

"কি তারিপ হায় হায়, কলিযুগে ইন্দ্র প্রায়
ইংরেজ ভূপাল-শিরোমণি।
বুদ্ধিতে বৃহস্পতিবর, ঠিক্ যেন পুষ্পরথ
বানিয়েছে কলের গাড়ীখানি।"
ইত্যাদি।

এক কথায়, তিনি ঐ কবিতায়, কলের গাড়ী নির্ম্মাতাদের মহাভারতের নানা দেবদেবীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ রচনায়, আমি প্রথম ইংরেজ জাতির অস্তিত্ব জানিতে পারি। আমি তখন আগ্রহে কত লোককে উহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ আমার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিল,—"মেয়ের কথা শোন! ইংরেজরা কি মানুষ যে, তাদেরও আমাদের মত হাত পা আছে, তাহারা যে চন্দ্র নক্ষত্রদের সঙ্গে ঐ আকাশে বাস করে।" আর একজন বলিলেন,—"আরে বাছা, তুমি হাস্‌ছ কি? ঐ অমুক লোক দেখে এসেছে, তাদের গা টিপ্‌লে মদ পড়ে, আর চল্‌লে সোণা ঝরে। তারা এক কথায় কত রাজা মহারাজাকে ভিখারী কর্‌তে পারে, বন কেটে নগর বসাতে পারে।" আর এক মহিলা বলিলেন,—"ইংরেজরা নিশ্চয়ই আমাদের মহাভারত রামায়ণের দেবদেবীদের নাতি-পুতি, তা' নইলে, কি মানুষে কখনও অমন কাজ করিতে পারে?" এইরূপ নানা লোকের নানারূপ বর্ণনায়, বাল্যকালে ইংরেজজাতিকে যে রকম ভাবিয়াছিলাম, শৈশবের সঙ্গেই আমার সে কল্পনা-দৃশ্য তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু বড় হইয়া, আমাদের দেশের সাধারণ লোককে চিরজীবন ঐরূপ মিথ্যা ভেল্কিতে মুগ্ধ দেখিয়া, আমি যারপরনাই মনস্তাপ

পাইতেছি।

আমরা প্রতিদিন ইংরেজদের যত 'মানুষিক' ও 'বিমানুষিক' গুণ দেখিয়া, তাহাদিগকে এখনও অসাধারণ দেবপুরুষ ভাবিতে ছাড়িলাম না। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকেরা যে গ্যাসের আলোকে চন্দ্রের কিরণের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ভাবিবে, বৈদ্যুতিক আলোকের নির্ম্মাতাকে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার স্থানে বসাইবে, বা গঙ্গার সেতুকে বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য ঠাহরাইবে, তাহাতে তাহাদের তত দোষ দিতে পারি না ; কেন না, সমুদায় স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক কার্য্য প্রণালীর বিষয়ে, তাহারা একেবারে শিশুর সমান অনভিজ্ঞ। কিন্তু, শিক্ষিত লোকেরাও যে জানিয়া শুনিয়াও ঐ ভেল্কি ভাঙ্গিবার প্রয়াস পান না, ইহা অতি শোচনীয় বিষয়, সন্দেহ নাই।

আমরা দিনরাত দেখিতেছি যে, কেবল জলবায়ুর প্রভেদবশতঃ ইংরেজদের গায়ের রঙ্ শাদা, বাল্যকাল হইতে শারীরিক ব্যায়াম ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারা তাহারা স্বভাবতঃ সবল ও দৃঢ়কায় ; শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রভাবে এবং পরিশ্রম বলে তাহারা নানা প্রকার মহাকাণ্ড সাধনে সক্ষম ; বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা পায় বলিয়া, ইংরেজসৈন্যেরা সংগ্রামনিপুণ। আর তা ছাড়া, আমাদের ভারতবর্ষের কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও, ওরূপ শ্বেতবর্ণ লোক অনেক আছেন ; আর বাল্যকাল হইতে ব্যায়ামের অভ্যাস করিলে যে শরীর সবল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, আমরা রাজপুত ও মার্হাট্টা প্রভৃতি জাতিদের দেখিয়া, তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাই। শিখ ও গুরখা সৈন্যদের রণকৌশলের অভাব নাই ; তবে, কেবল বিজ্ঞানে আমরা ইংরেজ জাতির অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছি ; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, সময়ে ভারতবর্ষীয়েরাও যে বিজ্ঞান বিষয়ে, উহাদের সমান, অন্ততঃ, কাছাকাছি হইবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে, ইংরেজ ও বিলাত সম্বন্ধে আমাদের ভেল্কি ভাঙ্গে না কেন?

সচরাচর লোকের মনে, ইংরেজ বা উহাদের দেশের নামে একটা ত্রাস দেখিতে পাই ; এ ত্রাস যে কেবল তাহাদের ভয়ে বা অত্যাচারে জন্মিয়াছে, তাহা নয় ; কেন না, যে সব স্ত্রীলোক বা গরীব, জন্মে কখনও ইংরেজদের সংশ্রবে আসে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত ঐ নামে ত্রস্ত হয়। কোনও অলৌকিক দিব্য ঘটনা দেখিলে বা উহার বিষয় শুনিলে, তাহাদের মন যেমন চঞ্চল হয়, ইংরেজ নামেও তাহারা সেইরূপ ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া থাকে। তাহাদের মতে ইংরেজরা দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহাদের শাদা মুখ ও অসামান্য কাজ, যেন উহার প্রমাণ দেখায়। আমার একজন বন্ধু, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার কোনও পরিচিত লোক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—'আচ্ছা! বিলাতের ধোবা-নাপিতগুলোও কি সাহেব?' তাঁহার মতে শাদা লোক মাত্রেই এমন ভদ্র ও ধনী যে, তাহারা কখনও কোনও ইতর বা ভৃত্যের কাজ করে না!

ইংলণ্ডে যে কোনও ভাল দ্রব্য পাওয়া যায়, ইংরেজরা সগর্ব্বে তাহাকে ইংরেজী বা ব্রিটিষ বলে। তাহাদের মতে যে সকল সামগ্রী উত্তম, সে সব ব্রিটন ভিন্ন আর কোনও দেশে জন্মায় না ; আর যত মন্দ জিনিস, বিদেশে প্রস্তুত ও ভিন্ন স্থান হইতে ইংলণ্ডে আমদানী হয়। কিন্তু আমরা বিলাতভেল্কিতে এমনই মোহিত হইয়া রহিয়াছি যে, আমরাও দেশীয়

সকল ভাল বস্তুরই 'বিলাতী, নাম দি। কাপড়, কাগজ, শাল, বনাত, এমন কি, আম, কুল, সন্দেশ পর্য্যন্ত, ভাল হইলে, দোকানীরা উহা 'বিলাতী' নামে বেচে। আমাদের নিজের দেশে যে কোনও সরেশ জিনিস পাওয়া যায় বা প্রস্তুত হয়, আমরা যেন তাহা ভাবিতে পারি না, অথবা, স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করি। আমাদের ভারতীয় ঢাকাই কাপড়, বিলাতী ঢাকাইয়ের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ ; আমাদের কাশ্মীরী শালের পায়ের কাছেও পেশলির কলের তয়েরী শাল দাঁড়াইতে পারে না ; তথাপি, আমরা নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ভুলিয়া, ঐ সব নিকৃষ্ট দ্রব্যের অধিক আদর করি। আর যে সব আম, কুল ও সন্দেশকে আমরা 'বিলাতী' নামে সম্ভাষণ করি, তাহারা যে জন্মেও কখনও ইংলণ্ড দেখে নাই, সে সকল যে আমাদের ভারতবর্ষেই উৎপন্ন বা ভারতীয়ের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, এ কথা অন্যকে জানাইতেও আমাদের যেন অপমান বোধ হয়!

ব্রিটনে যদি কোনও সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি বা মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলে ইংরেজরা বলে, 'বিদেশ হইতে আসিয়াছে।' কিছু দিন হইল, লণ্ডনের এক গরীব পাড়ায়, ১০।১২টা জঘন্য খুন হইয়াছিল, কিন্তু কে যে রাত্রে ঐ সব অভাগা নারীদের হত্যা করিত ও কিরূপেই বা তাহাদের শব রাস্তায় ফেলিয়া যাইত, তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কত পাহারাওলা ও সাধারণ লোকেরা পর্য্যন্ত, ঐ মহা খুনীকে ধরিবার জন্য সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু তাহার কোনও উদ্দেশ পাইল না। ঐ হত্যাকারী যে একজন পাষণ্ড ইংরেজ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; কেন না, ইংরেজজাতির ছোট লোকেরা ঐ সব পাশব কার্য্যের জন্য বিখ্যাত ; তথাপি, ইংরেজরা প্রাণ থাকিতে স্বীকার করিবে না যে, তাহাদেরই একজন স্বদেশীয় ঐ সব অসৎ কার্য্য করিতেছে। তাহারা ক্রমাগত কোনও বিদেশীর ঘাড়ে ঐ সব পাপের বোঝা চাপাইবার চেষ্টায় ছিল। কখনও বা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, একজন য়িহুদীর দ্বারাই উহা সাধিত হইয়াছে ; আবার কখনও বা কোনও মানবকে দোষী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিত। অবশ্য, এরূপ স্বজাতিপ্রিয়তা অতিরিক্ত হইলেও, উহা আমাদের বিজাতিপ্রিয়তার অপেক্ষা সহস্রগুণে প্রশংসনীয়।

এইরূপ ছোট বড় সকল কাজে, আমরা নিজেদের, যত হীন ভাবিয়া নীচু করিতে চাই ; অন্যদেশীয়গণ, বিশেষতঃ ইংরেজরা, আপনাদের তত উঁচু ভাবে, ইংরেজরা ভিন্ন দেশে বাস বা বিদেশভ্রমণের সময়, আগে স্বদেশী লোকের সঙ্গে আলাপ করে ; কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহার বিপরীত দেখি। ইংরেজ বালক ও যুবকেরা নিজদেশীয় বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদের অধিক মান্য করে, কিন্তু স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী পণ্ডিতেরা আমাদের কাছে অধিকতর শ্রদ্ধা পান। এমন কি, আমরা মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বা উহার প্রতি ঘৃণা করিয়া, পরের ভাষার পূজা করিতে শিখিয়াছি। এ সকলে কি ভেল্কি দেখা যায় না? ইংরেজরা যেমন ষাট হাজার ইংরেজ সৈন্য দ্বারা, চব্বিশ কোটী ভারতবাসীর মনে ধাঁধা লাগাইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য সকল কাজেও ধূমধাড়াক্কা ও নিজেদের ক্ষমতা দেখাইয়া, আমাদের চোক ঝলসিয়া দিয়াছে। আমরা যেন নিজের দেশকে বিদেশীর চোকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, দেশের কিছুতেই আমাদের প্রকৃত আস্থা নাই ও গ্রাহ্য নাই। আমাদের মন ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে ঘুরিতেছে, আমাদের হৃদয় ইংরেজী ভাবের দিকে ছুটিতেছে, আমাদের

রীতিনীতি ইংরেজী রঙে রঞ্জিত হইতেছে।

জগতে কত জাতি উঠিয়াছে ও নামিয়াছে, কিন্তু আমাদের মত আর কোনও জাতির, এরূপ স্বদেশীয় সকল বিষয়ের প্রতি এমন অনাস্থা দেখা যায় না। আমাদের ন্যায়, আর কোনও জাতিকে, এইরূপে সমস্ত আত্মাভিমান ও জাতীয় মর্য্যাদা হারাইয়া, পরপদসেবা করিতে দেখা যায় না। ভারতবর্ষে যে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, ভারতীয় পুষ্পে যে মনোহর গন্ধ ও সৌন্দর্য্য আছে, ভারতীয় ফলে যে রস ও সুস্বাদ আছে, ভারতের সাহিত্যে যে রত্ন আছে, দেশীয় তাঁতী ছুতারের যে নৈপুণ্য আছে, আর আমাদের দেশের লোকদেরও যে মহত্ত্ব আছে, এ সব যেন দেখিতে বা ভাবিতে আমাদের গায়ে কাঁটা ফোটে! এমনই আমাদের বিলাত-ভেল্কি!

আমাদের হবে কি?

এ সংসারে আত্মবিসর্জ্জন অতি মহৎ কাজ। স্বদেশে, বিদেশে, সর্ব্বত্রই লোকে আত্মবিসর্জ্জনকে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ সর্ব্বত্যাগী ছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে, পরার্থে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহাদের প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ, নানা দেশে প্রচারিত ও শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইয়া থাকে ; এবং ধর্ম্মের প্রচারকগণও নিজ নিজ নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য, মানুষের পূজার পাত্র হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও, যে কোনও দেশে আমরা যে কোনও ব্যক্তিকে নিজের প্রাণ দিয়া পরের উপকার করিতে দেখি, তিনিই সমস্ত অধিবাসীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের দেবতা হন। শাক্যমুনির স্বার্থত্যাগের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের অত প্রবল প্রভাব দেখা যায় ; চৈতন্যের আত্মবিসর্জ্জনের জন্যই, বৈষ্ণবেরা তাঁহার প্রেমে পাগল ; খ্রীষ্টের প্রাণত্যাগই, খৃষ্টানদের বিশ্বাস ও ভক্তির প্রধান কারণ। এই আত্মবিসর্জ্জনের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য, বিদেশে বা অধিক দিন দূরে যাইবার আবশ্যক নাই ; অল্প দিন হইল, দয়ানন্দ সরস্বতী[৫] আমাদিগকে স্বার্থত্যাগের মহিমা উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এই মহৎগুণের এইরূপ কত উদাহরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ বাদ দিলে, হিন্দু মহিলারা আত্মবিসর্জ্জনে জগতে অদ্বিতীয়, আসিয়িক, ইউরোপীয়, খ্রীষ্টান, মুসলমান, আর কোনও জাতি বা ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে, হিন্দু স্ত্রীদের ন্যায় নিষ্কামধর্ম্মশীলা নারী কুত্রাপি দেখা যায় না। অবশ্য, সকল দেশেই, এখন তখন দুই একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী মহিলা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতি গৃহে ও সাধারণ জীবনের মধ্যে এরূপ একান্ত জীবন সমর্পণ, কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই দিনরাত চলিয়া থাকে। সভ্য জাতিগণ হিন্দুনারীদের এই মহত্ত্ব দেখিয়া, দূর হইতে তাঁহাদের প্রণাম করেন এবং এত নিঃস্বার্থ প্রেম ও ধর্ম্মনিষ্ঠা যাহাদের গৃহে নিরন্তর বর্ত্তমান, তাহারা কিরূপে পাপাসক্ত হয়, তাহা ভাবিয়া পান না। কিন্তু, বর্ব্বরগণ উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম।

কিন্তু, সুন্দর ফুল যেমন শিশুর হাতে পড়িলে, অবিলম্বে ছিন্ন হইয়া ধূলায় পড়ে, মণিমুক্তা যেমন বাতুলের হস্তগত হইলে, শিলায় পড়িয়া চূর্ণীকৃত হয়, সেইরূপ হিন্দুনারীদের ঐ মহৎ গুণ অপাত্রে পড়িয়া পদ-দলিত হইতেছে। যে মহত্ত্বের অর্থ বুঝিলে, ভারতীয় যুবকেরা, এতদিনে ধর্ম্মজ্ঞানে ও প্রকৃত শিক্ষায় অনেক উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে পারিতেন, অজ্ঞতাবশতঃ সেই বিষয়ে তাচ্ছল্য করিয়া, তাঁহারা দিন দিন আরো নীচে পড়িয়া যাইতেছেন। প্রসিদ্ধ রোমীয় জননী কর্ণেলীয়ার[৬] মত সহস্র সহস্র হিন্দুমাতা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন ; কিন্তু কয়জন কায়স[৭] ও টাইবিরিয়স[৮] আমাদের বঙ্গসংসারে উদিত হন? শত শত বিধবা, পুত্রদিগকে ধনরত্নের অপেক্ষা অমূল্য ভাবেন, কিন্তু কয়জন হিন্দুসন্তান, সেই অমূল্য ভাব সফল করেন। মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র,[৯] মাতার 'অমূল্য ধন' ছিলেন ও তিনিই জননীর ঐ কথার সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার উদাহরণ আমাদের হিন্দু সংসারে দিন দিন অতি বিরল হইয়া আসিতেছে ; আর যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে ক্রমে জননীরা আরও অবহেলিত এবং স্ত্রী ও ভগিনীগণ আরও ঘৃণিত হইবেন, এবং তাহা হইলে,

হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংসার যে এক দিন উৎসন্ন যাইবে, এই ভয় হয় ; সুতরাং, সেই শঙ্কার কারণ দূর করিবার আশায়, প্রাণের জ্বালায়, পাঠক পাঠিকাদিগকে গোটাকতক ঘরের কথা লিখিতে বসিয়াছি। এ জগতে মানুষ এরূপ অপরূপ জীব যে, তাঁহারা কোনও বস্তু বা বিষয় বিনাকষ্টে অনায়াসে পাইলে পর, উহার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যেমন বিনা পরিশ্রমে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া, উহার প্রকৃত যত্ন ও মর্য্যাদা জানি না, সেইরূপ হিন্দুনারীদের আত্মসমর্পণ আয়াস বিনা সাধিত হয় বলিয়া, হিন্দু পুরুষগণ উহার প্রতি এত ঔদাস্য দেখান। যুবকেরা নিজ নিজ সঙ্গিনীর অভাব বুঝিবার পূর্ব্বেই পিতামাতা দ্বারা বিনাকষ্টে তাহার অধিকারী হন, আর যথার্থ প্রেমের মর্ম্ম জানিতে না জানিতেই, ভার্য্যার অগাধ প্রেমে ডুবিয়া পড়েন। তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক কোন আকাঙ্ক্ষাই আর অতৃপ্ত থাকে না। কিন্তু একটা যে কথা আছে, 'কোনও কোনও জন্তু দুধ ঘি জীর্ণ করিতে পারে না,' সেইরূপ সাধারণ বঙ্গযুবকগণ, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতাবশতঃ, এই গভীর প্রেমের বেগ সহ্য করিতে পারেন না। সেই জন্য বাঙ্গালী যুবকগণের হৃদয়, নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রবল প্রবাহে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও পবিত্র না হইয়া, বরং যেন আরও সংকীর্ণ হইয়া যায় ; সুতরাং, যে নিঃস্বার্থ প্রেম, কোনও সহৃদয় ও যথার্থ শিক্ষিত লোকের অধিগত হইলে, জীবনের কত কার্য্যে উৎসাহ ও উত্তেজনা স্বরূপ হইত, বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে তাহা কেমন জড়তা, অলসতা ও অনাস্থার কারণ হয়। নারীদের এরূপ অসাধারণ ভালবাসার মধ্যে, তাঁহাদের সামান্য প্রাণ যেন হাঁপ ছাড়িতে পারে না ; তাই, তাঁহারা যেন উহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অবিলম্বে পাপাচারে রত হন। তাঁহারা জানেন যে পতি হিন্দু নারীদের অনন্য গতি ; স্বামী সৎ বা অসৎ, সদয় বা নির্দ্দয় হউন, তিনি হিন্দু স্ত্রীর পূজার পাত্র, তাঁহার অত্যজ্য দেবতা। পাতিব্রত্য হিন্দু পত্নীর জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। সেই জন্যই বোধ হয়, নির্ব্বোধ যুবকেরা যথেচ্ছাচার ব্যবহার দ্বারা, ঐ অগাধ প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিদান প্রদান করেন।

হিন্দু বালাদের অবস্থা সংশোধনের ও পুরুষের সহিত সাম্যের কথা উঠিলেই, অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, তাঁহাদের দেবীপদের প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমরা কাজে ঐ দেবীর মান্য কই দেখিতে পাই ? যে ঋষিরা স্ত্রীদিগকে দেবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে নারীদের প্রতি যথার্থ দেবীর ন্যায় আচরণ করিতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সেই পুরাকালের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারই হিন্দু মহিলাদের নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিষ্ঠাযুক্ত ধর্ম্মভাবের মূল ; কেন না, উদ্যানের মালীর স্নেহ ও যত্নের উপর যেমন বাগানের ফুলের বৃদ্ধি ও বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, সেইরূপ পুরুষের সদয় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের উপর, পরিবারের স্ত্রীদের দয়াধর্ম্মাদি স্বর্গীয় গুণ সকল নির্ভর করে। আজকাল কিন্তু ঐ সকল মহর্ষিদের বংশধরগণ, তাঁহাদের কথাগুলি লইয়া কেবল ঘণ্টা বাজান, আর কাজের সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। আমি বলিতেছি না যে, সকল হিন্দু স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতি, হিন্দু মহিলাদের প্রতি অতি কর্কশ ও কঠোর আচরণ করেন, তবে যাঁহাদের অবস্থা বাহ্যিক সুখময় বোধ হইলেও, বস্তুতঃ অত্যন্ত যন্ত্রণাময়, অপাত্রে পড়িয়া যাঁহাদের জীবন চিরকাল পুড়িতে থাকে, যাঁহারা প্রকৃত সুখের নাম মাত্রও জানেন না, এরূপ স্ত্রীদের (হায়! এরূপ কত অভাগা নারীই আমাদের দেশে

না জানি আছে।) দুঃখের কথা সাধারণের কাছে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার এই সকল উক্তি যদি কাহারও নিকট অতিরিক্ত বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, একটু যত্ন-পূর্ব্বক তিনি তাঁহার নিজ পরিবারের ও প্রতিবাসিনী স্ত্রীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, জানিতে পারিবেন যে, নীরব বঙ্গনারীদের পক্ষে দুটো কথা বলিবার এই উপযুক্ত সময়। বঙ্গযুবকেরা যদি স্ব স্ব জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থা জানিয়াও, তাঁহাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে দেখিতে না পান, তাহা হইলে অগত্যা এইরূপেই দেখাইতে হয়। যাহারা লজ্জা ও নম্রতার আদর জানে না, তাহাদের নিকট লজ্জা করিলে চলে না। বিশেষতঃ, এখনও যদি আমরা হিন্দু বালকদের প্রকৃত পথ দেখাইয়া ভবিষ্যতে তাহাদের পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান, সহৃদয় ও সচ্চরিত্র করিবার প্রয়াস না পাই, তাহা হইলে, আমাদের বর্ত্তমান কন্যাদের উপায় কি হইবে? আর হিন্দু পরিবারই বা কোথায় থাকিবে?

কোনও ভাল জিনিসই বার বার পদদলিত হইলে অধিক দিন ভাল থাকে না ; সুতরাং, দিনরাত অবহেলিত ও ঘৃণিত হওয়াতে, হিন্দুনারীদিগের আত্মবিসর্জ্জন, পাতিব্রত্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দয়া, লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি সদগুণ সকল যে কালে বিনাশ পাইবে, আমরা কি তার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না? হিন্দুবালাদের সে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বিনয় ও পরদুঃখকাতরতা কই? তাঁহাদের সে পূর্ব্বেকার ন্যায় সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া আত্মীয় স্বজনের সেবা করা কই? সে নিঃস্বার্থ প্রেম কই? সে হৃদয়ের অমায়িকতা ও অকপটতা কই? বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুনারীর এই সকল গুণ দিন দিন হীন হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু বোধ হয়, কেহ এ পর্য্যন্ত জানেন না বা স্বীকার করিতে চাহেন না যে, বাঙ্গালী যুবকদের অনাস্থা ও অবহেলাই হিন্দু বালাদের এই অবনতির প্রধান ও মুখ্য কারণ।

অনেকে বলিতে পারেন, হিন্দুমহিলারা সর্ব্বত্রই একভাবে আচরিত হয়, তবে বাঙ্গালী স্ত্রীদের চরিত্রই যে নানা দোষে দূষিত হইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই সম্পূর্ণ দোষ। কিন্তু তাঁহারা চারিদিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত স্ত্রী স্বাধীনতা বা স্ত্রী শিক্ষা না থাকিলেও, ঐ সকল স্থানের হিন্দু রমণীরা সংসারে ও সাধারণ লোকের নিকট যথেষ্ট মান্য ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন ; বাঙ্গালীর ন্যায় আর কোনও ভারতীয় যুবক, জননী, স্ত্রী ও ভগিনীর প্রতি এরূপ ঘৃণা, অবহেলা ও অনাস্থা দেখান না। এমন কি, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও, বঙ্গনারীরা আধুনিক নব্য মহিলাদের ন্যায় পুরুষের দ্বারা এত পদদলিত ও অপদস্থ হইতেন না। অবশ্য, সামাজিক প্রথানুসারে, কোনও হিন্দুই, স্ত্রী কন্যাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা বা স্বাধীনতা দিতে পারিবেন না ; কিন্তু তা বলিয়া নিজ নিজ সংসারে তাঁহাদিগকে যথার্থ মান্য প্রদর্শন বা তাঁহাদের প্রেমের প্রতিদান প্রদান করিলে, সে বিষয়ে, আপত্তি নাই ; ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও বিবেচনার উপরই উহা নির্ভর করে।

আমাদের বঙ্গীয় যুবকেরা শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানে একেবারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন ; তাঁহারা সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন ; কিন্তু

তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না যে, প্রত্যেক জাতির শিক্ষা স্বাধীনতা ও সভ্যতার অঙ্কুর, সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র ও জীবনেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পিতামাতা সন্তানদের উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, প্রত্যেক যুবক নিজ নিজ জননী, ভগিনী, ও স্ত্রীর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন—ইহা দেখিয়াই আমরা যে কোনও জাতির সভ্যতা ও উন্নতির পরিমাণ স্থির করিতে পারি। কিন্তু, যদি কোনও জাতি আমাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আসে, তবে আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু সংসারে এরূপ পিতাপুত্রের কলহ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, স্বামীদের তাচ্ছল্য, স্ত্রীদের লাঞ্ছনা, প্রায় সমস্ত পরিবারেই ঘরে ঘরে মনোবাদ,—এই সকল লজ্জাকর ঘটনা দেখিয়া কি বলিবে? তখন আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষার অভিমান কোথায় থাকিবে?

অনেকে বলেন, শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গীয় যুবকেরা যেমন মার্জ্জিত হইতেছেন, হিন্দুমহিলাদের অবস্থাও তেমনি উন্নত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুপরিবার খুঁজিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ ধারণায় বিশ্বাস করিয়া আমরা যতই মনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করি না কেন, উহার প্রকৃত শূন্যতা কখনই আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে পারে না। আপনারা যদি কতকগুলি ইংরেজী কথা ও বুলি আওড়ানকে 'শিক্ষা' বলেন, আর 'অ্যালবার্ট' ফেসানের টেরিবাগান, ও বার্ণিশ করা জুতা পরাকে 'মার্জিত' জ্ঞান ভাবেন, তাহা হইলে, বঙ্গবাসীরা অনেক শিক্ষিত ও মার্জিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি দৃঢ় সংকল্প, সত্যপ্রিয়তা, আড়ম্বরে ঘৃণা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও মনের প্রশস্ততা প্রভৃতি মানুষোচিত গুণকে শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের চিহ্ন বলিতে হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীরা যে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণের পরিবর্তে, অধঃপতনের আরও নিম্নস্তরে পতিত হইতেছেন, সে বিষয়ে কোনও ভুল নাই। অধিকাংশ বঙ্গযুবক যেমন নামে শিক্ষিত হইতেছেন, হিন্দুমহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতাও তেমনি নামমাত্র। বস্তুতঃ তাঁহাদের অবস্থা আরো হীন হইতেছে। একমুষ্টি ব্রহ্মনারীদের বাদ দিলে, হিন্দু মহিলাদের মধ্যে, এরূপ নামমাত্র শিক্ষা ও উন্নতির প্রমাণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইবার কোনও আবশ্যক নাই ; প্রতি গৃহে, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে, তাহার দৃষ্টান্ত পড়িয়া রহিয়াছে।

অবশ্য দুই চারি জন যথার্থ শিক্ষিত পুরুষের ন্যায়, দুই একজন স্ত্রীলোকও নিঃসন্দেহ প্রকৃত জ্ঞানবতী আছেন। কিন্তু আমাদের ঠাকুরমাদের সঙ্গে আমাদের ভগিনীদের অবস্থা মিলাইয়া দেখিলে, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, প্রাচীনাদের অপেক্ষা নবীনাদের জীবনের পরিধি অধিকতর সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সকলেই জানেন, আমাদের দিদিমা ও এমন কি মায়েরা পর্য্যন্ত সংসারের অদ্বিতীয়া গৃহিণী ছিলেন, গৃহের সমস্ত দাসদাসী, সন্তান-সন্ততি, সব তাঁহাদের জিম্বায় থাকিত ; বাড়ীর কর্ত্তা স্বপ্নেও স্ত্রীর গিন্নীপণাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইতেন না। বাহিরে তিনি যত হাঁকডাক করুন, নিজের অন্দরে আসিলে, তিনি আর বড় কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারিতেন না। প্রাচীন স্বামীরা স্ত্রীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োজিত করিতেন না বটে, কিন্তু অন্য দিকে গৃহিণীরা লেখাপড়া না জানিলেও, তাঁহারা বিরক্ত হইতেন না। অথচ স্ত্রীর প্রতি তাঁহাদের একটা স্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল ; তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহার স্ত্রী যেমন অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, তিনি নিজেও তেমনি ঘরকন্নার জ্ঞানে একান্ত অজ্ঞ ; কাজে

কাজেই, তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় গৃহিণীকে সে বিষয়ে অবাধ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিতেন।

কিন্তু আজকাল অল্প শিক্ষার সঙ্গে আমাদের মধ্যে কি এক আধ-আধ জ্ঞান প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহাতে হিন্দুদের গার্হস্থ্য জীবনের যত মিল ও শান্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আর সে পূর্ব্বের মত বিশ্বাস নাই, তাঁহারা মনে করেন, কতকগুলা ইংরেজী বই পড়িয়া তাঁহাদের জ্ঞান সকল বিষয়ে এরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে যে, অশিক্ষিতা স্ত্রীদের সকল কাজে তাঁহাদের দৃষ্টি না রাখিলে চলে না। রান্নাঘরেব জন্য কিরূপ ঝীর আবশ্যক, কোন্ ঘরটার ঝুলঝাড়া দরকার, খোকার জন্য কত দুধ নিতে হবে, কারুকে কি পথ্য দিতে হবে,—এ সব বিষয়েও তাঁর খবর রাখা চাই, নতুবা, অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের হাতে পড়িয়া সংসারটা ছারখার হইবে। তিনি নিজে স্বাভাবিক জ্ঞানে বঞ্চিত, স্ত্রীর স্বাভাবিক জ্ঞানের উপরও তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই ; পত্নী প্রাণপণ যত্নে তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করেন, তথাচ, বাতাসে উড়িয়া যদি ব্যঞ্জনে কোনও দিন চুল পড়ে, বা তাড়াতাড়িতে লুন বেশী হয়, তাহা হইলে, তাঁহার আজীবন প্রেম, যত্ন ও পরিশ্রম একমুহূর্তে স্বামীর চোখে ধূলার মত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায় ; তিনি অমনি দশমুখে স্ত্রীজাতির শিক্ষার অভাব ও অসাবধানতার বিষয়ে ঝড় বহিয়া যান। তাঁহার ঐরূপ অবিশ্বাস ও বিদ্রূপসূচক বাক্যে, তাঁহার অনুগতা পত্নী যে কোনও রূপ বেদনা অনুভব করেন,—তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। হৃদয়ে আবার আঘাত কি? যাহারা ইংরেজী পড়িতে পারে না, সকল বিষয়ে চালাক চতুর নয়, গান-বাজনা জানে না, তাহাদের হৃদয় ত বড়। তা' তা'তে আবার আঘাত!! এই রূপে, বঙ্গমহিলার জীবন বাহ্য দৃশ্যে অপেক্ষাকৃত সুখময় বোধ হইলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে ঘোরতর দুঃখপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

আর স্বাধীনতা সম্বন্ধেও আমাদের অপেক্ষা আমাদের মা ও ঠাকুরমাদের অবস্থা অধিকতর উন্নত ছিল। সকলেই জানেন, হিন্দুনারীরা বহুদিন হইতে অবরোধে ছিলেন বটে, কিন্তু, তীর্থদর্শন, কোনও পীঠে গিয়া পূজা দেওয়া, প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ভ্রমণে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল ; কিন্তু এই অর্দ্ধশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ স্বতন্ত্র জীবনের আনন্দটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। এখন বঙ্গযুবকেরা স্ত্রীদের তীর্থযাত্রার নামে খড়্গহস্ত ; তাঁহারা ও সব পুতুল-পূজা ইত্যাদি কিছুই মানেন না ; ভালই ত, নারীদের উহার অপকারিতা ও যথার্থ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও, আর অন্য কোনও স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখাও ; দেখিবে, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের কুসংস্কার দূর হইবে। কিন্তু, যদি ঐ সকল ধর্ম্মসাধনে স্ত্রীদের নিষেধ কর, আর উহার বিনিময়ে কোনও উচ্চতর জ্ঞান বা ধর্ম্মের পথ না দেখাও, যদি ঐ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতাটুকু কাড়িয়া লও, আর উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য না দেও, তাহা হইলে, তাঁহাদের জীবন যে আরো সংকীর্ণ হইয়া যাইবে, মহিলাদের হৃদয় যে দেবতাহীন থাকিবে, তাঁহাদের অবস্থা যে অধিকতর নিকৃষ্ট হইবে,—এ জ্ঞান কি কাহারও সহজ বুদ্ধিতে উদিত হয় না? তদ্ব্যতীত, সামাজিক জীবনেও হিন্দুস্ত্রীদের ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। আগে আমাদের মা ও খুড়ীরা, নিজের পরিচিত ও সমাজভুক্ত যে কোনও লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলেই, ইচ্ছামত সেখানে যাইতে পারিতেন, পুরুষের অনুমতি বা আজ্ঞার জন্য বড় একটা অপেক্ষা

করিতে হইত না। কিন্তু, আজকালকার গৃহিণীরা, স্বামীর অনুমতি বিনা, নিমন্ত্রণে যাওয়া দূরে থাকুক, পিত্রালয়ে কাহারও পীড়া হইলেও দেখিতে যাইতে পারেন না।

এইরূপে নামে দিন দিন আমাদের উন্নতি হইলেও, বাস্তবিক আমরা আরো পরপ্রত্যাশিনী ও পরাধীনা হইয়া পড়িতেছি। দান, ধ্যান, ও ধর্ম্ম কর্ম্ম, এমন কি, সন্তানপালনেও আমরা আমাদের স্বতন্ত্রতা ও আত্মনির্ভরতা হারাইতেছি। বাঙ্গালী পুরুষেরা যেমন সকল বিষয়ে বাহ্যিক আড়ম্বরে অধিক আসক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিও সেইরূপ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া, বাহিরে সর্ব্বত্র শিক্ষিত ও স্বাধীন ইত্যাদি নামে পরিচিত হইতেছেন, অথচ তাঁহাদের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বাঙ্গালী সংসারের এই সকল বিশৃঙ্খলা ঘটনা, বঙ্গীয় বালকদের মহান্ অনিষ্ট সাধিতেছে। বাল্যকাল হইতে মাকে সকল বিষয়ে পরপ্রত্যাশিনী দেখিয়া, তাহাদের মনে মাতৃভক্তির হ্রাস হইতেছে ও স্ত্রীজাতি নিতান্ত অজ্ঞ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতেছে। স্ত্রীর প্রেম ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলার ন্যায় মাতার স্নেহ ও তাঁহার প্রতিও পুত্রদের তাচ্ছল্য দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা যে আবার কোনও বড় কাজ করিতে পারে বা সংসারে কোনও মহত্ত্ব দেখাইতে পারে, ইহা ভাবিতেও তাহারা অপারগ ; তাই, মাতার যে আত্মবিসর্জনে অন্যান্য দেশের প্রকৃত শিক্ষিত লোকে চিরজীবন মাতৃবৎসল হইয়া থাকেন, বঙ্গীয় যুবকেরা সেই মহাগুণকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে, বিনা আয়াসে স্ত্রীর অগাধ প্রেম পাইয়া, তাহারা যেমন উহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছে না, বিনা কষ্টে অসীম মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া, বালকেরা তেমনি উহার মাহাত্ম্য বুঝে না। এই কারণেই এই নিঃস্বার্থ স্নেহের তেজে বাঙ্গালীদের জীবন আরো স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে, আর উহার অবিরল পূতধারায় বাঙ্গালীর প্রাণ অসার হইয়া যাইতেছে। জননীরা স্নেহের বলে নিজেদের সকল সুখ ও আরাম ত্যাগ করিয়া, সন্তানদিগকে সকল বিষয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার প্রয়াস পান দেখিয়া, পুত্রদের বাবুয়ানা ক্রমশই বাড়িতেছে ; স্ত্রীরা বিনা উত্তরে, স্বামীদের আজ্ঞা মাথায় করেন দেখিয়া, যুবক কর্ত্তাদের আদেশের সংখ্যা দিন দিন ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালী স্ত্রী সহিষ্ণু বলিয়া, বঙ্গ স্বামী প্রাণপণে ঐ সহিষ্ণুতার অপব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু আমরা ঐ অতিবাদ শাসনের ও অবিশ্বাসের কুফল কি এখনই দেখিতে পাইতেছি না? সরলা বঙ্গবালা কি ক্রমে ক্রমে কপটতাদোষে দূষিত হইতেছে না?

আর যুবকদেরও বেশ মজা হইয়াছে, ঘরে যাহাই করুন, মা-বোনকে ধমকের চোটে কাঁদান বা উপহাসের স্রোতে ভাসান, তাঁহাদের সে অত্যাচার ত প্রকাশ পাইবার যো নাই! কাজেই তাঁহারাই বাহিরে বাহিরে বক্তৃতা দ্বারা, দেশভক্ত, স্ত্রীদের হিতাকাঙ্ক্ষী, উদার মহাবীর নামে খ্যাত হইতেছেন। মানুষের কথা ও কাজে যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত, লোকের মনের ভাব কেবল কথায় নয়, কার্য্যের দ্বারাই যে প্রকৃত রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাঁহাদের এ জ্ঞান নাই! সুতরাং, তাঁহাদের মুখে সহস্র চীৎকার শুনিয়াও, দেশের লোকের হৃদয়ে যা বাজিতেছে না, কাণে তালা লাগিতেছে মাত্র! তাই বলি, আমাদের হবে কি?

কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষা প্রণালী

কিণ্ডরগার্টেন একটী জর্ম্মন কথা, উহার বিস্তারিত অর্থ—খেলা ও আমোদের সঙ্গে শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিখান। জর্ম্মনী দেশে পণ্ডিত ফ্রোবেল[10] ঐরূপ শিশুশিক্ষা প্রথম প্রচলন করেন, সেজন্য সর্ব্বত্রই ঐ প্রকারে শিক্ষা দিবার স্কুলগুলি ঐ জর্ম্মান নামে প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় পিতামাতারা ঐ মহৎ শিক্ষার উপকার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন বলিয়া আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত একটীও কিণ্ডরগার্টেন খোলা হয় নাই। ঐ শিক্ষা প্রণালীর সুফল হৃদয়ঙ্গম করিলে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও যে অবিলম্বে কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রথা প্রচলিত হইবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমি এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অবশ্য একটা প্রবন্ধে এরূপ গুরুতর বিষয়ের সম্যক পর্য্যালোচনা করা অসম্ভব, সে জন্য আমি এই পত্রে কেবল মহাত্মা ফ্রোবেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দুএকটী উদাহরণ দেখাইবার চেষ্টা করিব। অবশিষ্ট ভবিষ্যতে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

'কেবল সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন বাস করিতে পারে',--এই উৎকৃষ্ট বাক্যের উপর ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। শরীর ও মনের সমভাবে ও সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর ঐ উদ্দেশ্য পূরণের উপায় তিনি স্বাভাবিক শিক্ষা ও উপদেশ হইতেই পাইয়াছেন। জীবনারম্ভ মাত্র প্রকৃতি নিজের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত, সুতরাং তিনিও ঐকাল হইতে শিশুকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার ইন্দ্রিয় সকল খুলিয়া যায়, ও উহার দ্বারা বহির্দৃশ্য ও ভাব তাহার মনে অঙ্কিত হয়। এইরূপে সে যে সব নূতন ধারণা ও জ্ঞান লাভ করে, সদুপায়ে ক্রমশ তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া উহার মনোবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি প্রভৃতির স্ফূর্ত্তিসাধনে সহায়তা করা ফ্রোবেলের প্রধান লক্ষ্য। ঐ কাজে তিনিই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক। তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী দার্শনিক রুসো ও জর্ম্মন পেস্তেলোজি[11] ইউরোপের শিশুশিক্ষার অসম্পূর্ণ ও অনিষ্টকারী পুরাতন ধারার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা ফ্রোবেলই প্রথম শিশুস্বভাব উত্তমরূপে বুঝেন, ও সামান্য বস্তু বা ক্রীড়া দ্বারা শিক্ষা দিবার রীতি প্রচার করিয়া বহু যত্নে ও পরিশ্রমে জর্ম্মনীর পুরাতন শিক্ষাপ্রথার স্থানে নূতন কিণ্ডরগার্টেন প্রণালী চলিত করেন।

সাধারণ বালকবালিকার প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেরও অনেক দেশে অত্যন্ত অবহেলা দেখা যায়। সচরাচর বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে কেবল মস্তিষ্কেরই চালনা হয় ; কিন্তু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমূহ, হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তিগুলি এরূপ অপুষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, যে সমস্ত জীবন তাহার কুফল ভুগিতে হয়। প্রাপ্ত বয়সেও কেহ একটী অন্ধকার ঘরে থাকিলে বা কোন গুপ্ত শব্দাদি শুনিলে ভয়ে কিরূপ উপস্থিত বুদ্ধি হারায় ও অজ্ঞান শিশুর অপেক্ষাও অধিকতর অসহায় হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও অজানা নাই। এমন কি এক ইন্দ্রিয়ের অভাব যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্যক চালনা ও পরিপুষ্টি দ্বারা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে তাহা আমরা অন্ধলোকের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট জানিতে পারি। খেলার সাহায্যে আমাদের অবয়বাদি ও

ইন্দ্রিয় সকল কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে রূসো তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। ফ্রোবেল তাঁহারই উপদেশ ও চারদিকের স্বাভাবিক সংকেত বুঝিয়া জীবনারম্ভ হইতেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হইতে শিক্ষা দেন। দেখা, শুনা ও ছোঁয়া—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান, মধুর বা কর্কশ শব্দের ধারণা এ সমস্তই তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। দোলার ভিতর শিশুর মুখের কাছে কোন উজ্বল রঙের একটা গোলা বা ঝুমঝুমি বাঁধিয়া রাখিলে উহার মনে রং ও আকারের জ্ঞান সঞ্চার হয়, ক্রমে শিশুর ধরিবার বয়স হইলে উহা হাতে করিয়া সে স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ছেলেদের মন ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড়, শক্ত নরম, নানা রকমের গোলা দ্বারা অনেক প্রকার ক্রীড়া সাধিত হয় ; ঐ সব খেলা হইতে শিশুরা অজ্ঞাতসারে যে সব দ্রব্যের জ্ঞান ও আভাস পায়, তাহা চিরকাল মনে বসিয়া থাকে।

ফ্রোবেল নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক বিধান পর্য্যালোচনা করিয়া উহার তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। বীজের মধ্যে যেমন গাছের অঙ্কুর ঢাকা থাকে, তাহা কালে ডালপাতা শিকড়যুক্ত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয় ; ডিমের ভিতরের লুকান জীবনবীজ যেমন সময়ে পাখী ও উহার আশ্চর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পাখাদিতে পরিপুষ্ট হয় ; পাথর যেরূপ আরম্ভ কালে প্রাপ্ত আকার ও রঙ ব্যতীত অন্য কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারে না ; প্রত্যেক জীব যেমন অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট, বর্দ্ধিত, বিকশিত ও মৃত হয় ; আর যে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত দিকে যাইতে কাহারও এক মুহূর্ত্তের জন্য সাধ্য নাই—সেই বিশ্বব্যাপী বিধানের অধীন হইয়া মানবজীবন ও মানব স্বভাবও অনবরত চলিতেছে। ঐ সব স্বাভাবিক নিয়ম কি ও কিরূপে উহার দ্বারা প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই কিণ্ডরগার্টেন আমাদিগকে দেখাইয়া ও শিখাইয়া দেয়।

মনে যাহা কিছু প্রবেশ করে সকলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ; আর ঐ সব ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত ভাব ও জ্ঞান মনের উপর একান্ত আধিপত্য করে—এই ধারণা ফ্রোবেলের শিক্ষারীতির মূল। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা যেমন বিজ্ঞানের শিক্ষা বা সাহায্য বিনাও নিজেদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলকে ঠিকরূপে চালাইতে পারেন ; শিশুও সেইরূপ অজ্ঞানভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার শিখে। বিজ্ঞান আমাদিগকে কেবল স্বাভাবিক নিয়ম শিক্ষার সাহায্য করে; পৃথিবী ও বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে বৃদ্ধি, স্থিতি ও হ্রাসের কারণ নির্দ্ধারণে সক্ষম করে। আর যদিও আমরা কখন সম্পূর্ণরূপে জগতের সৃষ্টিজ্ঞান বুঝিতে না পারি, যদিও অন্যান্য অনেক অপার্থিব কাণ্ডের ন্যায় উহাও চিরকাল মানুষের কাছে অপরিজ্ঞেয় রহস্য স্বরূপ থাকিবে, তথাপি পরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা আমরা স্বাভাবিক শক্তির উপর ক্ষমতা চালাইবার জ্ঞান লাভ করি।

সকলেই জানেন, এক কালে জল ও আগুণ—এই দুটী ভূতকে লোকে কত ভয় করিত; কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলে উহারা মানুষের যে কিরূপ ভৃত্যের ন্যায় খাটিতেছে, তাহা আশ্চর্য্য ধোঁয়াকলের কাজ হইতে আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। অবশ্য, বীজ ব্যতীত বৃক্ষ সৃজন করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই ; কিন্তু উদ্ভিদ জীবনের জ্ঞানের দ্বারা মানুষে তরুলতাদির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারে ; এমন কি পশুজীবনও বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও যত্নের দ্বারা

মানুষ অধিকতর উৎকৃষ্ট করিতে পারে। বৃক্ষরোপণ বা উৎপাটন, ভূমি শুষ্ক বা সজল করার দ্বারা মানুষ বাতাস ও মেঘকেও অনেক পরিমাণে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে। যে শক্তি হইতে অদ্ভুত বিদ্যুতের উৎপত্তি, সেই তাড়িত আমাদের দূতস্বরূপ হইয়া দেশে দেশে সমস্ত জগতে সংবাদ বহিতেছে। তবে শুধু মানুষের মন কি মানবজাতির অন্বেষণের কাছে একেবারে অগম্য ও অজ্ঞেয় থাকিবে? মনের নিয়ম সকল যে শারীরিক বিধানের উপর একান্ত নির্ভর করে তাহার প্রমাণ আমরা নিরন্তর দেখিতে পাই। সুতরাং বিশ্বজগতের স্বাভাবিক বিধান জ্ঞান ও উহার অনুশীলন দ্বারা ঐ উন্নত মানবজীবনকে যে আরো সুন্দর ও মহৎ করা যায়, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের চারিদিকস্থ প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অজ্ঞতা ও বিকৃতি বশতঃ প্রকৃত শিক্ষার বিদ্যা অন্যান্য অনেক মহা উপকারী বিজ্ঞানের ন্যায় অবহেলিত হইয়া অতি নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাত্মা ফ্রোবেল প্রথম যখন তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী ব্যক্ত ও জর্ম্মনীদেশে প্রচার কামনা করেন, তখন তিনি যত ইউরোপীয় বিশেষ জর্ম্মন জননীদিগকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ আগ্রহ দেখিয়া জর্ম্মন মাতারা তাঁহার কাজে যোগ দেন, ও তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমেই ফ্রোবেলের উত্তম শিক্ষাপ্রণালী জর্ম্মনদিগের ঘরে ঘরে, পিতামাতার কানে কানে ও শিশুদের মুখে মুখে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষে ঐরূপ উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার রীতি সর্ব্বস্থানে জ্ঞাপন ও প্রচলিত করিবার সময় স্নেহময়ী ভারতীয় মাতাদের সাহায্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। হাজার বিদ্বান পুরুষকে ঐ মহাশিক্ষার কথা বুঝাইলে যত না উপকার হইবে, একজন জননী অনায়াসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহার অধিক সুফল দেখাইতে পারিবেন। শিশু মাতার প্রাণের ধন, তাহাকে শিখাইতে হইলে মা ছাড়া আর কে অধিক মনোযোগী ও সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃপ্রেম ও মার স্বভাবের আভাস পায়, আর ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধঘুমন্ত আত্মায় প্রবেশ করে। মা বুকে করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি যত্নে তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আবার সে জাগিবামাত্র বুকে রাখিয়া দুধ দেন। ঐ রূপে জননীর ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা শিশুর আত্মায় প্রবেশ করিয়া পবিত্র, মহৎ ও উন্নত মানব স্বভাবের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতা-সন্তানের স্নেহালাপের সঙ্গেই মানবহৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মভাব উদয় হয়। জননীর স্নেহময় গান ও কথা সকল সতত শিশুব সহিত ঘুরিয়া বেড়ায় ; কাণে সর্ব্বদা ঐ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও চোকে নিরন্তব ঐ প্রেমময়ী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শিশুর ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে জাগিয়া উঠে।

শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্যও ফ্রোবেলের শিক্ষাধারা অতি উপকারী। ক্রমে মার গান শুনিতে শুনিতে শিশু যত বড় হইতে থাকে ও চলিতে শিখে, তখন ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে খেলিতে শিখানও আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিশুর পক্ষে আনন্দদায়ক ও উপকারী, তাহা আমরা আর একটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই কোমল বয়সে যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি নমনীয় থাকে, সেই সময়ে উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের চালনা দ্বারা প্রত্যেক ভাগের সম্পূর্ণরূপে পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করা যায়। ক্রীড়া শিশুজীবনের প্রথম ইচ্ছা ও প্রধান কাজ। সুতরাং খেলা দ্বারা ছেলেদের শরীর পুষ্ট করা ও মন প্রশস্ত করার

ন্যায় ঔষধ আর নাই। নানা প্রকার বিধিমত ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির দ্বারা বালক বালিকাদের শরীর ও মন উভয়ই একভাবে চালিত হয় ; উহা তাহাদিগকে সকল জিনিসের আকার প্রকার ও কাজের শৃঙ্খলা শিখায় ; তাহাদের শরীর সবল ও মন দৃঢ় করে আর ঐ কোমল জীবনকে ভবিষ্যতের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করে।

জননীর মিষ্ট ও সরল গীত ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায়, পরে চার বৎসরের প্রথম হইতে তাহাকে কিণ্ডরগার্টেনে পাঠান কর্ত্তব্য। অবশ্য, যে ছেলেরা মার কাছে কিণ্ডরগার্টেনের সব শিক্ষা পায়, যাহাদের গৃহই স্কুল, তাহাদের আর ভিন্ন স্থানে যাইবার কোন দরকার নাই। তবে যাহাদের বাড়ীতে ঐ রূপ শিক্ষার কোন উপায় নাই বা মাতা ঐ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ও অপারগ, তাহাদের জন্যই কিণ্ডরগার্টেন স্কুলের আবশ্যক। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত সন্তানদিগকে অত অল্প বয়সে স্কুলে পাঠাইতে ভারতীয় পিতামাতারা প্রথম প্রথম আপত্তি করিতে পারেন ; কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে তাঁহারা উহার উপকার যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে ও ঐ শিক্ষার ফলে তাঁহাদের প্রাণাধিক বৎসগণকে সর্ব্বদা সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিলে, তাঁহারা উহাতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

এমন কি, ফ্রোবেল জর্ম্মনী দেশে যখন এই নূতন শিক্ষাবিধির প্রথম প্রচার করেন, তখন সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী বলিয়া স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয় ও জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট, অধিবাসী সকলেই তাঁহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা ফ্রোবেলের জ্ঞান, সদাশয়তা, শিশুপ্রেম ও পরোপকারের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অতি ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার শিক্ষাধারা ও গভীর মহত্ত্ব যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিলেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিয়া জর্ম্মণীর সর্ব্বত্র কিণ্ডরগার্টেন খুলিলেন। এখন ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে ঐ নূতন শিক্ষারীতির স্কুল খোলা হইয়াছে আর আমেরিকায় পর্য্যন্ত উহার অনেক সুফল দেখা যাইতেছে।

এখন পাঠক পাঠিকারা আসুন, আমরা একত্র কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া উহার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি। এখন প্রাতঃকাল, বেলা ৯টা। শিক্ষয়িত্রী স্কুলাগত শিশুদিগকে আগে চক্রাকারে দাঁড় করাইয়া নিজে মাঝখানে হাঁটু গাড়িয়া জোড়হাতে একটী ছোট প্রার্থনা বলিতেছেন। অতি মৃদু ও করুণ স্বরে উহা উচ্চারিত হইল, পরে গত রাত্রে নিরাপদে নিদ্রার জন্য পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলে মিলিয়া একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিল।

গানের পর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "এখন, বাছারা সকলে, নিজ নিজ জায়গায় বস, তোমরা স্থির হইবামাত্র আমি একটী গল্প বলিব।" মহা আনন্দে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল ও আগ্রহে গল্প শুনিতে চাহিল। কিন্তু আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ভাল অভ্যাস শিখান তাঁহার উদ্দেশ্য, সে জন্য তিনি আবার বলিলেন, "যতক্ষণ তোমরা সকলে এমন স্থির না হইবে যে, মাটীতে ছুঁচ পড়ার শব্দ শুনা যায়, ততক্ষণ আমি গল্প আরম্ভ করিব না।" এই বলিয়া তিনি একটী ছুঁচ ভূমিতে ফেলিতে উদ্যত হইলে, শিশুরা সকলে অতি স্থির ও

একমনা হইয়া কাণ পাতিয়া রহিল। এখন বসন্তকাল ; তিনি তাহাদিগকে বকের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন ; শীতকালে কেমন তাহারা জড়ভাবে ছিল, অধিক খাদ্য পাইত না, এখন যত গরম হইতেছে তত তাহারা ঝোপঝাপ হইতে বাহির হইয়া পুকুরের ও নদীর ধারে গিয়া মাছের অন্বেষণে বেড়াইতেছে। তাহারা কেমন বাসা নির্ম্মাণ করে, কত যত্নে শাবকদিগকে খাওয়ায় ও ছানারা বড় হইলে তাহাদিগকে লইয়া বেড়ায় ও খাবার খুঁজিতে শিখায়—ইত্যাদি। শিশুরা গল্প শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। ক্রমে তিনি একে একে সকলকেই ঐ গল্পটী শিখাইবার জন্য একটী বকের গান দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহারা প্রথম কথা মুখস্থ করে, পরে গাইতে শিখে ; গানের পর সকলে বক্ বক্ খেলা করে। ঐ ক্রীড়া শেষে শিক্ষয়িত্রী তাহাদিগকে একটী গোলা দ্বারা ঐ পদার্থের আকার, গতি ও পরিমাণাদি শিক্ষা দেন। শিশুরা অতি উল্লাসে উহাতে যোগ দেয়।

অবশ্য আমাদের দেশে কিণ্ডরগার্টেন প্রচলিত করিতে হইলে ইউরোপীয় গল্প ও খেলা সকল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

তার পর তিনি একখানা চারকোণ্ কাঠ ধরিয়া ছেলেদিগকে উহা কি, উহার কটা কোণ্ আছে ও কটা পিঠ আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর তাহারা নিজে যাহাতে ঠিক করিয়া উত্তর দিতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ঐরূপ কাঠ ও গোলা খেলা হইতে শিশু আপনা আপনি গণনা ও কিছু কিছু পদার্থবিদ্যা শিখে। ঐ ক্রীড়ার পর তাহাদের নিজে নিজে কাজ করিবার সময় আসিল। ক্ষুদ্র শিশুগুলি বাড়ী বা পোল ইত্যাদি নির্ম্মাণের বাক্স ও অপেক্ষাকৃত বড় বালক বালিকারা ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা দ্বারা ঘরবাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম তাহারা অতি সরল কাজ শিক্ষা পায়। উহা দ্বারা ছেলেরা সোজা ও বাঁকা রেখা, ত্রিকোণ ও গোল প্রভৃতি জ্যামিতির রেখা টানিতে অভ্যস্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তাহারা নিজেরাই ঐ সব কাঠ লইয়া খেলার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। তাহারা নিজে যাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ ক্ষুদ্র কল্পনানুসারে তাহার নাম দেয়। শিশুরা আত্ম সাহায্যে যাহা কল্পনা ও নির্ম্মাণ করে, তাহা কখন ভুলিয়া যায় না। সুতরাং ঐ বাল্যশিক্ষা ও নির্ম্মাণ অভ্যাস বালক বালিকাদের যৌবনকালে জ্ঞানোপার্জ্জনের অনেক সহায়তা করে। কাঠের দ্বারা ঐ সব বাড়ীঘর নির্ম্মাণশিক্ষাকে 'অঙ্কশাস্ত্র প্রণালী' কহে। তাহা ছাড়া 'জীবন্ত প্রণালী' ও 'সৌন্দর্য্য প্রণালী' নামে আর দুটী শিক্ষাধারা আছে। তার মধ্যে প্রথমটীর দ্বারা যত শিল্প ও স্বাভাবিক দ্রব্যের নকল প্রস্তুত করিতে শিখান হয় ; আর শেষেরটী হইতে ছেলেরা সকল জিনিস অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইতে ও গড়িতে শিখে। শিশুরা ঐ সামান্য কাঠের খণ্ড দ্বারা চৌকী, টেবিল, বাড়ী, বাগান, সাঁকো ও এমন কি জাহাজ, কলের গাড়ী পর্য্যন্ত—যাহা তাহার ক্ষুদ্র কল্পনায় আসে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে পারে। অবশ্য ঐ সব কাজে প্রথম প্রথম বেশী শিল্প কৌশল দেখা যায় না ; কিন্তু উহা দ্বারা কোন্ দ্রব্য ও কাজের প্রতি শিশুর মন আসক্ত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি, ও তদনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াও সহজ হইয়া আসে। আর প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অভ্যাস করায় অবিলম্বে তাহাদের

হাত ও চোখ সমানভাবে সুন্দর কাজে পারক হয়।

ছোট ছেলেরা বালির ঘর প্রস্তুত, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যজনক ও আনন্দদায়ক অতি সরল কাজে নিযুক্ত হয়। কাঁচের মালাগাঁথা, কাগজের বাক্স তয়ের, তুলা বাছা, পুতুলগড়া ও পুতুলের বিছানা সেলাই ইত্যাদি নানা প্রকার কাজ শিশুরা খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিখে। সংক্ষেপে, কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শিশুদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন কল্পনা, রুচি ও বৃত্তি সকলের পুষ্টির জন্য প্রচুর উপায় দেওয়া হয়, ও উহা হইতে পিতা মাতারা সন্তানদের বিশেষ বিশেষ মনোগত ভাব ও অভিরুচি বুঝিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানে সক্ষম হন।

কোন কোন কিণ্ডরগার্টেনে বাদ্য শিখান হয়। উহা দ্বারা শিশুদের শ্রবণশক্তির উৎকর্ষণ লাভ হয়। ঢাক, ঢোল, ভেঁপু, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন ; ও নিজে গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজান। বাজ্‌নার মত আনন্দকর ক্রীড়া শিশুদের আর কি আছে? তারা উল্লাসে উহাতে যোগ দেয় ও অতি অল্পদিনে গান বাজনায় পটু হয়। সকাল বেলা তিন ঘণ্টা খেলিবার পর জলখাবার সময় আসে। ছেলেরা একত্র হইয়া খাবার ও দুধ খায়। ভোজনের পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম। আবার বিকালবেলা খেলা ও গল্পের সময়।

শিশুরা উঠানে সার বাঁধিয়া দাঁড়ায় ; শিক্ষয়িত্রী তাহারা কি খেলা খেলিবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। যে খেলা অধিক ছেলে পছন্দ করে, তাহাই তখন আরম্ভ হয়। "চাষা কিরূপে শস্য বোনে জান্‌তে চাও?" শিশুরা চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে কৃষকের ভূমি চষা ও শস্য রোপণের গান গায়। তারপর কাজ শেষে চাষী কিরূপে লাঙ্গল ঘাড়ে গৃহে ফিরে; কি প্রকারে গরুর গাড়ীতে ফসল বহিয়া গোলায় রাখে, নূতন খন্দ কাটার পর তাহারা কেমন আনন্দে নবান্নর ভোজ লাগায় ; মাঠের কাজ ও পবিশ্রমের শেষে কত শান্তিতে বিশ্রাম করে—প্রভৃতি কৃষকের যত কাজ শিশুরা অভিনয় দ্বারা জানিতে পারে। প্রতি বালক বা বালিকা এই অভিনয়ের এক এক ভাগ খেলিতে শিখে, তাদের হাত-পা বাজনার সঙ্গে তালে তালে দুলিতে থাকে, আর সকলে মিলিয়া গান গায়। কৃষকের খেলা শেষে কতকগুলি ছেলে গোল হইয়া একটী বন কল্পনা করে, আর অবশিষ্টেরা পাখী হইয়া এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অনুকরণ করে। সকলে উড়িয়া ক্লান্ত হইলে হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটু পাতিয়া বসে ও পাখীর বাসার নকল করে ; ও পরস্পরের কাঁধের উপর নিজেদের ছোট ছোট মাথা রাখিয়া পাখীরা যেন ঘুমাইতেছে, এইরূপ দেখায়। ঐ সময়ে অন্যান্য ছেলেরা আস্তে আস্তে একটী নিদ্রার-সঙ্গীত গায়। ক্রমে যেন রাত পোহাইল। পাখীরা ঘুম হইতে উঠিয়া আনন্দে আবার চারদিকে উড়িতে থাকে। পাখীর পর খরগোসের খেলা, হাঁসের খেলা, ঘোড়া ঘোড়া খেলা ইত্যাদি ক্রীড়ার পালা আসে। সকলগুলিই সব ছেলেদের সমান ব্যায়ামের জন্য বার বার খেলা হয়।

ক্রীড়াগুলি শিশুদিগকে মানুষ ও জন্তুদের কাজ ও পরিশ্রম দেখায় ও শিখায়। কল প্রস্তুত, পোলনির্ম্মাণ, বাড়ী তয়ের, গাছকাটা, জাহাজ গড়া প্রভৃতি বড় বড় কাজও উহাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে দেখান ও শিখান হয়। ছেলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা ও গান গাওয়া ব্যতীত এ সব খেলায় আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। ঐ সব ছোট ছোট খেলা অভিনয়ের পূর্ব্বে বালক বালিকাদিগকে খেলিবার নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া হয় ; আর সকল

ক্রীড়াতেই আমোদ ও কাজ একত্র থাকায় শিশুগণ কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

শিশুদের দ্বারা ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য শরীর ও মনের সমচালনা। উহাতে হাত পা, আঙ্গুল বাহু, কোমর বুক, শিরা ধমনী প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অংশের যথোচিত ব্যায়াম হয়। আর মনও চালিত হওয়াতে মনোবৃত্তি সকল কর্ষিত ও সবল হয়। গানবাদ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চ্চা হয়। অভিনয়ে ভাষাজ্ঞান ও মনোভাব প্রকাশের শক্তি একসঙ্গে জন্মায়। ঐ সকল ক্রীড়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পুষ্টি সাধন করিয়া শরীর ও মনকে সবল ও সুস্থ রাখে। শরীরের চালনা ভিন্ন মনের চালনা, বা মনোবৃত্তি কর্ষণে উপেক্ষা করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধনে চেষ্টা করা যে অনভিজ্ঞের কাজ, তাহার আমরা প্রত্যহ প্রমাণ দেখিতেছি। শরীর ও মন উভয়ই একরূপ যত্ন ও চালনা দ্বারা পরস্পরের সমান কার্য্যযন্ত্র না হইলে কোন মানুষ বা কোন জাতির প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ফ্রোবেল শরীর ও মনের ঐরূপ একান্ত সংস্রব বুঝিয়াই বলিয়াছেন—'সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন থাকিতে পারে।'

ইন্দ্রিয়াদির চালনার জন্য কতিপয় ক্রীড়া হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কাণামাছির মত একটী ক্রীড়ার দ্বারা বালক বালিকাদের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তি কর্ষিত হয়। আর দু একটী নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ ক্রীড়ার দ্বারা শিশুরা আত্মসংযম ও চিত্ত দমন প্রভৃতি মহৎ গুণে অভ্যস্ত হয়। এইরূপে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক গুণেরও উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে।

আর, ঐ সব আনন্দময়ী ক্রীড়াতে শিশুরা অপরিসীম উল্লাস ও স্বাধীনতা ভোগ করিলেও সকলে স্কুলে আইনমতে চলিতে বাধ্য। খেলা ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখন করিবার যো নাই। গোলাকারে দাঁড়ান প্রভৃতি কাজে বালক বালিকারা শরীরকে অতি সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়। সামান্য গান ও ব্যায়ামেও বিন্দুমাত্র স্কুলের নিয়ম অন্যথা হয় না। কেহ নিজের ইচ্ছামত খেলায় যোগ বা ভঙ্গ দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার অংশ নির্দ্দিষ্ট শিশুদের দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে। আর অন্যেরা, যতক্ষণ না তাহাদের পালা আসে, ততক্ষণ ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা কাজের সঙ্গে নিয়ম পালন, আইন রক্ষা, নম্রতা, বশ্যতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে অভ্যস্ত হওয়ায় উহাদের সদ্‌গুণগুলির স্ফূর্ত্তি ও মন্দ অভ্যাসের নিরাকরণ হইয়া থাকে। স্কুলের বড় ছেলেরা ছোট শিশুদিগকে কাজে সাহায্য করে ও শিক্ষয়িত্রীকে দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে আনুকূল্য করে। ক্ষমতা বা পীড়নের দ্বারা স্বার্থ লাভের ইচ্ছা তাহাদের কখন প্রশ্রয় পায় না, কেন না, কিণ্ডরগার্টেনে ছোট বড় সব সমান। কোন শিশু দুর্ব্বল বা ভীত হইলে তাহার বলিষ্ঠ সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই আনন্দময় স্কুলে ছেলেদের কখন, কোন শাস্তি দিবার রীতি নাই ; দুষ্ট বা একগুঁয়ে ছেলেদিগকে ক্রীড়াতে যোগ দিতে না দেওয়াই তাহাদের একমাত্র দণ্ড।

আমরা কিণ্ডরগার্টেন প্রণালী ও শিশুদিগকে দেখিয়া আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি—ওদিকে স্কুল বন্ধের ঘণ্টা বাজিল ; শিশুদের দাসীরা তাহাদিগকে যে যার গৃহে লইতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ওরূপ সুখের খেলা ছাড়িয়া বাড়ীতে মার কাছে যাইতেও ইচ্ছুক নয়। কেননা, তাহাদের ঐ সব ক্রীড়াতে ক্লান্তি বোধ হওয়া দূরে থাক, মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। আর আমরাও ঐ সব সুন্দর শিক্ষাদায়ী ক্রীড়া

ও সুস্থ শিশুদের উল্লাস দর্শনে এত নিবিষ্ট ছিলাম যে বেলা ৪টা বাজিয়াছে, তাহা জ্ঞান ছিল না।

পিতামাতারা হয় ত ভাবিতে পারেন যে কচি বয়সে অত প্রকার খেলা ও শিক্ষাতে শিশুদের মনের ও শরীরের অতিরিক্ত চালনা হয়। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, কাজের শেষে খেলা, আর শারীরিক চালনার পর মনোবৃত্তির কর্ষণ ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ও স্বাধীন ভাবে অবাধে লাফান, দৌড়ান প্রভৃতি দ্বারা কোন বিষয়েরই অতিরিক্ত চালনা হইবার সম্ভাবনা নাই। একটী কিণ্ডরগার্টেনে প্রবেশ করিয়া যদি একবার আপনারা ক্রীড়া নিযুক্ত বালক বালিকাগণের প্রফুল্ল ভাব দেখেন, তাহা হইলে সে মনোহর, চিত্তমুগ্ধকারী দৃশ্য কখন ভুলিতে পারিবেন না। দেখুন, তাদের শ্রমদক্ষ ছোট ছোট হাতগুলি কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাজে রত রহিয়াছে। কত আগ্রহের সঙ্গে তাহারা নূতন গল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছে। কত সহজে তাহারা জ্যামিতির রেখা টানিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার আঁকিতেছে। তাহারা কেমন একদণ্ডের জন্যও খেলা ও কাজ ছাড়িতে চায় না, অথচ শিক্ষয়িত্রী ডাকিবামাত্র নিজ নিজ খেলা-সামগ্রী গুছাইয়া তাঁর কাছে ছুটিয়া যায় ও অন্য প্রকার খেলা বা গল্পে যোগ দান করে। বাস্তবিক এ সব দেখিয়া আমরা যে কতদূর আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আমি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ও উহাদের উদ্দেশ্য পাঠক পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিলে এ মহৎ শিক্ষার সুফল বোধগম্য হওয়া দুষ্কর।

শিশুদের শেষ খেলা প্রায় সম্পূর্ণ হইল, আর সমাপ্তির গান গাওয়া হইল।

ঐ গানে ছেলেরা পরস্পরকে সম্ভাষণ করিয়া বলে, "এখন আমরা খেলা ও কাজ শেষে নিজ নিজ বাপমার কাছে যাইতেছি, আবার কাল সকালে একসঙ্গে মিলিয়া খেলিব।"

তার পর তাহাদের জামা ও পোষাকাদি ঠিক করিয়া পরা হইলে তাহারা শিক্ষয়িত্রীকে চুম্বন করিয়া ও তাঁর হাত ধরিয়া তাঁর কাছে বিদায় লয়। আমরা অপরিচিত দর্শক হইলেও তাহারা আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিল। আমরা সানন্দে তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। তখন শিশুরা নাচিতে নাচিতে যে যার দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল। আমরা এক দৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম ও ঐ সুন্দর দৃশ্যে মনে কত ভাবের উদয় হইল।

স্কুলের পাঠের ন্যায় কিণ্ডরগার্টেনের ক্রীড়াদিও প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। রোজ নূতন নূতন খেলা ও গল্পের নিয়ম আছে। উহা দ্বারা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়ম, মানুষের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট বড় সকল বিষয়ের কথা ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া, পশুপক্ষিদের গল্প, ঈশ্বরের কথা ও ধর্ম্মোপদেশও তাহাদের সরল বুদ্ধির উপযোগী করিয়া বলা হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল ক্রীড়া ও গল্প লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেষ নাই।*

*[এই একই বিষয়ের ওপর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর লেখা প্রবন্ধের জন্য পরিশিষ্ট ৩ অংশটি দেখুন।]

সমাজ ও সমাজ-সংস্কার

জীব ও তরু অঙ্কুর কালে অতি সরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে ঐ সরল পদার্থটী ক্রমে যেরূপ দুই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট একটী জটিল পদার্থ হইয়া উঠে, সেইরূপ মানব সমাজও অভ্যুদয়কালে এক এক পরিবারে গঠিত হইয়া ক্রমে উহার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বহু পরিবারের সমষ্টি সম্পন্ন একটী বিপুল ও জটিল সমাজগৃহ প্রস্তুত করে।

মানবজগতে বিবাহ যেমন পরিবারের মূল, সেইরূপ ঐ সমাজগৃহ সকল জাতিরই ভিত্তি স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রথানুসারে ঐ ভিত্তি গাঁথিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য একই—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রীতিনীতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারবর্গকে এক সূত্রে গ্রথিত রাখা। যে সমাজের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার যত বহু সংখ্যক ও অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থায় আবদ্ধ, সে সমাজগৃহ তত দৃঢ় ও সংকীর্ণ ; আর যে জাতির সমাজ অধিকতর উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, তাহার সভ্যেরাও তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত। শিশুর জন্মমাত্র ডাক্তারেরা তাহাকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত গৃহে রাখিতে বলেন, ঐ উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে শিশুর যে পীড়া বা প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই জানেন। সেইরূপ কোন জাতিকে মানসিক সুস্থতা ও সবলতা প্রদান করিতে হইলে তাহাদের সমাজগৃহকেও মধ্যে মধ্যে কালোপযোগী সুসংস্কার দ্বারা পরিষ্কার ও মার্জ্জিত করা আবশ্যক। এই স্বাভাবিক বিধানে অবহেলা করিলে উহার সভ্যেরা যে পীড়িত ও কালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ভিন্ন দেশের ভিন্ন স্বভাবাপন্ন মানুষ হইতেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপ সমাজ ব্যবস্থাই ঐ সকল ভাল মন্দ মানুষ এবং তাহাদের বিভিন্ন অবস্থা গঠনের হেতু। সে জন্য এ জগতে আমরা কেবল সামাজিক রীতিনীতির দ্বারাই নানা জাতিকে সভ্য, অসভ্য, মার্জিত, বর্ব্বর—নাম দিয়া থাকি। আর মানুষ কেবল ঐ সমাজ বন্ধনের দ্বারাই প্রথম হইতেই সকল জন্তুর উপরে উঠিয়াছে। যে জাতির সমাজ ব্যবস্থা যত নিকৃষ্ট, আচার ব্যবহারে তাহারা পশুদের তত নিকটবর্ত্তী, আর যে লোকের সামাজিক জীবন যত উৎকৃষ্ট তাহারা তদনুরূপ শ্রেষ্ঠতর জাতি। সমাজ ব্যবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার বুস্‌ম্যানেরা ও আফ্রিকার পশ্চিমভাগস্থ কয়েকটী জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য ও অমার্জ্জিত; আর ইউরোপের নরওয়েজিন্‌রা সকলের অপেক্ষা উন্নত ও মার্জ্জিত। এই উচ্চতম ও নিম্নতম দুইটী মানব জাতিকে মিলাইয়া দেখিলে, ঐ দুই প্রকার জীবনে কত প্রভেদ, তাহা আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারি। একটীতে স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিতাশিক্ষিত, সকলেই কেমন সমানভাবে নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার ভোগ করিতে পায়, ও তাহাদের জীবন কত প্রশস্ত, উন্নত ও শান্তিময় দেখা যায়। অপরটীতে পরস্পরের মধ্যে পশুদের মত নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী ও বাসস্থান লইয়া অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোক, বালক ও দুর্ব্বলেরা অপেক্ষাকৃত বলবানদিগের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও ত্রস্ত থাকে।

নরওয়েবাসীদিগের উন্নত রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে স্ত্রী পুরুষ সবল দুর্ব্বল, সকলেই সমস্ত বিষয়ে সমান স্বত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করে, পরস্পরের সাহায্য করে ও সমান ভাবে সাধারণ কার্য্যে সহায়তা করে। উহাদের মধ্যে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ বা ধনী দরিদ্রের বিভিন্নতা না থাকাতে সমাজের সকল লোকই সংসারে যেরূপ এক প্রকার মান্য ও অধিকার পায়, সেইরূপ সাধারণ কার্য্যেও তাহাদের সমান ক্ষমতা ও অধিকার। ঐ দেশে কেহ কাহারও দাসত্ব করে না, কেহ কাহারও প্রত্যাশী নহে ; সকলেই এক প্রকার স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভর। উহাদের সংসার অতি মার্জ্জিত, সুশৃঙ্খল ও আনন্দময়। অন্যদিকে আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি ও অস্ট্রেলিয়ার বুস্‌ম্যানের মধ্যে স্বত্বজ্ঞান ও সমাজ ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। তাহাদের সমাজ কেবল এক এক পরিবার লইয়া গঠিত, আর ঐ আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও প্রকৃত একতা ও সহানুভূতি দেখা যায় না। উহাদের পরস্পরের যত স্বত্ব ও অধিকার কেবল নিজ নিজ বাহুবলানুসারেই রক্ষিত বা লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। বড় ভাই রুগ্ন বা অক্ষম হইলে ছোট ভাই তাহাকে মারিয়া তাহার সম্পত্তি লইতে পারে ; কোন বলবান যুবক নিজে ইচ্ছামত একজন স্ত্রীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিতে পারে; আর সুবিধা পাইলে প্রতিবাসীদিগের উপর শত্রুতা ও অত্যাচার করিতেও তাহারা ছাড়ে না। অবশ্য, সংসারে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ঐ রূপ পশুভাব একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষানুসারে সভ্য জাতির লোকেরা ঐ সকল মন্দ ইচ্ছা বা বাসনাকে দমন করিয়া রাখিতে শিখে ; আর অসভ্য জাতিরা প্রকৃত সামাজিক বন্ধন ও ব্যবস্থার অভাবে অনায়াসে ঐ সকল মন্দ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পশুতুল্য নানা জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আর দৃঢ় সমাজ বন্ধন নাই বলিয়াই আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা অন্যান্য জাতির সংস্রবে আসিয়া একে একে বিলুপ্ত হইতেছে।

অতীত ও বর্ত্তমান সকল জাতির সামাজিক ইতিহাস খুঁজিলে আমরা ঐ রূপ জাতি নিঃশেষের কত প্রমাণ পাই, উহা দ্বারা ইহাই আমাদের স্পষ্টরূপে প্রতীতি জন্মে যে জগতের গতির সঙ্গে মানব অবস্থার যেমন নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেইরূপ তাহাদের সমাজগৃহও সময়ে সময়ে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত ; নতুবা একটী বর্দ্ধনশীল শিশুকে যেমন একটী ছোট দোলায় বরাবর শোয়াইয়া রাখিলে সময়ে তাহার হাত পা বাঁকিয়া সে নুলো বা খোঁড়া হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সেইরূপ সমাজগৃহের উপযুক্ত প্রশস্ততার অভাবে কালে তাহার সভ্যেরাও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাইয়া একটী অকর্ম্মণ্য জাতিতে পরিণত হইবে ; আর ঐ পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবশেষে সে জাতিরও লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

বলা বাহুল্য, য়িহুদীদের বাদ দিলে সমস্ত জগতের মধ্যে হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, আর তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা অতি পুরাতন ও সুশৃঙ্খল। সেই কারণে ঐ অলঙ্ঘনীয় সমাজ প্রথা হইতেই নানা প্রকারের অসংখ্য ঝড় ঝঞ্ঝাট, অত্যাচার ধাক্কা খাইয়াও হিন্দুজাতি এখনও ভারতবর্ষে বিরাজমান। হিন্দুদের প্রাচীন অভ্যুদয় হইতে এখন পর্য্যন্ত কত জাতি উঠিল ও নামিল ; কত পুরাতন জাতি সমূলে নির্মূল হইল, কিন্তু হিন্দু নাম এখনো সমস্ত

সংসারে জীবিত রহিয়াছে। আমরা আপন ধন, মান, দেশ, যশ—সমস্তই হারাইয়াছি, তথাপি পৃথিবীতে হিন্দুর নাম কেবল আমাদের অখণ্ড ও সুশৃঙ্খল সুসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা হইতেই এখনো সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। যে দিন যে পাষণ্ড ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় আমাদের সমাজকে বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিবে, সে দিন এই প্রাচীন আর্য্য নাম এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে।

মানব সমাজ অতি সূক্ষ্ম প্রাসাদ, উহা একবার দৃঢ়রূপে গঠিত হইলে উহাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় বনিয়াদ হইতে গাঁথা নিতান্ত সহজ নহে ; আর উহার উপর অপরিচিত জাতির হস্তক্ষেপ বা গবর্ণমেন্টের আইন চালনাও খাটে না। আমাদের সমাজ এরূপ সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ়রূপে গ্রথিত বলিয়াই সমাজ সংস্কারকেরা উহার প্রকৃত সংস্কার করিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছেন। আর গবর্ণমেন্ট স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে পক্ষে বিপক্ষে আইনজারি করিলেও সে সব পাথরের ঘরে নুড়ি মারার মত ঠিক্‌রে পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। এখন দেখা উচিত ঐ সব সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা যখন প্রস্তুত হইয়াছিল তখন হিন্দুরা কিরূপ ছিলেন, আর এখনই বা তাঁদের কি অবস্থা। মহর্ষি মনু যে দুচার শ নয়—প্রায় দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদের জন্য সমাজ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন—তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেকে বলেন, "হিন্দুরা সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ঐ সামাজিক আইন অনুসারে একভাবে জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন, সে জন্য তাঁদের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং সমাজ সংশোধনেরও আবশ্যকতা নাই।" কিন্তু তাঁহারা একটু চোক খুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে প্রাচীন কালের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুরাও [যদ.] তাঁহাদের রুচি, ইচ্ছা বাসনাদি সব লোপ পাইয়াছে ; আর আধুনিক আসিয়া ও ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে যত প্রভেদ,—এমন কি, আকাশ পাতালে যত বিভিন্নতা দেখা যায়—অতীত ও বর্ত্তমান হিন্দু জাতির মধ্যে তাহা অপেক্ষাও অধিক অসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। কেননা, আকাশ পাতালের প্রভেদ বাহ্যিক, আর প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুদের ভিন্নতা আন্তরিক। আসিয়িক ও ইউরোপীয়দের বিভিন্ন অবস্থার কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক, কিন্তু এই দুই কালের হিন্দুজাতির বিভিন্নতা রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

উন্নতি প্রতিরোধক বিজ্ঞেরা ঐ মহা প্রভেদে অবহেলা পূর্ব্বক হিন্দু সমাজকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় রাখিতে চাহেন বলিয়াই উহার সভ্যদের মধ্যে আমরা এত বিশৃঙ্খলা ও শোচনীয় ঘটনা দেখিতে পাই। ছেলেরা যেমন দিবারাত্রি অযথা শাসনে থাকিলে চুরী করিয়া সন্দেশ খায় ও লুকিয়া খেলানা ভাঙ্গে ; হিন্দু যুবকদের মধ্যে আমরা সেই রূপ অনেক কুসংস্কার সচরাচর দেখিয়া থাকি। কিন্তু প্রতিরোধকেরা যতই চেষ্টা পান না কেন—সময় ও অবস্থা ভেদে তাঁহাদের সে প্রয়াস কতকটা বিফল হইবেই হইবে। এই কারণে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যে সকল সামাজিক ও গার্হস্থ্য আইন হিন্দু রাজ্যে প্রাচীন কালের সরল হিন্দুদের পক্ষে অতি উত্তমরূপে খাটিত, মুসলমানদের কালে সে সকল অনুপযোগী হইয়াছিল, সুতরাং সে সময়ে দেশের অবস্থা অনুসারে হিন্দুরা নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে দুচারটী নূতন রীতি নীতি চালাইয়া উহাকে সেইকালের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেইরূপ যে সব সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষীয়দের

জন্য আবশ্যকীয়—আমি বলিতেছি না যে উত্তম—হইয়াছিল, শাসনের ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন বশত এখন সে সমস্ত অনাবশ্যক ও অপকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন প্রকৃত দেশহিতৈষী এ প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারেন না ! সুতরাং আমরা কেবল বহিরাকারে—হায় ! তাও বুঝি কোন্ দিন চলিয়া যাইবে !—সেই প্রাচীন মহাত্মা আর্য্য জাতির অনুসরণ করিয়া চলিলেও শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন আমাদের অন্তর্গত হইয়া আমাদিগকে তাঁদের ঠিক বিপরীত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আমরা কয়জন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন প্রাতে বেদাধ্যয়ন করিতে দেখি? আর কয়জনই বা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পর বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন? কয়জন হিন্দু যথার্থ জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী? কয়জন যুবক হলুদমাখা ও উল্কীপরা স্ত্রীলোককে স্ত্রী বা ভগিনী বলিতে ইচ্ছুক? কয়জন ভদ্রলোক বিঘে দশ জমি ও গোটাকতক বলদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন? কয়জন হিন্দু ছেলেদের ইস্কুলের বদলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পাঠাইতে রাজি হন? আর কয়জন পিতাই বা পুত্র কন্যাদের শিক্ষিত করিয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেন?—তবে আমরা যখন সমাজের সভ্যদের মধ্যে, ভাল হৌক, মন্দ হৌক, এত মনের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তখন তাঁদের সমাজগৃহকে কিরূপে সেই পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত ও স্বল্পায়তন রাখা যাইতে পারে? অবশ্য, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের বাঙ্গালীদের মত এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; তাছাড়া, তাঁদের সামাজিক দুচারটী রীতি—স্ত্রীদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ও বিবাহের পর বালিকা ও বালক স্ত্রীপুরুষের সহবাস নিষিদ্ধ—প্রভৃতি কয়েকটী রীতি বঙ্গসমাজের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও মার্জ্জিত ; সে জন্য বঙ্গসমাজের ন্যায় তাহাদের সমাজ এখনো ততটা বর্ত্তমান সভ্যদের অনুপযুক্ত হয় নাই ও বঙ্গযুবকদের ন্যায় অন্যান্য স্থানের হিন্দুরা সেরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেন না।

আমাদের বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কালের ন্যায় পারিবারিক অন্তর্বিবাদ, পরস্পরের হিংসা, শত্রুতা, মিথ্যাড়ম্বর, শিক্ষার ও ধর্ম্মের ভাণ ; অসার বাবুয়ানা ও ঘৃণিত বিলাস প্রভৃতি যে সব জঘন্য আচার সর্ব্বত্র, গ্রামে, নগরে, ছোট বড় সকল সংসারে দেখা যায়, এরূপ আর কোন সভ্য দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে জন্য আমরা দিন দিন বাহ্যিকরূপে মার্জ্জিত ও সভ্য হইলেও কার্য্যতঃ যে প্রত্যহ ও প্রতি কর্ম্মে অমার্জ্জিত ও বর্ব্বর লোকদের কাছে ঘেঁসিতেছি তাহা দেখিলে কোন্ স্বদেশভক্ত লোকের হৃদয় না দগ্ধ হয়? অনেকে বলিবেন, উহা আমাদের সমাজের এই দুরবস্থার একমাত্র কারণ নহে। উহা একমাত্র কারণ নহে সত্য, কিন্তু উহাই প্রথম ও প্রধান কারণ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নীতিজ্ঞান অভাবে বা পৌত্তলিক ধর্ম্মবশত আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু চারিদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা বোধ হয় না। কেন না, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের অনেক অবনতি হইলেও উহার ন্যায় নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ধর্ম্ম ও সাধারণ হিন্দুদিগের ন্যায় ধর্ম্মনীতিশীল লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। আর যদিও হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারময় ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে মহা বাধা ; তথাচ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যদি ভাল হইত তাহা হইলে ঐ পৌত্তলিক ধর্ম্মে আসক্তি ও শঠ পুরোহিতদের প্রভাব অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইত।

ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় দেশের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হইতে অধিক কুসংস্কার শূন্য নহে ; হিন্দুরা যেমন রাম কৃষ্ণ ইত্যাদিকে ঈশ্বরের অবতার ভাবিয়া নানা দেবদেবীর পূজা করেন, কাথলিকরাও সেইরূপ নানা লোককে ঈশ্বরের চর বা দূত ভাবিয়া তাঁহাদের আরাধনায় আসক্ত হন। বিশেষ হিন্দুদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ অসম্ভব ঘটনা ও কাণ্ডের বর্ণনা আছে, খৃষ্টানদের বাইবলও সেইরূপ অনেক অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক গল্পে পূর্ণ। তবে এক ধর্ম্মাবলম্বীরা মন হইতে অধিকাংশ কুসংস্কার তাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচুতে উঠিয়াছেন, আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা একেবারে নীচে পড়িবার যো হইয়াছেন—ইহার কারণ কি? আমার মতে ঐ ভিন্ন ভিন্ন জাতির উন্নত অবনত অবস্থার কারণ—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা। সেই কারণে, আমার মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দূর করিতে হইলে আগে আমাদের সমাজ গৃহের সংস্কার ও সংশোধন করা প্রধান কাজ। নতুবা যতদিন হিন্দুসমাজ পক্ষপাতী ও কেবল অর্দ্ধেক অধিবাসী লইয়া গঠিত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জাতি উপজাতিতে বিভক্ত থাকিবে ; যতদিন উহা পাপাচারী কুলাঙ্গার পুরুষদের নিঃশব্দে ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিবে; আর যতদিন একজন নরাধম লোক হাজার হাজার কুলস্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থের বলে সমাজের চূড়ামণি হইয়া বসিবেন ; আর অন্যদিকে একজন যথার্থ ধর্ম্মভীরু পিতা বিধবা যুবতী কন্যাকে পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষার অভিপ্রায়ে তাহাকে আবার বিবাহ বা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া পুনরায় সংসারে শিক্ষয়িত্রী কাজে পাঠাইলে সমাজ তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে, যতদিন কোন নূতন ভাল রীতিনীতি সমাজে প্রবেশ করান ভার হইবে—ততদিন আমাদের মধ্যে প্রকৃত একতা, প্রকৃত সভ্যতা, প্রকৃত বল ও প্রকৃত তেজ কিছুই আসিবে না।

হিন্দুসমাজের অনেক মন্দ রীতিনীতিই যে বর্ত্তমান হিন্দু যুবকের ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্র বলের পক্ষে প্রধান শত্রু স্বরূপ হইয়াছে তাহারও কোন সন্দেহ নাই। নহিলে, বিদ্যালয়গামী বালকদের মনে যে অধ্যবসায়, সাহস, ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হই, বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে তার এক বিন্দুও দেখি না কেন? ঐ বিবশতা, জড়তা ও সকল বিষয়ে অনাস্থার কারণ কি আমাদের সমাজ নহে? যতদিন বালকেরা অল্পবয়স্ক ও অবিবাহিত থাকে, যতদিন তাহারা প্রকৃতরূপে সমাজে প্রবেশ না করে, সমাজ ও সংসারের অসংখ্য ক্ষুদ্র রীতিনীতির প্রতি মন রাখিতে বাধ্য না হয় ; যতদিন তাহারা অবাধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুসী যাইতে পারে, সে জন্য তাহাদের শরীর ও মন উভয়ই সর্ব্বদা উদ্যোগী ও কর্ম্মক্ষম থাকে ; কিন্তু বালকেরা যুবক হইয়া উঠিবামাত্র তাহাদের সে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কর্ম্মে বাধা পড়ে। বালক অবস্থায় কত দেশীয় বিদেশীয় গ্রন্থ পড়িয়া তাদের মনে যে বল, উদ্যম, উৎসাহ ও জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছিল, প্রকৃত জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা ঐ সব উদ্যম ও জ্ঞান চালনার কিছুমাত্র স্থান বা উপায় দেখে না। কাজেই তাহারা ঐ সব মানুষোচিত গুণ সকলকে হিন্দু জীবনে নিতান্ত গলগ্রহ শিক্ষামাত্র ভাবিয়া উহাতে জলাঞ্জলি দেয় ও একে একে ধীর, গম্ভীর, বিবশ, অলস, ও নিরুৎসাহ হিন্দুতে পরিণত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় বালকের মন প্রশস্ত ও মার্জ্জিত হয়, আর প্রচুর বিদ্যা-

জ্ঞানের সঙ্গে তাহারা স্বভাবত আপনাদিগের অবস্থা সংশোধন করিয়া আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাহে। একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক যেমন তাঁহার চারিদিকের সকল দ্রব্য ও স্থানকে বিমল ও পরিপাটী দেখিতে ইচ্ছা করেন, একটী মার্জ্জিত মনও সেইরূপ উহার নিকটস্থ সকল লোক ও রীতিনীতিকে বিশুদ্ধ দেখিতে অভিলাষী হন। কিন্তু সমাজ ক্রমাগত তাহাদিগকে পায়ে দড়ি দিয়া টানিয়া সেই পূর্ব্বসীমায় ও অমার্জ্জিত আচার ব্যবহারে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং "ঘর শত্রুতে যেমন রাবণ নষ্ট" সেইরূপ আমাদের দেশের যুবকেরা বাহির হইতে স্কুলে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলেও আমাদের অন্তর্শত্রু সমাজ সে সমুদায় যুবকদের মন হইতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। বালকদের মন ফুটিতে না ফুটিতেই আবার বুজিয়া যায়, তাদের হৃদয় খুলিতে না খুলিতেই পুনরায় সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাদের শরীর বিকাশ পাইতে না পাইতেই শুকাইয়া পড়ে। এইরূপে আমাদের হিন্দু জীবনের প্রধান আশা ভরসা, ও জাতীয় জীবনের প্রধান উপায়—সহৃদয় বালকদের মন, সমাজ বেদীতে জন্মের মত বলি দেওয়া হয়।

আজ কাল দেশের অনেক শিক্ষিত লোক অন্তরে অনেক মন্দ রীতিনীতির বিদ্বেষী হইলেও সমাজের ভয়ে তাহা দেখাইতে পারেন না ; অনেক পিতা মেয়েদের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতে ইচ্ছা করেন, কত মাতা বিধবা বালিকা কন্যাকে পুনরায় সধবা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, কত স্বামী স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিতে চান—কিন্তু সমাজ তাঁহাদের ঐ সব সদিচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা প্রকাশ্যে ঐ সব বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইবামাত্র সমাজ তাঁহাদের ধিক্কার দিতে আরম্ভ করে! যে সকল মহৎ ইচ্ছা বা দৃষ্টান্তের জন্য সমাজের তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত—না উহাই তাঁহাদের কুৎসার কারণ হইয়া পড়ে! আর দুই একজন যদি ঐ ধিক্কার ও উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া সাহস পূর্ব্বক নিজেদের বাল্য জীবনের যত বাসনা, কল্পনা ও ভাবকে যৌবনকালে কার্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। আমাদের অচেতনপ্রায় সমাজ হঠাৎ সজীব ও সতেজ হইয়া উঠে, ও যেরূপে হউক ঐ সব 'বিপ্লবকারী' সভ্যদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আবার নিশ্চল নিদ্রায় অভিভূত হয়। সুতরাং সমাজের ঐ সকল কঠোর আচরণ দেখিয়া অনেক মহোদয় ব্যক্তিও এরূপ হতাশ হইয়া পড়েন যে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা অবশেষে অলস ও বিবশ সভ্যদের মত নিষ্কর্ম্মা থাকিতে বাধ্য হন। এই সকল কারণে ভারতবর্ষকে পুনরায় জীবন দিতে হইলে, হিন্দুজাতিকে আর্য্যজাতির উচ্চপদে বসাইতে হইলে, হিন্দুসমাজের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

কিন্তু ঐ সংস্কার সাধনের জন্য আমাদের অতি সতর্কভাবে চলা উচিত। আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য সভ্যতাভিলাষী যুবকেরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া উহা ইউরোপীয় বা ইংরেজী ধরণে নূতন করিয়া গড়িতে চান ; উহার কমে তাঁহাদের মন উঠা ভার। কিন্তু 'ফ্রাইং প্যানে' লুচি ভাজায় যেমন ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, ইউরোপীয় বা ইংরেজী আদর্শ সমুখে রাখিয়া ভারতীয় সমাজ নির্ম্মাণের চেষ্টা পাইলে সেইরূপ পরিশ্রমের অপব্যয় করা হইবে। চ্যাপ্টা ফ্রাইংপ্যানে চপ্ কট্‌লেট্ ভাজাই খাটে, লুচিভাজার জন্য কিন্তু খুপ্‌ড়োলো কড়া না হইলে চলে না। সেইরূপ যে সকল সমাজ ব্যবস্থা

ইউরোপীয়দের পক্ষে বেশ, ভারতবর্ষীয়দের জন্য তাহা নিতান্ত অনুপযোগী। বিশেষ, একটা প্রাসাদকে চুরমার করিয়া আবার ভিত্তি হইতে গাঁথা ও তাহাতে মাঝে মাঝে চুণকাম বা বালি ধরাইয়া তাহার সংস্কার করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমাদের সমাজগৃহে সেইরূপ চুণকাম বা বালি ধরাণ ও দুই একখানা আল্গা ইট খসাইয়া উহাকে আরো মজবুদ ও পরিষ্কার করাই একান্ত আবশ্যক। সে কারণে উহার জন্য বিদেশীয়দের কাছ হইতে সম্পূর্ণ নমুনা ধার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষেরই নানা প্রদেশ খুঁজিলে, বঙ্গসমাজের সংস্কার জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তাহা অনায়াসে পাওয়া যাইবে।

মানুষের ধর্ম্ম কি?

জগতের আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত সকল দেশে ও সকল প্রকার লোকের মুখে দুইটি প্রশ্ন শুনা যায়—"আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি?" "আর মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব?" মানবজাতির আদি ও পরজীবনের রহস্য মানুষের কাছে অতি আগ্রহের বিষয়। সেই জন্য ঐ দুই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ পৃথিবীতে নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার উত্তরদান মানসে হিন্দুধর্ম্ম বলে—মানবজীবন স্বর্গীয় আত্মার এক এক অংশস্বরূপ ; সৃষ্টিকর্ত্তা চিরকাল নিজ আত্মা হইতে জীবাত্মার সৃজন করেন, আর মানুষের মৃত্যুর পর তাহা পুনরায় নিজেতে মিশাইয়া লন ; ঐ স্বর্গীয় ক্ষমতাই কেবল স্থায়ী, আর সমস্তই মায়া।

বৌদ্ধেরা বলেন—ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ত্তন দ্বারা অসম্পূর্ণ জীবন সম্পূর্ণ হইলে উহার নির্ব্বাণ হয়, অর্থাৎ অনন্তে মিশিয়া যায়। সে জন্য সংসারের অশান্তি, জ্বালা যন্ত্রণা ও পাপ প্রলোভন হইতে পলাইয়া শরীর ও মনের সংযম দ্বারা জীবাত্মাকে সম্পূর্ণ করাই বৌদ্ধ জ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাচীন হিব্রুধর্ম্ম অন্যদিকে পার্থিব আমোদ আহ্লাদকেই জীবাত্মার প্রধান সুখ বলিয়া ভাবিত। নানা দাসদাসী ও সুন্দরী নারীতে বেষ্টিত থাকিয়া সুখাদ্য দ্রব্য ও বিলাস ভোগ করাই প্রাচীন য়িহুদীর পরম ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে মোসেস য়িহুদীদের মধ্যে একেশ্বরের পূজা প্রচলিত করেন, আর তাঁর সময় হইতেই য়িহুদীরা—নশ্বর জীবনের সুখ জীবাত্মার প্রধান ভোগ—এই ধারণা ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে। আত্মার ঐ পরজীবন ও অনশ্বরতায় বিশ্বাসই খৃষ্টান ধর্ম্মের মূল। যীশুখৃষ্টের কথা মতে—"মানবাত্মা জগতে পরীক্ষার নিমিত্ত কেবল অল্পদিনের জন্য এখানে আসে, মৃত্যুর পর উহা মাটীর শরীর হইতে মুক্ত হইয়া খৃষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের পাশে যায় ও অনন্ত স্বর্গ সুখ ভোগ করে।" মুসলমান ধর্ম্ম উহার বিলাসী ও রিপুপরবশ ভক্তদের রুচি বুঝিয়া নিজেদের পার্থিব ও সাংসারিক সুখের আদর্শ স্বর্গীয় জীবনের অনন্ত ভোগ ও উল্লাসকে অতিরিক্ত রঙ দিয়া আঁকিয়াছে, মৃত্যুর পর অনন্ত কাল স্বর্গীয় অপ্সরাদের মধ্যে থাকিয়া নাচগান ও ভোজন-আমোদে সুখভোগ করিতে পাওয়া যায়—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম দেশ, কাল, লোক ও অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঐ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, আর আপন আপন দেশীয় লোক ও সামাজিক প্রথানুসারে পরজীবনের স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু ঐ নানা জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্ম খুঁজিলে উহাদের মধ্যে একটী বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। কি অসভ্য বন্য জাতি, কি মার্জ্জিত সভ্য লোক, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞ সকলেই এক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। জীবনমৃত্যু যে তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে হয় এ জ্ঞান কোন না কোনরূপে যেন তাহাদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

জন্মমৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ প্রথম অনন্তকালের জ্ঞান পায়, আর সেই অনন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে এক অনন্ত অসীম ঈশ্বরের ধারণা মানব-মনে প্রথম উদয় হয়। ঐ অনন্তজ্ঞান ছোটবড় উঁচু নীচু প্রতিব্যক্তির অন্তরে বদ্ধ করিয়া দেওয়া ও পরজীবনের জন্য

মানুষকে প্রস্তুত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশকাল ভেদে ও ধর্ম্মস্থাপকদের ভিন্নপ্রকার উপদেশ অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মের নানা নাম হইয়াছে। সেইজন্যই সকল ধর্ম্ম মূলে প্রায় এক হইলেও বিভিন্ন আচারের দ্বারা লোকের কাছে শ্রদ্ধেয় বা ঘৃণিত হইয়া থাকে।

ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা কালে একটী কথা সর্ব্বদা আমাদের মনে উদয় হয়—যদি অনন্ত জ্ঞানের ধারণাই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল ও উহা শিক্ষা দেওয়াই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য তবে প্রায় সব ধর্ম্মেতেই আমরা এত প্রকার কুসংস্কার ও সাকার দেবদেবী অথবা মানুষের পূজা দেখিতে পাই কেন? ইহার উত্তরস্বরূপ এই বলা যাইতে পারে, যে, ধর্ম্মের স্রোত নদীর জলের ন্যায়; নির্ঝরনির্গত স্বচ্ছ ও বিমল সলিল যেমন উঁচু নীচু ও বালিময় ভূমির ভেদ অনুসারে ভঙ্গিমতী ও সমল হইয়া সাগরের দিকে যায়, সেইরূপ ধর্ম্মও ভক্তদের জ্ঞানের ভেদ অনুসারে কমবেশী আড়ম্বরপূর্ণ ও কুসংস্কারময় হইয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটে।

সেই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদী, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই মূলে একেশ্বরের ধারণা থাকিলেও ঐ ধারণার অসীমতা ও লোকের জ্ঞানভেদ বশত বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই ভ্রমময় বিশ্বাস ও কুসংস্কারপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড দেখা যায়। আর যে ধর্ম্ম পরমাত্মাকে যত পরিমাণে অনন্ত, অসীম ও অজ্ঞাত বলিয়া শিক্ষা দেয়, তার ভক্তেরা অজ্ঞান ও অশিক্ষিত হইলে তত পরিমাণে সাকার দেব দেবীর উপাসনায় রত হয়। আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম উহার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় বিশুদ্ধ, বিমল ও উন্নত ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত আর কোন দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু ঐ ধর্ম্মের স্থাপক মুনিঋষিরা আপনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা বলে উহার অনুসরণ করিয়া চলিলেও উহা সাধারণ লোকের ধারণার সাধ্যাতীত হইয়াছিল; তাই ঐ জ্ঞানী মুনিদের অন্তর্হিতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পবিত্র ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে; আর তাহার পরিবর্ত্তে হিন্দুদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী এক অবনত ও কুসংস্কারময় ধর্ম্মের সৃজন হইয়াছে।

অন্যদিকে খৃষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যেরা ঐ মহাত্মাদের অনন্তজ্ঞানের ধারণা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও অশিক্ষিত ও অজ্ঞান লোকের পক্ষে উহা ধারণাতীত জানিয়া তাঁহাদিগকে "ঈশ্বরের পুত্র" "ঈশ্বরের দাস" নাম দিয়াছেন, আর ঐ পরমাত্মার পুত্র ও সেবকের আরাধনা করিলেই অনন্ত ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—নিজ নিজ ভক্তদিগকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন। সে জন্য অনন্ত ব্রহ্মের উদ্দেশে, সাধারণ হিন্দুরা নানা দেব দেবীর পূজা করেন; মুসলমান ও খৃষ্টানেরা এক এক মানুষ ও তাঁদের গুটিকতক চেলার পূজায় রত। ইহা হইলেও একটী বিষয়ে হিন্দুদেব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদেব অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখা যায়; পরমেশ্বরের ছায়া যে জলে, স্থলে, বৃক্ষে, আকাশে সর্ব্বত্র ও সকল দেবতায় বিদ্যমান, এ ধারণা হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি এরূপ প্রশস্তভাবে বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। আর হিন্দুরা যেমন—আপনাদের রাম, বিষ্ণুর মন্দির; জঙ্গলা জাতিদের শীতলা, মনসার টিপি; বৌদ্ধদের শাক্যমুনির স্তূপ; মুসলমানদের ওলাবিবির ঘর; জৈনদের শৈলেশ্বর পর্ব্বত, পার্সীদের সূর্য্যমন্দির; ও খৃষ্টানদের গির্জ্জা—একরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন,

এরূপ আর কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা পারে না।

সাধারণ লোকের সাকার জ্ঞান বিষয়ে আমাদের দেশের বৌদ্ধ, নানকপন্থী ও চৈতন্য ধর্ম্ম আর কয়েকটী উদাহরণ। মহাত্মা বুদ্ধ, নানক ও চৈতন্য হিন্দুধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিয়া অনন্ত পরমাত্মার উপাসনা প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যেরা সাধারণ লোকের জ্ঞানের সীমা জানিয়া বুদ্ধদেব, নানক ও চৈতন্যকে ঈশ্বরের এক এক অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যে কুসংস্কারপূর্ণ সাকার পূজায় মনস্তাপ পাইয়া তাঁহারা নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচার করেন, তাঁহাদের ভক্তেরা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাদিগকেও দেবতার মধ্যে ধরিয়াছেন, ও ভারতের অসংখ্য দেব দেবীর সংখ্যা আরো বাড়াইয়াছেন—ইহা জানিলে তাঁহারা যে অধিকতর মর্ম্মবেদনা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মের এরূপ অপব্যবহার জগতে আজন্মকাল হইয়া আসিতেছে ; আর যত দিন না মানুষ যথার্থরূপে শিক্ষিত, উন্নত ও নৈতিক জ্ঞান পূর্ণ হইবে ততদিন ঐরূপ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও ভ্রম সংস্কার অনবরত ঘটিতে থাকিবে।

আর যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুদিগকে সাকারবাদী ও পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করেন, তাঁহাদের এই "উনবিংশ শতাব্দীর" সভ্যতার অভিমানের মধ্যেও নিরাকার-জ্ঞান সাধারণ লোকেরা বুঝে না বলিলেই হয়। গির্জ্জা তাহাদের পূজার মন্দির, আর খৃষ্টের ক্রসে বেঁধা প্রতিমূর্ত্তি তাহাদের দেবতা। এমন কি হিন্দুর কাছে নিমগাছের কাট যত না পূজ্য, খৃষ্টানের কাছে একটা পাথরের বা কাটের ক্রস তার চেয়ে অধিক ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ খৃষ্টানেরা গির্জ্জার বাহিরে বা যিশুখৃষ্ট ও তাঁর শিষ্যদিগকে ডিঙ্গাইয়া অনন্ত ব্রহ্মের জ্ঞানে নিতান্ত অপারগ। হিন্দুদের গণেশ জননীর ন্যায় খৃষ্টের জননী কুমারী মেরীও পুত্রকোলে পূজা পাইয়া থাকেন। আর ভূমিকম্প, বা ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় অশিক্ষিত খৃষ্টানেরা ভয়াকুল হইয়া যীশুখৃষ্ট ও মেরী হইতে যত ধার্ম্মিক লোকের প্রতিমূর্ত্তির কাছে হাঁটু গাড়িয়া কিরূপে তাঁহাদের দয়া প্রার্থনা করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

অধিক কি, মানুষের দুর্ব্বলতা বশতঃ অতি শিক্ষিত ও মার্জিত ধর্ম্মের মধ্যেও আড়ম্বর ও ভ্রমবিশ্বাস দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের কোম্‌তের[১২] শিষ্যগণ তাহার উদাহরণ। অনেক জ্ঞান ও চিন্তার বলে কোম্‌ত আমাদের উন্নত বৈদিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের (Religion of Humanity) প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনীতিভাব এতদূর মার্জিত ও উন্নত যে জগতের অতি অল্প লোকই—সমস্ত পৃথিবীতে দশ হাজার মাত্র—লোক উহার নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য ও মহৎ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তথাচ মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের ঐ অল্প সংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুমার্জিত ভক্তদের মধ্যেও আড়ম্বর ও ভ্রম সংস্কার দেখা যায়। আর ঐ সব দেখিয়া এরূপ শঙ্কা হয়, যে সময়ে ঐ মহৎ ধর্ম্ম যখন অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রচলিত হইবে, তখন উহা মনুষ্যত্বের পূজা ছাড়িয়া মানুষ কোম্‌তের পূজায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

আর ঐ সাকার বা কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের পূজার অভাবেই আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের ইচ্ছানুরূপ প্রচলন হইতেছে না। গত লোক-সংখ্যায় ১৫ কোটী হিন্দুর মধ্যে

এক হাজার মাত্র ব্রাহ্ম দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যখন সাধারণ ভারতবর্ষীয়দের রাশি রাশি অজ্ঞতা ও অশিক্ষার বিষয় আলোচনা করি তখন আর বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় অতি অল্প লোকই শিক্ষা পায়, আর ঐ অল্প সংখ্যকের অল্পতর ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন ; তার মধ্যে আবার অনেকে নাস্তিক বা সন্দেহবাদী ; আর কতকগুলি গোপনে ব্রাহ্ম নামে হিন্দু, সুতরাং পঁচিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কেবল এক হাজার লোক যথার্থ উন্নত ও মার্জিত ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে পারগ, ইহা অসম্ভব বোধ হয় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের হাড়ে হাড়ে সাকার মূর্ত্তি বসিয়া গিয়াছে, ঐ সকল সাকার প্রতিমা ত্যাগ করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা করা সাধারণ হিন্দুদের পক্ষে বর্ত্তমান কালে এক প্রকার সাধ্যাতীত। যতদিন না হিন্দুরা প্রকৃতরূপে শিক্ষিত ও নীতিজ্ঞানে আসক্ত হন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইবার অধিক ভরসা নাই। ঐ সাকার জ্ঞান সম্বন্ধে আমার একটী প্রকৃত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে, তাহা পাঠক পাঠিকাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ঈশ্বরের গান ও উপাসনার জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। তিনি পাড়ার মধ্যে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, সে জন্য পাড়ার কতকগুলি হিন্দু স্ত্রীলোকও ঐ উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে যান। তাঁহারা জীবনে প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্রুতিমধুর বাজনা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন। কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহাদের যেন মন তৃপ্ত হইল না। তাঁরা এ ঘর ও ঘর খুঁজিলেন, তথাপি কোন বিগ্রহ বা প্রতিমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং কোন্ ঠাকুরের উদ্দেশে যে ঐ সব গান গাওয়া হইতেছে তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বৈঠকখানার টানাপাখাটা দেখিয়া হয়ত দোল বা ঝুলনের কথা স্মরণ পূর্ব্বক গৃহকর্ত্তার পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওই কি গো ব্রেহ্মঠাকুর দুল্‌ছে?"

ইহাতেই দেখা যায় সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মনে সাকার জ্ঞান কতদূর প্রবল। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান—অজ্ঞ লোকদের মন হইতে ঐ সাকার জ্ঞান দূর কর, তারা সমস্ত সংসার একেবারে শূন্য দেখিবে, ও ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়া আরো ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া যাইবে। সুতরাং সাকার ধর্ম্ম অশিক্ষা ও অজ্ঞতার স্বাভাবিক ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ নিতান্ত অসভ্য অবস্থায় গাছপালা, পাথর, পর্ব্বত প্রভৃতি যে কোন জড় পদার্থের সংস্রবে আসে, তাহাকেই দেবতা ভাবিয়া পূজা করে ; কিন্তু জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে তাহাদের মনেও অনন্ত ধারণার সঞ্চার হয়। শিশুর কাছে যেমন পুতুলেরা জীবিত পদার্থ, অশিক্ষিত লোকের নিকটেও সেইরূপ সমস্ত স্বাভাবিক দ্রব্য বা ঘটনা চেতন বলিয়া গৃহীত হয়। সে কারণে সাকার ধর্ম্ম ভ্রম ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেও উহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই। পরমাত্মা ঘটে পটে, মাটী মন্দিরে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সে নিমিত্ত যে ব্যক্তি তাঁর অসীমতা ভাবিতে অসমর্থ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ঘট পট, প্রতিমার পূজা করেন তিনিও পরমেশ্বরের যেরূপ প্রিয়পাত্র, অনন্ত দেবের আরাধকও সেইরূপ।

অন্যদিকে, মানুষের মন নিরাকার ধারণার উপযুক্ত উন্নত ও প্রশস্ত হইবার পূর্ব্বে

তাহাদের মন হইতে সাকার বিশ্বাস দূর করিলে যে মহা অপকার হয় তাহা আমরা বর্ত্তমান নব্য বাঙ্গালীদের হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অল্প বিদ্যার দ্বারা হিন্দু যুবকদের কিছু চোক খুলিয়াছে ও সাকার দেবদেবীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত উচ্চ নৈতিক শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের মন অনন্ত জ্ঞান ধারণার উপযুক্ত প্রশস্ততা লাভ করে নাই, কাজে কাজেই তাঁহারা দিন দিন জ্ঞাননীতিহীন ও ভক্তি বিশ্বাস শূন্য এক অপরূপ জন্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়াইতেছেন ; আর অনেকে ভাণ ও কপটতা আশ্রয় করিয়া নীচতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহাদের ঐরূপ সকল বিষয়ে অনাস্থা জড়তা ও অবিশ্বাসবশতঃ প্রতি হিন্দু সংসারে যে কত শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই রূপ অল্প শিক্ষার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি একেবারে মূর্খ থাকিয়া সাকার ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিত, তা হইলেও তাহাদের চরিত্রে এত নীতিজ্ঞানের অভাব ঘটিত না।

অনন্ত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় আমরা সকল ধর্ম্মের মূলে একরূপ নীতিজ্ঞানের উপদেশ দেখিতে পাই। কেন না, চিত্তসংযম, রিপুদমন, পরোপকার প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে না ভুলিতে পারিলে অনন্তের ধ্যান করা এক প্রকার অসম্ভব। তা ছাড়া, আদর্শ ব্যবস্থার দ্বারা মানুযের চরিত্র গঠন করাও ধর্ম্মের আর এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে পশুত্বের আধিক্য দেখিয়া প্রায় সকল ধর্ম্মই ঐ নীতিজ্ঞান পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকে। কোন ধর্ম্ম যদি ভক্তদের মধ্য হইতে যত পাপী ও নীতিগুণহীন লোকদের বাদ দেয়, তাহা হইলে শতকরা ৯৯ জন উপাসকের সংখ্যা হ্রাস হয়। সুতরাং ধর্ম্মস্থাপকেরা দান, ধ্যান, ভক্তিবিশ্বাস ও অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির দ্বারা পাপীর মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছেন। সে কারণে, সকল ধর্ম্মের সাধারণ লোকদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে যেমন সাকার পূজা দেখা যায়, সেইরূপ উন্নত নীতিগুণের বদলে ভক্তিবিশ্বাসের দ্বারা মুক্তির আশা দৃষ্ট হয়। হাজার দুরাচার হিন্দু যেমন দানধ্যান, গঙ্গাস্নান, তীর্থ দর্শন প্রভৃতির বলে মোক্ষলাভের আশা করে ; শত সহস্র নরাধম খৃষ্টান মুসলমানও সেইরূপ আরাধনা, ভক্তিবিশ্বাস, ও তীর্থপর্য্যটন ইত্যাদির দ্বারা পরলোকে মুক্তিলাভের বিশ্বাস করে। এই সব উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মূল এক ও উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে পড়িয়া উহা এখন সাধারণ মানুষের সুবিধা ও খেয়ালের কাজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—এ সকল ধর্ম্মেই কুসংস্কার ও অনীতি প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের আশা আছে। বিশ্ববিধানের গতি অনুসারে মানবজাতির নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে : ঐ পরিবর্ত্তন প্রভাবে মানবজাতি যখন প্রকৃতরূপে শিক্ষিত ও উন্নত হইবে, তখন মানুষ যত কুসংস্কার ও বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া একমাত্র অনন্ত পরব্রহ্মের ধারণায় সক্ষম হইতে পারিবে।

কিন্তু এস্থলে লোকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আচ্ছা! শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাবে লোকে নাস্তিক হয় কেন?" তার উত্তর, নাস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বজগতের কেবল একদিকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আর দিনরাত শুধু জড়পদার্থ ও উহার ঘাত প্রতিঘাতের ও কার্য্যকারণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাতে তাঁহাদের আত্মা অনন্ত পরমাত্মার জ্ঞানের ধারণা পক্ষে সংকীর্ণ হইয়া যায়, নতুবা উচ্চশিক্ষা বা বিজ্ঞানে এমন কোন অস্বাভাবিক ও

অলৌকিক ঘটনার আবৃত্তি বিবর্ত্তন নাই, যাহা দ্বারা অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৃষ্টির উপর অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। বিশেষ, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একান্তচিত্তে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ অথবা স্বভাবের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন, তিনি বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টির কৌশলে এরূপ মুগ্ধ হন যে তাঁহার অন্তরে অনন্ত পরমাত্মার জ্ঞান আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়।

আবার, আদিমকালে সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইলেও এখন উহা শুধু বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। একজন হিন্দু যেমন নিজে কিছু না ভাবিয়া বা বুঝিয়া ঠাকুর দেবতা ও পূজায় বিশ্বাসের দ্বারা হিন্দু বলিয়া গণিত হন, একজন খৃষ্টান সেইরূপ খৃষ্ট ও বাইবলে বিশ্বাস, আর একজন মুসলমান মহম্মদ ও কোরাণে বিশ্বাস দেখাইলেই উহার ভক্ত বলিয়া পরিচিত হন। সে জন্য বিশ্বাসের বলে এক জাতির কাছে যাহা ধর্ম্ম, বিশ্বাসের অভাবে অন্যের কাছে তাহা অধর্ম্ম। দৃঢ় বিশ্বাসের বলে বাইবলের শত শত ভ্রম ঘটনা ও অসত্য বর্ণনাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যে খৃষ্টানের কাছে ধর্ম্ম, উহার অভাবে বেদের হাজার হাজার সত্য কথা ও উপদেশ শ্রবণ করা তার কাছে অধর্ম্ম স্বরূপ। কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের কাছে সে সবই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভাণ বা কপটতাই বাস্তবিক অধর্ম্ম। আর নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিঃস্বার্থ পরোপকারই এ সংসারে প্রকৃত ধর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আত্ম ভুলিলেও তিনি যেমন পরমহংস ; সেইরূপ কোন লোক প্রতিমা বা গাছপালার প্রতি ভক্তি করিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিলেও তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ; আবার একজন পণ্ডিত যদি বিজ্ঞানকে জগতের আদি অন্ত, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ ভাবিয়া উহার প্রতি একান্ত মনোনিবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীর উপকার সাধনে কৃতসংকল্প হন, তবে তিনিও একজন মহাত্মা তার সন্দেহ নাই। কেননা, আত্মবিস্মৃতি, স্বার্থত্যাগ ও চিত্তসংযমই এ সংসারে মানুযের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ মহা তপস্যার অনুষ্ঠান যিনি যেরূপেই করুন না কেন উহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; কারণ উহা দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন হয়। কোন লোক যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও প্রমাণে সন্দেহ করিয়াও নিজেকে সতত পবিত্র ও সৎকর্ম্মে রত রাখিতে পারেন, তবে তিনি নিজেই ঠকেন, অন্যাকে ঠকান না। বরং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখে অগ্রাহ্য করিয়া এ দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারে স্থিরভাবে ধর্ম্মপথে চলায় তাঁর মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় ও তাঁর মহৎ দৃষ্টান্তে লোকে সবল হয়। আর তিনি নিজে ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস না করিলেও তাঁর কর্ম্মে পরমাত্মার দয়া প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে, একজন নাস্তিক যদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ করে, বা একজন ব্রাহ্ম সাকার দেবদেবীর প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, অথবা একজন সন্দেহপূর্ণ লোক নিঃস্বার্থের ছলনা করিয়া অন্যের কাছে ধর্ম্মের বড়াই করে ও কেহ যদি প্রশংসা লাভের আশায় কপটতা দ্বারা নিজ দোষ ঢাকিবার প্রয়াস পায়—তাহা হইলে তাহারা সকলেই একপ্রকার পাপী, অধার্ম্মিক, শঠ ও প্রতারক। তাহাদের দ্বারা সংসারে অপকার ভিন্ন কোন মঙ্গল হইবার আশা নাই।

জগতের কাজের নিমিত্ত জীবাত্মার সৃষ্টি, সে কারণ পরমাত্মার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া

প্রাণপণে যে যার কর্ত্তব্য করাই মানুষের ধর্ম্ম। প্রাণপণ যত্নে সন্তান পালন করা মাতার ধর্ম্ম; পরিবার পোষণ করা পিতার ধর্ম্ম। আর সাধ্যমত সমস্ত জগতের জন্য কিছু না কিছু কাজ করা ও আত্ম ভুলিয়া পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করাই মানব জাতির ধর্ম্ম। এ পৃথিবীতে এই নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের অর্থ যিনি প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই আজকাল স্বীকার করেন যে ভারত মহিলারা জগতের সমস্ত নারী-যোগ্য কাজ হইতে একেবারে বঞ্চিত। তাঁহাদের অকর্ম্মণ্য জীবন ভাবিয়া বঙ্গপুরুষকে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু এখনকার মাতা ও কন্যারা নিজেই আমাদের দুঃখময় অবস্থার জন্য যেরূপ কাতর ও হতাশ ; আর ঐরূপ অলসভাবে জীবন যাপন করিতেও যেমন অনিচ্ছুক, তেমন আর কেহ নহে। সকলেই কাজ করিতে উদ্যত, শিখিতে মনোযোগী, অথচ কি কাজ করিবেন তাহা জানেন না। এ রকম সময়ে তাঁহাদিগকে কোন উপযুক্ত কাজের পথ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ উহা ধরিয়া আপনারাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলিতে পারিবেন, এইরূপ ভরসা হয়।

আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, কত শত প্রফুল্ল কর্ম্মিষ্ঠ বালিকা কাজের অভাবে বিমর্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নাই। মেয়েদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া দেন না, আর বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা নিজেও কোন কাজ মনস্থ করিয়া আরম্ভ করিতে অপারগ। স্কুলে যত দিন থাকে, বালিকারা লেখাপড়ার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করে ও খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যালয় ছাড়িবার পর তাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না। তারা সমস্ত সকাল বেলা বিনাকাজে গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; স্নানাহারের পর হয়ত কোন জঘন্য নবেল পড়ায় ও নিদ্রাতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তাস খেলা সচরাচর বৈকালের সঙ্গী। এই রকমে কত দিন, কত মাস, ও কত বৎসর বৃথায় কাটিয়া যায়, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

অবশ্য এরূপে জীবন যাপন করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে উন্নত থাকিবে, আমরা কখনই এরূপ আশা করিতে পারি না। কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা ও আত্মপ্রিয় হইয়া উঠে। পরের নিন্দায় তাহাদের বড় আনন্দ হয়, হিংসায় শরীর কর কর করে, আর আপন সুখ ও বেশভূযাতেই সমস্ত মন প্রাণ পড়িয়া থাকে। যত বুদ্ধিমান স্ত্রীলোক ও পুরুষ এ প্রকার নারীদিগকে ঘৃণা করে, আর সহৃদয় লোকমাত্রেই তাহাদের জন্য ব্যথিত হয়। সকলে বলে, তাহারা কিছুই করে না ; বরং দিনরাত জগতের মহা অনিষ্টসাধনই করিতেছে। পূজিত নারী নামে তাহারা কলঙ্ক দেয় ; আর যে স্ত্রীজাতি সংসারে মানুষকে মার্জ্জিত, পবিত্র ও মহৎ করিবার জন্য সৃষ্ট, সেই রমণীকুল পুরুষের দ্বারা ঘৃণিত ও পদদলিত হয়!

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে লোকে 'পরশ পাথর' লাভের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিত। কিন্তু আমরা যখন চতুর্দ্দিকসহ কাজহীন লক্ষ্যহীন ভারত নারীদের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন দেখি, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ সহকারে খাটিয়া এমন কবচ অন্বেষণে ব্যাকুল হই, যাহার স্পর্শে সোণার অপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য আমাদের লাভ হইবে—উন্নত নারী-চরিত্র প্রতি গৃহের সেই অমূল্য রত্ন—আর ব্যগ্রভাবে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম সেই পরেশ পাথর। উহার দ্বারাই নির্ব্বোধ চঞ্চলা বালিকাদিগকে আমরা বুদ্ধিমতী ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। উহার বলেই আমরা মুখরাকে সুশীল ও অলস নারীকে কার্য্যপ্রিয় করিতে সক্ষম হই।

আমার এরূপ বোধ হয় না যে, কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়াই আলস্যে জীবন কাটান, তবে বাল্যকালে ঐ অভ্যাসটী একবার মৰ্জ্জাগত হইয়া গেলে বড় বয়সে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের অভাবেই একটু একটু করিয়া লোকে প্রথম অলস ও অবশেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমরা যদি প্রতি অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকের ইতিহাস খুঁজি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইব যে প্রথমে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না, পরে সে ঐ নিশ্চল জীবনে ক্লান্ত হইয়া নিজের আপাতত আমোদের জন্য দুএকটী বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, পরিশেষে এইরূপ আত্মসুখ তাহাকে স্বার্থপর, আত্মপ্রিয়, অলস ও ভাল কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপারগ করিয়া তুলে।

সে জন্য সকলের আগে আমরা কি কাজ করিতে ইচ্ছা করি, ও কি বিষয়ের জন্য আমাদের বঙ্গমহিলা সমাজ[১৩] সংস্থাপিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানা উচিত। নতুবা ঐ সকল অলস নারীদের ন্যায় আমাদের সমাজও অকর্ম্মণ্য হইয়া বিপদগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা।

কয়েক বৎসর ধরিয়া আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদের প্রতি নানা দোষারোপ ও গালাগালি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। প্রাচীনারা বঙ্গবালাকে "কলিকালের মেয়ে" বলিয়া উড়াইয়া দেন, আর নব্য পুরুষেরা তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া ঘৃণা করেন! বাঙ্গালীর মেয়েকে উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিবার জন্য কত বই বাহির হইয়াছে! যে সকল যুবকেরা নিজে উপদেশ গ্রহণ করিলে ভারতের মহা মঙ্গল হইত, তাঁহারা পর্য্যন্ত হিন্দু নারীকে লেক্‌চার দিতে বসিয়াছেন! ছেলেবেলায় একটা বড় মজার গল্প শুনিয়াছিলাম, কোন একজন ছেলে নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা! বাবা কোথা?' আর মার কাছে যখন শুনিল যে তার পিতা গরুর পাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, সে অমনি বাপের খাবার লইয়া মাঠে ছুটিল! স্ত্রীলোকদের প্রতি বঙ্গ যুবকদের উপদেশ দেওয়া দেখে কতকটা ঐরূপই মনে হয়। কোন বালকের ধর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতেই সে ভাবে,—এমন অকর্ম্মণ্য, অশিক্ষিতা বাঙ্গালীস্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার সময় তার যথেষ্ট হইয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ হাতে লইয়া—হিন্দু মহিলার এটা করা উচিত, এটা করা অনুচিত—বলিয়া চীৎকার করে। কিন্তু ওরকম করাতে তাহাদেরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না—কেন না, বর্ত্তমান সাধারণ বঙ্গ-বালাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়ই বটে! বিশেষ, তাহাদের উদ্দেশ্য উত্তম, তবে নিজে জ্ঞানী না হইয়া অন্যকে জ্ঞানের কথা বলা যে অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক। আর আজকালকার বঙ্গ-পুরুষেরা বঙ্গ-নারীকে যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখেন সৌভাগ্যক্রমে তাহারা এখনও তেমন হীনাবস্থায় আসিয়া পড়ে নাই। তাঁহাদের মতে বাঙ্গালীর মেয়েরা একান্ত অশিক্ষিত, স্বার্থপর, কখন পরের কথা ভাবে না, সমস্ত দিন ঘুরিয়া বা পরনিন্দায় দিন কাটায়, হিংসাদ্বেষে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ, খল কপটের একশেষ ইত্যাদি। এক কথায়, তাহারা অতি অচতুর বুদ্ধিহীন, তাহাদের মধ্যে উন্নত নারী চরিত্রের একটিও গুণ নাই, আবার আজকাল গৃহকর্ম্মেও অপটু। সুতরাং তাহাদের মত অপদার্থ স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আর মিলা ভার! বঙ্গ-মহিলার এ রকম চিত্র ভয়ঙ্করই বটে! আর সত্যসত্যই যদি আমরা বঙ্গগৃহে এরূপ স্ত্রী দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঘৃণা করার পরিবর্ত্তে তাহাদের জন্য

আমাদের বেদনা পাওয়ারই সম্ভব। কিন্তু সুখের বিষয়, ওরূপ পিশাচী নারী যদি কদাচ কখন বঙ্গ-সংসারে আবির্ভূত হয়, সে অতি বিরল, হাজারে একজনও নয়। আমার সমস্ত জীবনে আমি একান্ত পাপীয়সী স্ত্রী দেখিয়াছি বলিয়া কই তো মনে পড়ে না।

অবশ্য, বঙ্গ-সংসারে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা উপরোক্ত ঐ সকল দোষে কতক পরিমাণে আচ্ছন্ন, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু উহার জন্য তাহারা মানুষের অধিকার হইতে একেবারে বহিষ্কৃত ও কথায় কথায় ঘৃণিত ও পদদলিত হইবার উপযুক্ত নহে। বিশেষ, যে পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহারাই কি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ? উপযুক্ত সুবিধা ও শিক্ষা পাইলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ যে বঙ্গ-নারীর মধ্যে হইতে তিরোহিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু স্ত্রীকে উন্নত নারীপদে বসাইতে হইলে ও কলিকালের মেয়েকে পূর্ব্বকালের মহিলাদের ন্যায় পূজিত করিতে হইলে মৌখিক উপদেশের পরিবর্ত্তে তাহাদের কাজের সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে প্রকৃত উন্নতির পথ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

আজকাল প্রায় সকলেই প্রাচীনা ও নবীনা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তুলনা করিয়া থাকেন ও নব্যা নারীদিগকে অধিকতর হীন ভাবেন ; কিন্তু সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে আমার মতে আধুনিক মহিলারা দুই একটি বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা সকল বিষয়েই নীচ নহেন, বরং দুই একটি বিষয়ে তাঁহারা প্রাচীনাদের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন। এখনকার বালিকারা শিক্ষা ও উন্নতি বলে আপনাদিগকে সংসারের আবশ্যকীয় সভ্য করিতে যেমন ব্যগ্র তেমন আর কখনো দেখা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত আজকাল বালিকারা পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী বিদ্যাশিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদ পায়, আর তাহারা সাধ্যমত ঐ জ্ঞানকে নিজেদের ও সংসারের উপকারের জন্য খাটাইবার চেষ্টা করে। আমাদের মা দিদিমারা সুচারুরূপে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন, সন্দেহ নাই। অন্যদিকে, তাঁহাদের মন ও ভাব সকল যে অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক অপ্রশস্ত ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তথাচ, এখন সেই পূজনীয়া প্রাচীনা মা দিদিমাদের কাজকর্ম্মের বিচার করা আমাদের মুখে ভাল শুনায় না। কিন্তু ইহা সত্য, যে এখন যদি আমরা তাঁহাদের ন্যায় পৃথিবীকে 'তিন কোণা' ভাবি তাহা হইলে নিশ্চয় স্বামীপুত্রদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব। আর আমাদের দিদিমাদের মত আমাদের কন্যারাও যে একখানা মোটা কাঁথা সেলাই করিতে তিন মাস কাটাইবে, ইহা কোন মায়েরই ইচ্ছামত হইবে না। কেননা সূচিকর্ম্ম ও অন্যান্য শিল্প স্ত্রীজাতির কর্ম্ম বিশেষ, উহা তাঁহাদের জীবনের প্রধান কাজ নহে।

যাহা হউক, এখন বাজে কথা বাদ দিয়া আসল কাজের কথা পাড়িব। স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই একটি বিষয়ে সকলেরই একমত দেখা যায়। পরমেশ্বর জগতের কাজের জন্যই জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন ; আমাদের প্রত্যেকের জীবনেরই এক এক নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, সেই মনের মত কাজটি খুঁজিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। আর যতক্ষণ সেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজটি আমোদের অন্তর্গত না হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই উচিত নহে।

কোন একজন য়ুরোপীয় শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কালে বলেন, প্রফুল্ল থাকা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ ; পরিচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয় ; আর রন্ধনকার্য্যে নিপুণ হওয়া তৃতীয়।

বালিকারা উহার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিলেন, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া আমোদ আহ্লাদ করা প্রতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য স্বরূপ ; ফুটন্ত ফুলের ন্যায় হাসিয়া সংসারকে সুখ শান্তিময় রাখা নারীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের অর্থ সাবান মাখিয়া কেবল বেশবিন্যাস করা নহে ; শরীর ও বস্ত্র হইতে সমস্ত গৃহ সংসার একরূপ পরিষ্কার ধৌত ও সামান্য দ্রব্যে সুন্দর করিয়া সাজানই উহার উদ্দেশ্য। তৃতীয় গুণ, রন্ধন, মানে কেবল পলোয়া কালিয়া রান্না নয়। উহা দ্বারা প্রতি স্ত্রীর যত প্রকার তরিতরকারী, শাকসবজী, ফলফুলের বিষয় জানা উচিত, আর তা ছাড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সুন্দর ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা ও রাঁধা বাড়া দেখা শুনা গৃহিণীর একটি প্রধান কাজ।

প্রাচীন শিক্ষকের ঐ উপদেশটি য়ুরোপীয় মহিলাদের ন্যায় ভারতীয় নারীদের পক্ষেও অতি উপকারী। সকল স্থানেই স্ত্রীজাতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ ; প্রথম কর্ত্তব্য—গৃহকর্ম্ম। সে জন্য যাহাতে নিজ সংসারকে সুখময় করিতে পারা যায় ও আপনাকে গৃহকর্ম্মে পারদর্শী করা যায়, তাহার উপায় জানা প্রতি স্ত্রীর একান্ত আবশ্যক। বিশেষ ইহা সকল মহিলারই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্ত্রীলোকের নির্দ্দিষ্ট কাজে অবহেলা করিয়া অন্য কোন কাজে পারদর্শিনী হইলে উহাতে নারীদের চতুরতার প্রমাণ দেয় বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত উন্নতি হয় না। স্ত্রীজাতির স্বভাবের দ্বারা নির্ণীত কর্ত্তব্যে নিপুণ হইয়া উহার উপরে যদি আমরা আরো কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করি, তবেই উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে। আমাদের মা দিদিমাদের লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামের সঙ্গে সুশিক্ষিতা মার্জ্জিতা পদের যোগ করাই প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য—ইহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই।

আমার মতে নিজ গৃহকে কিরূপে উজ্জ্বল প্রফুল্ল ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হয় তাহা প্রতি স্ত্রী ও গৃহিণীর জানা উচিত। আর নিজ সংসারকে সর্ব্বদা শান্তিময় সুখপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিলে, উহাতেই নারীজাতির জ্ঞানবুদ্ধি ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কোন স্ত্রীলোক ঘরের কাজকে হীনকর্ম্মভাবে দেখিলে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখ পাই। আমরা আজকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছি, আর আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি তাহা অধিকতর উন্নত ও সুখপ্রদ হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু ঐ নূতন পথ যদি বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিতে শিখায়, তাহা হইলে উহা উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে অধোদিকেই লইয়া যাইবে।

আবার নারীজাতির শিক্ষার পথে গৃহকর্ম্মকে (শারীরিক শুদ্ধতা ও সুপরিচ্ছদ) উহার উপযুক্ত স্থানে দেখিবার ইচ্ছা করিলেও, কোন স্ত্রীলোকের সমস্ত সময় ও মন শুধু নিজ পরিবারের উপরই সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকে, এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া বা বুঝানও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা সকলেই সমস্ত মানব পরিবারের সভ্যস্বরূপ, যে জন্য আমাদের গৃহস্থিত পুত্রকন্যা ভাইবোনদের ন্যায় পরিবারের বহিঃস্থিত ভ্রাতা ভগিনীদের কাছেও আমরা কতক পরিমাণে ঋণী। তাঁহাদের ঐ চিরঋণ পরিশোধের জন্য দাতব্যই একমাত্র উপায়। বিশেষ প্রতিগৃহে ও সকলেরই চারদিকে ঐ দানশক্তি চালনার জন্য অনেক নিরুপায় গরীবলোক অবস্থান করে। সুতরাং আমার মতে পরিবার ও প্রতিবাসীরাই নারীদের দাতব্যের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অনেকের মতে টাকা পয়সা বা অন্নবস্ত্র দান ব্যতীত আর কিছুই দাতব্য কাজ নহে। কিন্তু প্রকৃত দাতব্যের অর্থ উহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত। উহার মানে—আমাদের যাহা আছে অন্যকে তাহাই দান করা ; কেবল টাকা, কাপড় ও খাদ্য নহে—সহৃদয়তা, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও দয়া। প্রকৃত দান কখন নিজের গৌরব করে না, চাটুবাদে ফুলিয়া উঠে না, কখন সগর্ব্বে চলে না, প্রতিদান চাহে না, সহজে রাগ করে না, আর কখনও তাহাকে মন্দ ভাবে না। এরূপ দাতব্যই দান বলিয়া ধর্ত্তব্য, আর ঐরূপ নিঃস্বার্থ দানই নারীজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত!

কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নিজ সংসার, পরিবার বা প্রতিবাসীদের মধ্যেই সময় কাটাইবার উপযোগী যথেষ্ট কাজ পান ; তাঁহারা সচরাচর আপনাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের প্রভূত উপকার করেন এবং আপনারাও সর্ব্বদা সুখী ও প্রফুল্ল থাকেন! কখন কখন এজন্য তাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও কাতর হন না। কিন্তু মানুষের জীবন লৌহের ন্যায়, উহা মরিচা পড়িয়া ক্ষয় হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় হওয়াই ভাল। এতদ্ব্যতীত চালনা দ্বারা ঐ সকল পরিশ্রমী নারীদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আর সময়ে সময়ে বিপদ বিপত্তির কালে তাঁহারা অনেক মহৎ কাজ করিতে সক্ষম হন।

আবার প্রতি গৃহে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে বা বুঝিতে অপারগ। তাঁহারা কোন না কোন কাজে মন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি প্রকারে উহা আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানেন না। কাজের মহত্ত্বের কথা তাঁহারা পুস্তকে পড়েন বা পিতা ভ্রাতাদির মুখে শুনেন, আর আপনারাও জগতের কিছু না কিছু হিতসাধন করিতে ব্যগ্র ; কিন্তু কি কাজ করিবেন ও কি উপায়ে?

সাধারণ নারীদের এই সমস্যা পূরণের আশায় আমি 'স্ত্রীলোকের কাজ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করি।[১৪] আর উহাতেই আমি নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি পরিষ্কার পথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সমুদায়ের বিবৃত্তি করা অসম্ভব। তবে তাহারই গুটিকয়েক বিষয় লইয়া সংক্ষেপে আপনাদিগকে জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া যদি আপনাদের মধ্যে একজনেরও প্রকৃত কাজে আসক্তি জন্মায় তাহা হইলে আশাতীত আনন্দলাভ করিব।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে ধাত্রী-বিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজের পথ ভদ্র নারীদের জন্য খোলা হইয়াছে। গরীব ও গৃহস্থ স্ত্রীদের ভদ্র ও স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে সকল বিষয়ে এ প্রবন্ধে লেখার কোন আবশ্যক নাই, কেননা, গৃহস্থ ও দরিদ্র বালারা কখন কাজের অভাবে আলস্যে জীবন যাপন করে না ; তাহারা নিজে না রাঁধিলে কেহ খাইতে পাইবে না, না খাটিলে ছেলে মেয়েদের ভাতকাপড় জুটিবে না—এই ভাবনা তাহাদিগকে যে কোন কার্য্যে হউক সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখে।

কিন্তু যে বালিকা বা স্ত্রীলোকেরা সংসারের কোন কাজ করিতে বাধ্য নহেন, যাহাদের গৃহে পরিশ্রম করা অথবা বসিয়া থাকা দুইই সমান, যাহাদের জীবনে কোন লক্ষ্য নাই, কাজের কোন প্রয়োজন নাই,—এইরূপ ধনবান বা মধ্যবর্ত্তী মহিলাদের মধ্যেই আলস্য ও অপদার্থতার অধিকতর আকাঙ্ক্ষা। তাহাদের যত গৃহকর্ম্ম, এমন কি সন্তান পালন পর্য্যন্ত দাসদাসীদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় তাহারা কখন কখন ঐ চিরবিশ্রামে

বিরক্ত হইয়া নিজ মনে—সংসারে আমি কি কাজ করিব?—এ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় না। কাজে কাজেই তাহারা আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ স্থলে তাহারা যদি কাহারও দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্মে দীক্ষিত ও পথদর্শিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে যে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজের দ্বারা তাহাদের চিরবিমর্ষ জীবন আনন্দময় হইবে, অনাস্থিত মন স্ফূর্ত্তিময় হইবে, আর হিন্দু সংসার অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুখপূর্ণ হইবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে, ও মনোবৃত্তি সমূহ পুষ্টি পাইবে। তখন তাহারা নিজেকেও মান্য করিতে শিখিতে আর অপরের দ্বারায়ও সম্মানিত হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোকের কোমল রূপ কর্কশ হইয়া যায়। এ প্রকার ভাবা অতি অবিবেকের কাজ। কেননা, দরিদ্র পল্লী ও কৃষকবালাদের স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের লাবণ্য কে না জানে? কোন নারীর অবয়বে যদি তাঁহার সদ্ভাবের ও সৎকার্য্যের প্রভা প্রতিভাত হয়, তবে সে সুন্দর মুখ যে আরও কত অধিক উজ্জ্বল হয় তাহা কে না দেখিয়াছেন? একজন অলস অকর্ম্মণ্য নারীর বিম্লান মুখের সঙ্গে একটি কর্ম্মক্ষম সতেজ বদন মিলাইয়া দেখিলে কোন্‌টী বেশী মনোহর দেখায়? আসিয়া ও য়ুরোপের ধনী মহিলাদের মধ্যে কি আমরা এই প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না? আমাদের আসিয়িক ভগিনীরা য়ুরোপীয় ভগিনীদের তুলনায় রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে কিছুমাত্র নীচ নহেন, কিন্তু য়ুরোপীয় নারীদের কর্ম্মিষ্ঠ মুখের জ্যোতির কাছে আসিয়িক মহিলাদের প্রভা গ্যাসের আলোকের পার্শ্বে বাতির আলোকের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, এক ভারতেই রাজপুত, মার্হাট্টী বা খোট্টা নারীদের সতেজ দীপ্তির নিকটে বঙ্গবালাদের সৌন্দর্য্যের শীতল কিরণ তত ভাল খেলে না। অন্যদিকে আবার কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন লোকের চোক তৎপর ও পরিশ্রমী লোকের চোকের তুলনায় প্রাণশূন্য দেখায়। দুজনেরই রূপ, লাবণ্য সবই আছে, কিন্তু কাজের অভাবে একজনের চোক এত নিষ্প্রভ যে উহা শূন্যতায় অলস জীবন ও বিমর্ষ আত্মার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে ; আর অন্যজনের নয়নের জেল্লায় তাহাকে কতই মনোহারী করিয়া তুলে ; উহাতে তাহার জ্ঞানবুদ্ধির কতই না পরিচয় পাওয়া যায়! ঐ চোকের দ্বারা তোমার অন্তস্থ আত্মা তাহার আত্মার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। প্রকৃত উপকারী কাজ স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য কমানের পরিবর্ত্তে উহা আরও দশগুণ বৃদ্ধি করে। আবার, ভাল কাজ যেমন মানুষের লাবণ্য বাড়ায়, মন্দ কাজ তেমনি লোকের চেহারা খারাপ করিয়া দেয়। নিঃস্বার্থ পরোপকারই উহার সাধককে ঐরূপ সুন্দর করিতে পারে। যে কাজ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অপরের জন্য দেওয়া হয়, ও যাহা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আনন্দে গৃহীত হয়—সেই কাজই জীবনের প্রকৃত সাধনা! সমস্ত জগতে উহার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যাহারা সহৃদয় ও মুক্ত-হস্তে দান করে, তাহারা তেমনি অসংখ্য প্রকারে পুরস্কার পায়। যে অন্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহার নিমিত্তও অপরে প্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্যত হয়। নিঃসন্দেহ অনেক মহিলা নিজের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার জন্য কত পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে বেশ পরিপাটী হয়, আর লোকেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করে। কিন্তু নিজ সজ্জায় দুই ঘণ্টা না কাটাইয়া উহার অর্দ্ধেক সময়ও যদি তাঁহারা কোন মাতৃহীনা কন্যার গা ধোয়াইয়া দেন অথবা কোন দরিদ্র বালকের কাপড়

সেলাই করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের বাহ্যিক পরিপাটীর সঙ্গে আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। অনেক স্ত্রীলোকে জীবিকার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, অবশ্য ওরূপ মেহনতে তাহাদের যে কোন সদ্‌গুণ দেখা যায় না, তাহা নহে। ওরূপ নারীদিগকে দেখিলে সকলেই সুখ্যাতি করে, কিন্তু উহা তাহাদের মহচ্চরিত্রের কোন প্রমাণ দেয় না। কেবল, আমরা যখন, 'এই কাজটা করিলে ওর ভাল হয়' বা 'এই বস্ত্রখানা পাইলে অন্যের উপকারে আসে'—এরূপ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কোন সৎকাজ করিতে অগ্রসর হই, সেই কাজ আমাদিগকে পৃথিবী হইতে তুলিয়া এক পদ স্বর্গের সিঁড়িতে অগ্রসর করে।

জীবনকে মহৎ করা যদি মানুষের প্রধান কাজ হইল, তবে অন্যের জন্য খাটিয়া ও অপরকে সুখী করিবার নিমিত্ত কিছু সময় কাটান প্রতি ব্যক্তিরই কর্ত্তব্যস্বরূপ। কিন্তু অন্য লোকের প্রতি আস্থা না থাকিলে ঐ আনন্দের উপায় কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই করা যায়। আমরা যদি আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ লোকদিগকে সুখী করিবার আশায় প্রত্যহ আধ ঘণ্টাও কোন না কোন কাজ করি, তাহা হইলে আস্থা আপনা হতেই আসিবে! আমরা সর্ব্বদা নিজের জন্য খাটিলে উহা যেমন স্বার্থপরতার বৃদ্ধি করে, অপরের নিমিত্ত একবার কাজ করিতে আরম্ভ করিলে উহা তেমনি আমাদিগকে পরপ্রেম শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রতি যাহারা দয়ালু ও স্নেহময় তাঁহাদের অপেক্ষা যাহাদের উপর আমরা দয়া বর্ষণ করি, তাহাদের প্রতি আমাদের স্নেহ প্রবল হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা—এ বাক্য আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হলেও মানব জীবনে উহা অনবরত ঘটিতেছে। পরের জন্য পরিশ্রম করা আমাদের জীবনে মহা কবচের মত, উহা আমাদিগকে আলস্য ও স্বার্থপরতার গ্রাস হইতে রক্ষা করে।

অন্যদিকে ইহাও কেহ মনে করিবেন না যে প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম বা জীবিকা উপার্জ্জন নিঃস্বার্থ পরোপকারের সঙ্গে একত্র চালনা অসম্ভব। বরং উহার বদলে সর্ব্বত্র এইরূপ দেখা যায় যে যাহারা পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাহারা কখন কাজে ভয় পায় না। আমি সহরে ও মফঃস্বলে এমন অনেক দরিদ্র পরিবার দেখিয়াছি, যাহারা নিজে সংসারের জন্য সমস্ত দিন ধান ভাঙ্গা, ময়দা পেষা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমে রত থাকে, তথাচ পাড়াপড়সীর কোন বিপদ বা অসুখ হইলে, তাহারাই সকলের অগ্রে সাহায্য করিতে দৌড়ায়! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত গরীবের স্ত্রী নিজের দুই তিনটী শিশু সন্তান লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তবুও সংসার-প্রপীড়িত প্রতিবাসিনীর ছেলেকে নাওয়াবার ও খাওয়াবার অবসর পায়।

এইরূপে সকলেরই সাধ্যমত ঘরে বাহিরে কাজ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কে কোন্ কাজটিতে নিপুণ বা কোন্‌টি সাধিতে ইচ্ছুক, তাহা নিজ নিজ রুচি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবে। যে কেহ শিল্পকর্ম্মে পটু, শিল্পই তাঁহার প্রধান কাজ হওয়া উচিত। রন্ধনে যাঁহার আনন্দ, পাককার্য্যের ভার লওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল। পর-সেবায় যিনি মনোযোগী, পীড়িতের তত্ত্বাবধারণ করাই তাঁহার উপযুক্ত কাজ। কিন্তু যদি কখন এরূপ ঘটে যে কোন বালিকা কিছুতেই আগ্রহ দেখায় না—শিল্প, রন্ধন, গৃহকর্ম্ম বা ঔষধ খাওয়ান—এ সমস্ত কার্য্যই তাহার কাছে এক প্রকার ভার স্বরূপ, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে নিজের মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পরের জন্য কোন না কোন সাধনে নিযুক্ত হওয়া উচিত। এ সংসারে কোন নারী

যদি যথার্থ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তবে কেবল আপন উদর পূরণ ও শরীর আচ্ছাদন করিলেই চলিবে না। ওরূপে স্বার্থপর হইয়া থাকা ইতর প্রাণীদেরই শোভা পায়, কিন্তু সর্ব্বত্র পূজিত নারীজাতির জীবনে উহা বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। মানব চরিত্রকে নীচ ও মানুষের অবস্থাকে শোচনীয় করিবার নিমিত্ত আলস্যের মত অপকারী শত্রু আর নাই। উহা লৌহে মরিচার ন্যায়, ফলে পোকার ন্যায়, দেহে জরার ন্যায় মানুষকে একটু একটু করিয়া খাইয়া ফেলে। কিছুদিন হইল, একজন বিধবার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ দয়ালু মুখ দেখিয়া আমি তাঁহার সহিত আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, [তিনি] অতি সুশিক্ষিতা একজন ধনী হিন্দু মহিলা, আর সর্ব্বদা দাতব্যকার্য্যে এত ব্যস্ত যে, প্রত্যহ তাঁহার এক দণ্ডও বিশ্রামের সময় থাকে না। আমি তাঁহার পরোপকারের জন্য ব্যগ্রতা ও নিষ্কাম জীবনে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কিরূপে ঐ সকল কাজের পথ আবিষ্কার করেন? কেহ কি আপনাকে এই সমস্ত কাজ দেখাইয়া দিয়াছিল?

তিনি উত্তর করিলেন—না, না, তা নয়, স্বামী-শোকে পাগল হইয়া প্রায় দুই মাস যাবৎ আমি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু ঐ বিহ্বল জীবন আমার শোকের তীক্ষ্ণতা কমানোর পরিবর্ত্তে উহা আমাকে এতদূর যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমি হতাশ হইয়া একদিন বিছানা হইতে উঠিলাম ও আপনাকে ভুলিবার জন্য এই পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলাম। সেইদিন হইতে আমার জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হইয়াছে, আমার জীবন এখন আর সে জ্বলন্ত নিরাশায় পুড়িয়া মরে না, আমি উহা গরীব দুঃখীদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা জীবনের ক্লেশ ও ব্যস্ত জীবনের আনন্দ আমি এখন সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি।

আমার বোধ হয় ঐ উন্নত চরিত্র বিধবার মত হাজার হাজার শোকাতুরা স্ত্রীলোক আমাদের হিন্দু সংসারে আছেন, যাঁহারা আপনাকে ভুলিবার জন্য পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষিত না হওয়ায় নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতে অপারগ। সে কারণে আমি নিজের সাধ্যমত কার্য্যক্ষেত্রে মহিলাদের পথদর্শক হইতে মনস্থ করিয়াছি। সধবা, বিধবা, কে কোথায় বঙ্গমহিলা আছেন, আসুন, আমি আপনাদের হাত ধরিয়া খাটিতে চাই, আপনাদের স্নেহময় উৎসাহ চাই, জগতে আপনাদিগকে আবার পূজিত দেখিতে বাসনা করি। আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় হতাশ হইবার কোন আবশ্যক নাই। এ বিশাল সংসার-ক্ষেত্রে ঈশ্বর কীট পতঙ্গদেরও জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং আপনারা হাজার অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকুন, মানুষের যত ন্যায্য স্বত্ব হইতে বহিষ্কৃত হউন, জগদীশ্বর নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও আমাদের কাজ অসীম করিয়াছেন। এখন আসুন যে যার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বাছিয়া সকলে এক মনে, একসঙ্গে খাটিয়া চলি। দেখিব তখন কোন পুরুষ আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বঙ্গবালা বলিয়া ঘৃণা করে। দেখিব কোন হিন্দু আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে সাহসী হয়! আর দেখিব কোন্ আর্য্যসন্তান তখন মহিলাদিগকে বর্ত্তমান হীন অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে:

শিক্ষিতা নারী

স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিষয় লিখিতে গেলে, আমেরিকার কথাই প্রথম আমাদের মনে আসে। আমেরিক মহিলাদের এত অল্প দিনের মধ্যে যেরূপ দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষার উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, নারীজাতির ক্ষমতা ও বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বড় বড় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সভ্যজাতিদের মধ্যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ৫ আউন্স কম, আর এই সূত্র ধরিয়া অনেকে ক্রমাগত তর্ক করেন যে, স্ত্রীলোক যতই কেন শিক্ষিতা হউক না, উহারা কখনও বিদ্যায় ও জ্ঞানে পুরুষের সমান হইতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা ভাবেন না যে, স্ত্রীলোকের ঐ অল্প মস্তিষ্কের কারণ—আদিম কাল হইতে প্রায় বরাবরই উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। মানবজাতির সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোকেরা যদি সমানভাবে পুরুষের মত শিক্ষা পাইয়া আসিত, তাহা হইলে, উহাদের মস্তিষ্কও যে পুরুষজাতির সমান বৃদ্ধি পাইত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

আর, এখন হইতে যদি পুরুষেরা সমস্ত জ্ঞানচর্চ্চার ভার স্ত্রীজাতির উপর অর্পণ করিয়া, নিজেরা কেবল সংসারের কাজে দিন কাটান, তাহা হইলে, ইহাও সম্ভব যে, তিন চারি হাজার বৎসব পরে, স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তিও, পুরুষজাতির অপেক্ষা ৫ আউন্স বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু ইহা এখন কার্য্যে পরিণত করা একরূপ অসাধ্য। সুতরাং মস্তিষ্ক লইয়া আব তর্কবিতর্ক না করিয়া, ঐ অল্পমস্তিষ্কবিশিষ্ট স্ত্রীজাতি যে এই ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে পুরুষের কত কাছাকাছি উঠিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

এই শতাব্দীতে, কেবল ৫০ বৎসরের মধ্যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার নারীমণ্ডলীব যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা দেখিলে, বাস্তবিক অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই অল্পকালে কত সহস্র সহস্র শিক্ষিতা, প্রখরবুদ্ধি ও কার্য্যক্ষম স্ত্রী, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বড় বড় আফিসে কেরানীব কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। কত নিপুণ ও উপাধিধারিণী নারী, চিকিৎসা করিয়া পীড়িত লোকদের যন্ত্রণা দূর করিতেছে। কত দার্শনিক, ন্যায়বিৎ, বিজ্ঞানবিৎ ও আইনজ্ঞ মহিলা, আমাদের দৃষ্টিপথে একে একে আবির্ভূত হইয়াছে। কত হারাণ নক্ষত্রের ন্যায স্ত্রীলোকের হারাণ তেজ ও বুদ্ধি, জ্ঞানচর্চ্চার ফলে, ক্রমে সংসার-আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছে! আমেরিকার ওয়াসিংটন প্রদেশের স্ত্রীলোক জুরী ও এটর্নীরা, পুরুষদের অপেক্ষা অধিক স্থিরবুদ্ধি ও আইননিপুণ বলিয়া পরিগণিত হন। ইউনাইটেড ষ্টেটে, এখন প্রায় ৫৫ জন স্ত্রীলোক এটর্নীর কাজ আর নিউইয়র্কে ৬ জন, সাধারণ বক্তার কাজ করিতেছেন। তিন জন বড় স্ত্রীলোক ডাক্তার—সুসেন ষ্ট্যাক্‌হাউস, ক্লারা মার্শেল ও মেরী উইনেট্‌স—[১৫] ফিলাডেলফিয়ার ক্লিনিকেল (Clinical) বোর্ডের সভ্য ; ঐ স্থানে, ৮ জন স্ত্রী ডাক্তারের প্রত্যেকের বৎসরে ২০,০০০ ডলার, ১২ জনের ১০,০০০, আর ২২ জনের ৫,০০০ ডলার করিয়া উপার্জ্জন। ঐ দেশের হলণ্ড প্রদেশে, বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ঔষধসম্বন্ধীয় রসায়নবিদ্যার কাজে নিযুক্ত আছে। ইহা ভিন্ন, মিসেস্ ফ্র্যাঙ্ক লেস্‌লি নামে একটি রমণী, একখানি বড়

সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ। আমেরিকায় তাঁহাকে সকলে 'ইলাষ্ট্রেটের প্রেসের মা' বলিয়া আহ্বান ও মান্য করে ; তাঁহার কাগজের লেখকরাও প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক ; আর তাঁহাদের আয়ও মন্দ নয়। ইহা ব্যতীত, বড় বড় গ্রন্থকর্ত্রীও আমেরিকায় অনেক আছেন এবং তাঁহাদের উপার্জ্জনও প্রচুর।

আমেরিকার পর, স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষায়, ইংলণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপের মধ্যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে যেমন উচ্চপদবী পাইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ঐ দেশে প্রায় ১,০০০ বালিকাদের উচ্চশ্রেণীর স্কুল, এবং প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীদের জন্য ৬/৭টা বড় বড় কলেজ আছে। আর ছোট ছোট মেয়েদের স্কুলের ত সংখ্যা নাই। ঐ সব উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে, ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের প্রায় ২৫,০০০ বালিকা প্রতি বৎসর শিক্ষা পাইয়া থাকে। উহাদের বয়স ১২ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত। এই সব মেয়েদের মধ্যে, অধিকাংশই সংসারের কাজ শিক্ষা করে ; তদ্ভিন্ন, যাহাতে পিতামাতাদির গলগ্রহ না হইয়া, এই অগাধ সংসারে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সে সব বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষিত হয়। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রতিবৎসরে এই ২৫,০০০ শিক্ষিতা বালিকাদের সাহায্য দ্বারা, ভবিষ্যতে ঐ দেশের যত ছোট ও অশিক্ষিতা মেয়েরা, ক্রমে জ্ঞান, উন্নতি ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে, এবং ব্রিটনের মহা শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে গড়ে ৮০০ বালিকা ভর্ত্তি থাকে, তাহার মধ্যে তিন ভাগ দৈনিক ছাত্রী অর্থাৎ তাহারা প্রতিদিন ৯টা হইতে পাঁচটা অবধি স্কুলে পড়ে ও ছুটির পর বাড়ী যায়। আর অবশিষ্ট বার্ষিক ছাত্রী,—তারা বড় বড় শীতগ্রীষ্মাদির ছুটী ভিন্ন, প্রায় সমস্ত বৎসরই স্কুলে থাকে, স্কুলবাড়ীতেই খায়, পড়ে ও ঘুমায়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৯টার সময় পাঠ আরম্ভ ও ১২টা পর্য্যন্ত পড়া হয়। ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত আহার, বিশ্রাম ও খেলার সময় দেওয়া হয়। তাহার পর, বিকাল বেলায়, বালিকারা গানবাজনা ও চিত্রাদিতে শিক্ষা পায়। এই সব ছাড়া, ঐ সকল বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, অঙ্ক ও ভূগোল ইত্যাদি কঠিন বিষয়েও, বালিকাদের আবশ্যক ও ক্ষমতা অনুসারে, প্রতি সপ্তাহে পাঠ ও লেক্‌চার দেওয়া হয়। কেহ কেহ বা গ্রীক ভাষা শেখে, আর অধিকাংশই উত্তমরূপে লাটিনভাষায় শিক্ষিত হয়। সরল শারীরবিদ্যা, রন্ধন ও ইতিহাস, ইত্যাদিও বাদ যায় না। আর প্রতি রবিবারে একজন পুরোহিত ধর্ম্মোপদেশ দেন। এই সব পাঠের জন্য, প্রতি বালিকাকে গড়ে মাসে ১৫্ টাকা ফি বা বেতন দিতে হয়। এই সব উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রায় সকল অধ্যাপকেরাই স্ত্রীলোক, তাহার মধ্যে ১৫ জন উপাধিধারিণী।

ঐ সকল বিদ্যালয়ে, ৫/৬ বৎসর থাকিয়াও, যদি কোনও বালিকা আরও উচ্চশিক্ষা পাইবার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, সে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত স্ত্রী-কলেজে গিয়া পড়িতে পারে। ব্রিটনের স্ত্রী-কলেজের মধ্যে, কেম্ব্রিজের গার্টন[১৬] ও নিউন্‌হ্যাম্‌ই অধিক বিখ্যাত।[১৭] গার্টন সংস্থাপিত হইবার পর অবধি, উহাতে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে, এবং ১৩০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছে। আর, নিউন্‌হ্যামের ৪৮০ জন

ছাত্রীর মধ্যে, ৪০০ যুবতী, বড় বড় উপাধি লইয়াছে। ঐ সব স্ত্রী বি-এ-দের মধ্যে, ১৩০ জন উচ্চশিক্ষা বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বা অন্য কোনও শিক্ষকের পদে, নিযুক্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে, প্রায় আজকাল অধিকাংশ, ভাল-মন্দ সব রকমের উপন্যাসগুলিই নারীরচিত। ঐ সব স্ত্রীগ্রন্থকর্ত্রীদের মধ্যে, বর্ত্তমান মিসেস্ অলিফ্যান্ট, মিস্ থ্যাকারে, মিস্ ব্র্যাড্ন প্রভৃতি[১৮] কয়েক জন, অতি প্রসিদ্ধ। আর মৃত মহিলা লেখিকাদের মধ্যে, জর্জ এলিয়ট, মিস্ ব্রন্ট, মিসেস্ ক্রেক্ ও মিস্ অষ্টিন্,[১৯] অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। এই সব গ্রন্থকর্ত্রীরা উপন্যাস লিখিয়া যে কত উপার্জ্জন করেন ও করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হয় ত আমাদের প্রত্যয় হয় না। কিন্তু, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় উহা সচরাচর ঘটিতেছে। উঁহারা এক-একখানি নবেল লিখিয়া, অন্ততঃ ১০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন, আর ঐ সকল উপন্যাস-লেখিকারা বৎসরে দু' খানার কম পুস্তক না লিখিয়া ছাড়েন না ; সুতরাং শুধু কলম চালাইয়া, গড়ে তাঁহাদের অন্ততঃ ১,৫০০ টাকা মাসিক আয় হয়! ঐ সব বড় লেখিকা ছাড়া যে কত মাঝারী ও ছোট-রকমের গ্রন্থকর্ত্রী আছেন, তা' বলা যায় না ; তাঁহাদের নাম ও পুস্তকের গুণানুসারে, তাঁহাদের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়।

ইংলণ্ডের মৃত গ্রন্থকর্ত্রী, বিখ্যাত জর্জ এলিয়টের নাম, বোধ হয়, অনেক পাঠক শুনিয়া থাকিবেন ; তিনি, পুরুষের অবিচারের ভয়ে, নিজের নাম লুকাইয়া, প্রথমে ঐ পুরুষের নাম দিয়া, এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখেন ; পরে যখন সকলে তাঁহার পুস্তকের প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিল ও আগ্রহের সহিত ঐ পুস্তক পড়িল, তখন তিনি নিজের পবিচয় দিলেন। কিন্তু, তাঁহার উপন্যাসগুলি এত গভীর চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল যে, লেখিকার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াও, আর কোনও লোক তাঁহার পুস্তককে 'স্ত্রীলোকের লেখা' বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না, বরং তাঁহার রচিত গ্রন্থ সর্ব্বত্রই পঠিত ও আদৃত হইতে লাগিল। তথাপি, উপন্যাসবিরচনে এতদূর সফল হইয়াও, তিনি নিজের প্রণীত গ্রন্থে, ঐ পুরুষের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তখনও তাঁহার প্রকৃত নাম, (মেরী ক্রস) দেন নাই। সে জন্য, এখনও তাঁহার পুস্তক, সর্ব্বত্র জর্জ এলিয়েটের লিখিত বলিয়াই প্রচলিত। কিন্তু যে নামেই তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত থাকুন না, তিনি যে একজন অসামান্য চিন্তাশীলা, বিদ্যাবতী, নারীরত্ন ছিলেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ঐ মহিলা, তাঁহার প্রথমগ্রন্থের জন্য, প্রকাশকের নিকট হইতে ১,০০,০০০ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। অবশ্য এরূপ সফলতা সকলের জীবনে ঘটে না ; কিন্তু, স্ত্রীলোকে সুশিক্ষিতা হইলে, কোনও না কোনও উপায়ে যে ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

নারীরা অর্থ উপার্জ্জন করে না বলিয়া, যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় বাধা দিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আমেরিক স্ত্রী-ডাক্তার ও স্ত্রী-এটর্নীদের এবং ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্রীদের আয়ের কথা পড়িয়া, আশা করি, তর্কের পূর্ব্বে, মনে মনে একটু বিবেচনা করিবেন।

অনেকে আবার এই বলিয়া স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে ওজর তুলেন যে,—নারীজাতি শিক্ষার প্রভাবে যত স্ত্রীসুলভ গুণ হারাইয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানে আড়াআড়ি করে,

কিন্তু মন দিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম দেখে না, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের সে সংস্কার একান্ত ভ্রমাত্মক। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার অত উন্নতি হইলেও, সেখানকার রমণীরা, সংসারের কাজে অমনোযোগিনী বা সন্তানপালনে অজ্ঞ নয়। বরং তাহারা অধিকতর নিয়মপূর্ব্বক ও সুশৃঙ্খলে গৃহকর্ম্ম ও শিশুপালন করিয়া সংসারের সুখ বাড়ায় ও দেশের উন্নতি করে। অবশ্য দুই চারি জন স্ত্রী, পুরুষের পোষাকাদি পরিয়া, স্বাধীনতা ও উচ্চ-শিক্ষার কিছু অপব্যবহার করে বটে, কিন্তু দু'-এক জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, সমস্ত স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া কি জ্ঞানীর কার্য্য? আবার আমেরিকা ছাড়িয়া, ইংলণ্ডের উচ্চশিক্ষিতা নারীমণ্ডলীর মধ্যে আসিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষাবলে, নারী-সুলভ সমস্ত কোমলগুণ না হারাইয়া, বরং তাহারা স্ত্রী-জীবনের সমস্ত কাজ অধিকতর বুদ্ধি, চতুরতা ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারে। ঐ দেশেও দুই চারি জন স্ত্রীস্বাধীনতার ও স্ত্রীশিক্ষার অপব্যবহার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের বাদ দিলে, ইংরেজ সংসারে যেমন নিয়ম, পরিপাট্য ও নৈপুণ্যের চিহ্ন দেখা যায়, আমাদের অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে, সেরূপ সুব্যবস্থা কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে জগতে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, হাজার লেখাপড়া শিখিলেও, তাহারা কখনও পরমেশ্বরের সে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাইতে চাহে না।

এ জগতের রক্ষণশীল লোকেরা এতদূর ক্ষুদ্রমনা যে, এই সব নানা সদুদাহরণ দেখিয়াও, তাঁহাদের চোক খুলে না, আজকাল প্রায় সকল দেশেই এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা ভাবেন,—উচ্চশিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকে নারীত্ব হারাইয়া, পুরুষের সকল কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আমরা আশা করি, সুশিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, রক্ষণশীল জগতের ঐরূপ বিরোধভাব ক্রমে বন্ধুভাবে পরিণত হইবে। আর, ইহাও কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, স্ত্রীলোকের নম্রতা, সরলতা, লজ্জাশীলতাদি গুণই সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু নারীজাতির অজ্ঞতাকে কেহই মান্য করে না। সেই হেতু, প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীদের ঐ সকল গুণের আরও উৎকর্ষ লাভ ব্যতীত অপকর্ষলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে, উহা মার্জ্জিত স্ত্রীকে আরও মার্জ্জিত, সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে। প্রকৃত শিক্ষাই নারীকে স্বামীর সহায় ও উপযুক্ত ভার্য্যা করিয়া তুলে, পরস্পরের ভালবাসাকে অধিকতর বিশুদ্ধ ও পরস্পরের সঙ্গকে অধিকতর সুখপ্রদ করিয়া থাকে। উহাই কেবল জননীকে তাঁহার পবিত্র কর্ত্তব্যে অধিকতর পারদর্শিনী করে ; শিক্ষিতা মায়ের সুরুচি ও উদাহরণ দ্বারাই সন্তানদের কচি মন ভাল আদর্শের দিকে ধাবিত হয় ; আর শৈশবকালে মার কথা শুনিয়া, শিশুদের মনে যে সকল সদ্ভাব ও সুগুণের জন্ম হয়, কার সাধ্য, বৃদ্ধ বয়সেও তাহা উপড়াইয়া ফেলে?

সেই জন্য, স্ত্রীজাতির শিক্ষাই জাতীয় সদ্‌গুণের ও সচ্চরিত্রের প্রধান মূল ; আর উহা দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষ হইতে সমস্ত জগতের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা, সামাজিক আলাপ ও সামাজিক সুখের আরও বৃদ্ধি হয় ; আর উহাই বিবাহকে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পথ ও পরস্পরের মানসিক সুখের সোপান করিয়া তুলে। রমণীদের সুশিক্ষা দ্বারাই

সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে, আর উহাই জীবনের সমস্ত কাল ও মানব গৃহকে সুখময় করিতে পারে। আর জ্ঞানের প্রভাবেই, নারীরা বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বত্র উপেক্ষিত না হইয়া, সুশিক্ষিত লোকের সমাজে, সর্ব্বদা মান্য ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন।*

*[এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র কবে বাদ-প্রতিবাদমূলক আলোচনাব জন্য পবিশিষ্ট ২ অংশ দেখুন।]

অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী

জন্মকালে, সকল দেশের, সকল সময়ের ও সকল শ্রেণীর কন্যারাই এক অবস্থায় থাকে; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, পিতামাতা ও দেশকাল ভেদে, তাহাদের অবস্থা ও জীবনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তথাচ,—বনে ভূমিষ্ঠ গারোর কন্যা, প্রাঙ্গণে শায়িত গয়লার মেয়ে, তেতলার ঘরে বিছানায় স্থিত ভারতীয় ধনীর বালিকা ও মখমলের শয্যায় আবৃত একজন ধনাঢ্য ইউরোপীয়ের সদ্যোজাত শিশুর—আভ্যন্তরিক অবস্থার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। উহারা সকলেই ক্ষুধা পাইলে একরূপে কাঁদে। মাতৃস্তনপানে একভাবে পরিতৃপ্ত হয়, আর জননী যা কিছু আহার করুন, উহা একভাবে জীর্ণ হইয়া একই প্রকার স্বাভাবিক নিয়মবলে তাহাদের শরীর পুষ্ট করে। অবশ্য, বাহ্যিক বেশ-ভূষায় উহাদের যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহাতে উহাদের আন্তরিক কোনও প্রভেদ সাধন করিতে পারে না। শীতকালে জরি-মখমলের ও বনাতের পরিচ্ছদে উহাদের গা ঢাকা দাও, কি মোটা কাঁথা বা ভালুকের চামড়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখ, সকল শীতবস্ত্রেই উহারা এক উপকার পায়। গ্রীষ্মকালে উহাদিগকে খাটের উপর শীতলপাটীতেই শোয়াইয়া রাখ, বা বনের ভিতর নরম ঘাস ও পাতার উপরই ফেলিয়া রাখ—উহারা সর্ব্বত্রই একভাবে হাত পা নাড়িয়া খেলা করিবে। কিন্তু ঐ বালিকারা যত বড় হইতে থাকে, উহাদের শরীর, জীবন ও অবস্থার তারতম্য, তত অধিকরূপে পরিস্ফুট হয়।

ইহা সত্য যে, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত ও মূর্খ, সকল লোকের সন্তানদেরই এক অসুখ হয়, আর একরূপ ঔষধ ও মার যত্ন হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শিশু আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্র-সন্তানেরা উপযুক্ত ঔষধও পায় না, আর মার শুশ্রূষাতেও বঞ্চিত থাকে; পিতামাতা দরিদ্র, ঔষধ কিনিবার সঙ্গতি নাই ; অথবা পিতামাতা অসভ্য, ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঔষধ আছে, তাহারা সে বিষয়ে অজ্ঞ। দরিদ্র বা অসভ্য মার মনে যে ধনী মাদের অপেক্ষা স্নেহ অল্প, তাহা নহে ; তবে শিক্ষা ও সময়ের অভাবে, তাহারা উপযুক্তরূপে সন্তানপালনে অক্ষম। ধনীর বালিকা এদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভবনে, মার যত্নে ও ঝিয়ের কোলে কোমলভাবে লালিত হয় ; গরীবের শিশু মাটীর উপর কাদা ধূলা মাখিয়া বাড়িতে থাকে। এইরূপে দুটি কচি ফুল একভাবে জন্মিয়া, যত্ন ও শিক্ষার বলে, একটি বাগানের গোলাপ হয়, আর অযত্ন ও অশিক্ষাবশতঃ অন্যটি বনের ভাঁটবাকস ফুলের মত গড়াগড়ি যায়।

এখন হইতে আমরা উহাদের বাহ্যিক প্রভেদের সহিত মানসিক বিভিন্নতার চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাই। বড় ও সভ্য লোকের কন্যা কাদাধূলায় হাত দিতে ঘৃণা করে, আর গরীব বা অসভ্যের মেয়ে কাদা মাখিয়া পরম সুখী হয়। একটি বালিকা কাপড় না পরিয়া কখনও ঘরের বাহিরে আসে না, অপরটি উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় যাইতে লজ্জা পায় না! ক্রমে, একজন বিদ্যা শিখিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানবতী হয় ; অন্যজন নিজের অবস্থা পর্য্যন্ত ভাল রকম না বুঝিয়া, পশুর মত জীবন কাটায়। এখন দেখ, ঐ দুটি ফুলে কত প্রভেদ! বাহ্যিক বিভিন্নতা হইতেই উহাদের এই আন্তরিক অনৈক্য! সুতরাং জন্মিবার পর প্রথম হইতেই আমরা যদি

ঐ দুটি শিশুকে একভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া লালন করিতাম, তাহা হইলে, দু'জনেই যে প্রাপ্ত বয়সে একরূপ পরিষ্কার, শিক্ষিতা ও চতুরা হইত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোমল হইলেও, বাল্যকাল হইতে পৃথিবীর নানাবিধ ঝড় তুফান সহিয়া, দরিদ্র বালিকারা শীঘ্রই কঠিন কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হয়। আর উহারা যতই কঠিন কাজ করুক না কেন, সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর নারীরাই সমান স্নেহশালিনী ; তবে সভ্য মহিলাদের ঐ মৃদুভাব যত সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়, গরীব ও অসভ্য বালাদের যে কেন তত দূর ফুটিতে পায় না, তাহা আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভিন্ন, (ইংলণ্ডে স্ত্রীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী, আর আমেরিকায় অনেক কম ;) সকল দেশের স্ত্রীর সংখ্যাই পুরুষের প্রায় অর্দ্ধেক, তাহা হইতে তিন ভাগ ধনী, মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ বাদ দিয়া কেবল এক চতুর্থাংশ দরিদ্র ধরিলেও, এ জগতে যে কত লক্ষ গরীব স্ত্রী আছে, তাহার গণনা করা বড় সহজ নয়। অথচ, এই এত লক্ষ দুর্ভাগ্য বালা যে কি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ ও সন্তান পালন করে, সে বিষয় অতি অল্প লোকই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। অর্থোপার্জ্জন পুরুষের প্রধান কার্য্য, সুতরাং উহা তাঁহাদের পক্ষে যতদূর ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য হউক না কেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টকর। বিশেষতঃ, সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্মই নারীর প্রধান কার্য্য, সে জন্য স্ত্রীদিগকে যখন ঐ কাজের উপর আবার সংসারের আহার যোগাইতে হয়, তখন উহাতে কত দৃঢ়তা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও স্থিরবুদ্ধির আবশ্যক, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আমরা এমন দুর্ভাগ্য দরিদ্র স্ত্রীদের মধ্যেও এমন মা ও গৃহিণী অনেক দেখিতে পাই, যাহারা মন দিয়া সংসারের কার্য্য করে, আবার অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সন্তানদের ভরণপোষণ করে! আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকপত্নীরা যে কত পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহারা ধান ভানে, চাল কাঁড়ে, ময়দা পিষে ও গৃহে আরও অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করিতে বাধ্য হয়। আদিম কাল অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক ভাল বিষয়ের ন্যায়, কৃষিজীবীদের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত অনেক নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, আমরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণ কৃষকদের মধ্যেই অনুসন্ধান করি, আর বাঙ্গালার নানাজাতীয় চাষীদের মধ্যেই দেখি, বা দাক্ষিণ্যাত্যের শঙ্করবর্ণ কৃষিজীবীদের কাছেই যাই,—সকল স্থানেই, দরিদ্র কৃষক পত্নীদের মধ্যে কেবল কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও নিদ্রিত জীবনের উদাহরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হই। কিন্তু উহাদের আত্মা ঘুমন্ত থাকিলেও উহাদের জীবন মৃত নয়, যদিও উহারা সংসারের কাজ ও সন্তানপালনে কিছুমাত্র অবহেলা করে না, আর স্বভাবের দ্বারা পালিতা বলিয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বেষ্টিত থাকিয়া, অনেক স্বাভাবিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তথাপি, প্রকৃতরূপে বিদ্যাজ্ঞানে শিক্ষিত হইলে, তাহারা ঐ স্বাভাবিক জ্ঞানকে আরও কত কার্য্যোপযোগী করিতে পারিত, তাহা হইলে, তাহাদের সংসার কত শৃঙ্খলাময় ও সন্তানেরা কত সুস্থ ও সবল থাকিত।

বর্ত্তমান ভারতের ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশের দরিদ্র কৃষকপত্নীদের অবস্থা প্রায় এক প্রকার। যেখানে সুশিক্ষা ও সদাচারের প্রভাবে নারীরা সৌভাগ্য ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, এবং যেখানে শিক্ষার অভাবে তাহারা দুর্ভাগ্য ও অবনতির অতলস্পর্শে

পড়িয়া আছে, এইরূপ দুই তিনটি বিভিন্নধর্ম্মী দেশের স্বতন্ত্র উদাহরণ দেখাইয়া সদাচারণের সুফল ও কর্কশ ব্যবহারের কুফল দেখাইতে চেষ্টা করিব। এ জগতে এমন দেশ অতি বিরল, যেখানে দরিদ্র স্ত্রীরা পুরুষের কাজ করিয়াও, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনে তাচ্ছল্য করে না। পুরুষ মহা বুদ্ধিমান্ হইলেও, ঐ দুই কাজ কখনও সুচারুরূপে সাধন করিতে পারে না। ফ্রান্স ও সুইজর্লণ্ড দেশের কৃষকবালারা, এই দুই কার্য্যে পরিশ্রম ও কার্য্যপটুতার এবং কোমলতার প্রধান উদাহরণস্বরূপ। দরিদ্র ফরাসী স্ত্রীরা, তাহাদের স্বামী, বাপ বা ভাইয়ের সঙ্গে সমানে চাষ দেয়, শস্য রোপণ করে, ঘাস তোলে, লাঙ্গল চালায় ও অন্যান্য যত মাঠের কাজ করে, অথচ তাহাদের সংসারে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য দেখিলে মনে হয় না যে, গৃহিণীরা সর্ব্বদা বাহিরে থাকে। আর তাহাদের সন্তানদের সুন্দর হাস্যময় মুখ দেখিলে কেহ ভাবিতেও পারেন না যে, তাহাদের মায়েরা প্রতিদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিবেন,—ইহার কারণ কি? নারীজাতির শিক্ষা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা ও কোমল গুণের সঙ্গে কঠিন গুণের মিশ্রণই উহার একমাত্র হেতু।

সুইজর্লণ্ড শীতপ্রধান ও পর্ব্বতময় দেশ বলিয়া, সেখানে চাষ-বাস ও গাছপালা রোপণ করিতে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়। দরিদ্র স্ত্রীরা সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভার নিজের মস্তকে বহন করে। দ্রাক্ষালতা রোপণ করা, আঙ্গুরের যত্ন ও আঙ্গুর তোলা প্রভৃতি কাজ তাহারা যেরূপ উল্লাস, নৈপুণ্য ও মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করে যে, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে, ঈশ্বর স্ত্রীলোককে কেবল গৃহকর্ম্মের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতৃ সংসারে এমন পুরুষ নাই বলিলেই হয় যে, গৃহকর্ম্মের ভার লইয়া, নিজের স্ত্রীকন্যাকে মাঠের কাজে পাঠায়। সেই জন্যই, এ দেশের গারো ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে যেমন দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা পিঠে ছেলে বাঁধিয়া মাঠে কাজ করে ও পাহাড়ে উঠানামা করে ; সেইরূপ ফরাসী ও সুইস স্ত্রীরাও সন্তান পিঠে বাঁধিয়া কৃষিকাজ করিয়া থাকে ; আর তাহারা কখনও বা কোনও ঝোপের ভিতর কাঠের দোলায় শিশুকে শোয়াইয়া রাখিয়া, ক্ষেতের পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য হয়।

ফরাসী ও সুইস স্ত্রীদের উত্তম শিক্ষা ও পুরুষদের সদাচার আছে বলিয়া, নারীজাতি ঐরূপ পুরুষের কাজ করাতেও, উহাদের মধ্যে কোনও সাংসারিক বিশৃঙ্খলা বা জীবনের দুর্গতি দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইউরোপের রুসিয়া দেশে যে মহা অপকার ঘটিয়া থাকে, পুরুষের অলসতা ও নিষ্ঠুরতাই তাহার কারণ। মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর, যদি আবার সেই স্বার্থপরতাদোষের দমন না করিয়া তাহাকে প্রশ্রয় ও আদর দেওয়া যায়, তাহা হইলে, এ পৃথিবী যে কি রকম অধর্ম্ম, অকর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ হয়, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন যে, রুসিয়া দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, কৃষকেরা ক্রীতদাসের ন্যায় আচরিত হইত, এবং তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসের অপেক্ষাও জঘন্য ছিল। অল্প দিন হইল, অনেক হিতৈষী লোকের যত্নে সেখানে ঐ ক্রীতদাসের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু যে সকল লোক আজন্মকাল দাস থাকিয়া, মানুষের সমস্ত গুণ হারাইয়াছে, তাহারা এখন বাহ্যিক স্বাধীন হইলেও, অন্তরে নীচ পশুর ন্যায়ই রহিয়াছে। রুষ কৃষকদের মধ্যে পানদোষ, অলসতা প্রভৃতি যত কু-অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে

কৃষকপত্নীরা মাঠে গিয়া স্বামীদের অল্প অল্প সাহায্য করিত, এখন তাহারা পুরুষের স্বার্থপরতা ও অবহেলানিবন্ধন, আপনারাই সমস্ত চাষবাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্ত্রী ও ভগিনীদিগকে কৃষিকর্ম্ম করিতে দেখিয়া, স্বামী ও ভ্রাতারা ক্রমে ক্রমে এই কঠিন কর্ম্মের দারুণ পরিশ্রমে বিরত হইয়াছে। কাজে কাজেই, মানুষের এরূপ অলসতার যে মন্দ ফল ফলিবার সম্ভাবনা, রুসিয়ার সমস্ত চাষীদের সংসারেই সেই বিষময় ফল লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা, সকল প্রকার কঠিন কর্ম্ম ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও দিন রাত কর্কশভাবে আচরিত হওয়ায়, একে একে নারীর কোমল গুণ হারাইয়াছে। তাহারা পুরুষের মত মাঠে মাঠে কাজ করে, ঘোড়ায় চড়িয়া হাটে হাটে বেড়ায়, আর পুরুষের মত সংসারে অযত্ন ও সন্তানের প্রতি অবহেলা করে!

সুতরাং কৃষকপত্নীদের এই অনবধান ও অযত্নের জন্য, কৃষিজীবীদের কুটীর ও বাসস্থান সকল গরুর গোয়াল অপেক্ষাও অধিক দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর ও বিশৃঙ্খল হইয়াছে। আর শৈশবে রুস কৃষক-সন্তান মার যত্ন পায় না বলিয়া, অধিকাংশ শিশুই দশ বৎসরের পূর্ব্বেই মারা পড়ে। কৃষক-পত্নীদের সংসারের কাজ করিবার অবসর নাই। তাহারা প্রাতঃকালে শিশুদের লইয়া ক্ষেত্রে যায়, আর ঐ কোমল শিশুগণ সমস্ত দিন মাঠের উপর পড়িয়া থাকে,—গাছের ডাল ছাড়া তাহাদের আর কোনও আচ্ছাদন নাই, যত মাছি ও পিপীলিকা আসিয়া উহাদের গায়ে কামড়াইতেছে, মায়েরা হয় ত কত দূরে চাষ দিতেছে, শিশুদের অস্ফুট কোমল স্বরের যাতনার কান্না তাহারা শুনিতেও পায় না! প্রতিদিন কচি বালকবালিকারা এইরূপে অযত্নে পড়িয়া থাকাতে, বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের পীড়া জন্মে, এবং পরিণামে অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবার, এত নির্ম্মম, স্ত্রী-স্বভাবসুলভ গুণে বঞ্চিতা রুসপত্নীদের মধ্যে খুঁজিলেও, আমরা এমন দু' চারটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাই, যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম, উভয়ই সুচারুরূপে সাধন করিয়া থাকে। তাহারা যত্নপূর্ব্বক সন্তানপালন করে ও কঠিন পরিশ্রম করিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন পশুদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন নারীদের মধ্যেও, আমরা স্ত্রীজাতির দু-একটি মহৎ গুণ দেখিতে পাই। দরিদ্র রুসবালারা সাধ্যমত আগ্রহের সহিত অতিথি-সৎকার করে ও প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করে।

দুর্ভাগ্য আইরিস কৃষকপত্নীদের মধ্যেও আমরা এই সুন্দর মাতৃস্নেহ, আতিথেয়তা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হই। তাহাদের অবস্থা রুস কৃষিজীবীদের তুলনায় কিছু ভাল হইলেও, উহা অতীব ক্লেশকর ও দুঃখজনক। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর মাঠে গিয়া কাজ করে। আর পুরুষরা ঘরে বসিয়া ঘুমায়। তথাচ, অত পরিশ্রম ও অর্দ্ধাহারের মধ্যেও, আইরিস স্ত্রীরা মাতৃস্নেহে ও ধর্ম্মভাবে, সংসারে স্ত্রীজাতির কঠিন ও কোমল হৃদয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে! এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। এখন পাঠকপাঠিকারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন যে, প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে দু'টি সদৃশ বালিকা ফুল তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়াছিলাম, সে দুটির জীবনে সামাজিক ও সাংসারিক সহস্র প্রভেদ থাকিলেও, এবং তাহারা সহস্র প্রকার বিভিন্ন ভাবে আচরিত

হইলেও, মূলে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্যই দেখা যায়। তাহারা সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমল প্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত, ও এক প্রকার দৃঢ়তায় আবৃত। এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্কবিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না এবং সভ্য অসভ্যের প্রভেদ থাকিত না!

সংসারে শিশু

সকলেই জানেন, গৃহে ছেলে না থাকিলে সংসার কি বিমর্ষ বোধ হয়, বাড়ী কেমন ফাঁক ফাঁক দেখায়। ঘরে হাজার লোক থাকিলেও, একটি শিশুর অভাবে উহা যেন ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ মনে হয়। সেই জন্যই বোধ করি, আমাদের দেশের লোকে 'আঁটকুড়া' গালাগালিতে অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু, বাস্তবিক, ওরূপ তিরস্কারে সকল দেশের লোকেই সমান দুঃখ অনুভব করে। কি আসিয়িক মাতা, কি ইউরোপীয় জননী, কি আফরিক রমণী—প্রথম সন্তান বুকে ধরিতে সকলেরই একরূপ উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া উঠে; শিশুর মুখে 'বাবা' ডাক শুনিলে সকল পিতারই হৃদয়ে একরূপ স্নেহের উৎস ছুটে!

কিন্তু, এই যে আমাদের সংসারের অলঙ্কার, এত আদর ও যত্নের ধন শিশু, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের জন্য আমরা কি করিয়া থাকি? নিঃসন্দেহ সন্তানকে সুখে রাখিতে বা সুখী করিবার বাসনায়, কোন পিতামাতা আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু কেবল ঐ প্রাণ দিয়া ভালবাসাতে শিশুকে সমস্ত জীবন সুখী করিতে পারা যায় না। উহার জন্য পিতামাতার অসীম জ্ঞান চাই, শিক্ষা চাই, স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ণ মস্তিষ্ক চাই। সন্তানের শারীরিক যত্নের ন্যায় নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা চাই। কিন্তু এ জগতে কয় জন লোক ঐরূপ শিক্ষার উপযোগিতা বুঝেন? বিশেষ, আমাদের দেশের পিতামাতারা উহার আবশ্যকতা স্বীকারই করেন না। সেই জন্যই বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গালা দেশে এত হৃদয়হীন যথেচ্ছাচারী যুবক দেখা যায়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত মা-বাপ প্রাণপণ যত্নে যে পুত্রদিগকে পালন করেন, সেই ছেলেরা আবার বড় হইয়া পিতামাতার অপমান করিতে ছাড়ে না। এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাপমায়েরা যদি বাল্যকাল হইতেই, শিশুদের শরীরের ন্যায়, মনের এবং হৃদয়েরও পুষ্টিসাধন করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে, ওরূপ দুঃখময় ঘটনা সংসার হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। কিন্তু ঐ শিশুশিক্ষা প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে, আগে আরও দুই একটি বিষয় জানা আবশ্যক। আজকাল ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই, সংসারে শিশুদের স্বত্ব ও সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে; ঐ আন্দোলনের স্রোত ক্রমে আমাদের ভারতেও আসিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে, সে বিষয়ে দু' একটা কথা বলাও অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশীয় পিতামাতারা ত কখন মনেও ভাবিতে পারেন না যে, শিশু তাঁহাদের প্রাণের ধন হইলেও সে একটি স্বতন্ত্র জীব, ঈশ্বর তাহাকেও অন্যান্য লোকের ন্যায় মানসিক বৃত্তিনিচয় ও তৎসমুদায় পরিচালন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাকে নিজের পথ দেখিয়া চলিতে হইবে, সুতরাং বাল্যাবস্থা হইতেই তাহাকে অল্প অল্প স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এমন কি, ইউরোপের অনেক পিতামাতারাও এপর্য্যন্ত ঐ প্রকৃতবাদের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তবে ইউরোপের সর্ব্বত্রই যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহাতে পিতামাতার ঐরূপ ভ্রান্ত সংস্কার যে অল্প দিনের মধ্যেই বিদূরিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে, শিশুর জীবনধারণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের যোগাড় করিয়া পিতা মাতা সন্তানের সহিত যে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হন, সে সম্বন্ধ,

অন্যান্য লোকের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন, অতএব উহার উপর জগতে মানুষের সমস্বাধীনতার আইন খাটান যাইতে পারে না। কিন্তু উহার উত্তর এই যে—ঐরূপ লালনপালনের দ্বারা পিতামাতা সন্তানের উপর কতকটা বশ্যতা স্থাপন করিতে পারেন বটে, আর তাঁহাদের ঐ স্বাভাবিক দাবী আছে বলিয়াই, যখন তাঁহারা অক্ষম হন, তখন সন্তানের দ্বারা সযত্নে পালিত হইবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অথচ, সন্তানের উপর বাপমার প্রভুত্বস্থাপনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। কেন না, ঐ শিশু ও পিতামাতা সম্বন্ধে যদি একদিকে উপকার ও অন্যদিকে বাধ্যতার দ্বারা শিশুর প্রতি জনকজননীর প্রভুত্ব করিবার অধিকার জন্মায়, তবে অন্যান্য বিষয়েও ঐরূপ হওয়া উচিত। তাহা হইলে, যে কোনও ব্যক্তি আর একজনের কোন উপকার করেন, তিনি ঐ উপকৃত ব্যক্তির উপর নিজ প্রভুত্ব খাটাইবার অধিকার পান। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। আরও কথা এই যে, যদি পিতার সম্বন্ধ অনুসারে তিনি সন্তানের সকল প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা, বৃত্তি বা কাজ দমন করিয়া রাখিবার অধিকার পান, তাহা হইলে কতদূর পর্য্যন্ত তিনি ঐ ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারেন? আর ঐ অধিকারের সীমাই বা কতদূর ও তাহার শেষই বা কোথায়? ইহা স্থির করা ত আমাদের অসাধ্য বোধ হয়।

সেই জন্য ঈশ্বর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যায়, শিশুদিগকেও বৃত্তিসমূহ দিয়াছেন, এই স্বাভাবিক বিধানেই আমরা শিশুর স্বত্বের মূল দেখিতে পাই। ঈশ্বরদত্ত এই সকল বৃত্তির চালনায় কিছুমাত্র বাধা না দিয়া, বরং উহার অবাধে পরিচালনের নিমিত্ত নানাপ্রকার সুবিধা ও উপায় করিয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু, তাহার পরিবর্ত্তে, পিতামাতা যদি সন্তানের সকল স্বাধীন ইচ্ছা ও বৃত্তিসমূহ দমন করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিয়া, জগতের মহা অপকার সাধন করিবেন, বলিতে হইবে। আমরা যেমন সচরাচর বলি, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গীর দ্বারা আমরা তাহার চরিত্র কিরূপ, তাহা বলিতে পারি, সেইরূপ, কোনও ধারণার সত্যতার বিচার করিতে হইলে, তাহাও কেবল সেই সত্যের নৈতিক গুণের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা দেখিলেই বলা যায়। জগতের যত নীচপ্রবৃত্তি ও অসভ্য লোকদের মধ্যে যদি এমন কোনও ধারণা থাকে যে, মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকেরা সেই ধারণার তত পক্ষপাতী নন, এবং ক্রমে ক্রমে সমাজের উন্নতির সহিত সে ধারণায় মানুষের বিশ্বাস কমিয়া আসে—তাহা হইলে সেরূপ ধারণাকে আমরা স্বচ্ছন্দে মিথ্যা বলিতে পারি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায়, অল্প দিন হইল, নারীজাতির অধীনতাসম্বন্ধীয় ধারণাও ইউরোপীয়দিগের মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আর যে সকল সাধারণ ঘটনার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল অমার্জ্জিত সামাজিক জীবনেই সচরাচর স্ত্রীজাতির দাসত্ব দেখা যায়, এবং স্ত্রীলোকেরা যে দেশে পুরুষের সহিত সমান বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইখানেই তাহাদের উন্নতি ও মার্জ্জিত জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন থাকিবে, ইহা প্রকৃতই অন্যায়। শিশুদের সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রমাণ ও উদাহরণ দেখা যায় ; আর উহা হইতে যথার্থ সিদ্ধান্ত অবগত হইতেও অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মানুষ, কাল ও শিক্ষাভেদে, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচার

ও প্রভুত্বের যেমন তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; সেইরূপ, শিশুদের উপর পিতার প্রভুত্বও দেশ, কাল ও শিক্ষানুসারে, অতি অসীম বা অপেক্ষাকৃত অল্প দেখা যায়। এই জন্য বোধ হয় যে, সমাজের উচ্চগতির সহিত নারীজাতির দাসত্বমুক্তির পথ পরিষ্কার হওয়া যেমন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সেইরূপ উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের উপর পিতামাতার যথেচ্ছাচার ব্যবহাবের হ্রাস হওযাও, সমাজের উন্নতিব পক্ষেও অতি আবশ্যক ও উপযোগী উপায়।

স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবন

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যেমন অসীম প্রভেদ—ভারত ও ব্রিটন মহিলার মধ্যেও সেইরূপ মহা বিভিন্নতা দেখা যায়। একজন দুর্ব্বল, ভীরু ও পরপ্রত্যাশী—অন্যজন বলিষ্ঠ, সাহসী ও আত্মনির্ভর। একটি কর্ম্মভূমিতে স্বামী-পুত্রদের জীবনে অন্তরায় স্বরূপ—অন্যটি সকল কাজেই পুরুষদের সহায়। এই দুটী নারীজীবনের এ অসীম প্রভেদের কারণ কি, তাহাই আমি সাধ্যমত দেখাইবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে আমি ভাবিতাম—লেখাপড়া শিখিলেই আমাদের চোক ফুটিবে—আমরা সাহসী, আত্মনির্ভর ও ভালমন্দ বিবেচনায় সক্ষম হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি সে ধারণা আমার ভুল। আমাদের মাতা ও মাতামহীরা যতদূর আত্মনির্ভর ও সদসৎ বিবেচনায় পারগ ছিলেন, আমাদের কন্যারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পর-প্রত্যাশী ও ভালমন্দ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া এক সিঁড়ি নীচে নামিয়া পড়িয়াছে। ইহা যে বিদ্যাশিক্ষা অভাবে হইয়াছে, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। এই পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও উপায় হইয়াছে, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে কিছু আর এ সব কিছুই ছিল না। আমাদের দিদিমায়েরা লেখাপড়ার নামমাত্র জানিতেন না, আমাদের জননীরা বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন মাত্র—কিন্তু আমাদের কন্যারা ইংরাজী পর্য্যন্ত শিখিয়াছে—অথচ তাহাদের মন অধিকতর সংকীর্ণ ও তাহাদের জীবনের কর্ম্মস্থান অধিকতর অপ্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে—ইহার কারণ কি? সেকাল হইতে একালের হিন্দুনারীর জীবনের গতি ক্রমশঃ উঁচু দিকে না গিয়া নীচগামী হইতেছে কেন?

আমি এখন স্পষ্ট দেখিতেছি ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি—হিন্দু নারীদের এই নীচগামী অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ—সম্পূর্ণরূপে অবরোধ-প্রথা ও পরনির্ভরতা। ইংরেজ মহিলাদের বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই, যে, যে জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা চলিত আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাই অধিকতর উন্নত। আর সেই স্বাধীন নারীদের জীবন অধিকতর কর্ম্মক্ষম, সাহসী ও আত্মনির্ভর। অনেকেই জানেন, পার্সীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা হিন্দুদের ন্যায় অত দৃঢ় নহে, সে জন্য পার্সী নারীরাও তাঁদের হিন্দু ভগিনীদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর। যিনি একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়াছেন, তিনিই তাহাদের সতেজ বদন ও কর্ম্মিষ্ঠ জীবন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। পার্সীগৃহে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই পূজিতা হইয়া থাকে—জননী, তাঁর অবর্ত্তমানে স্ত্রীই, সংসারের প্রকৃত রাণী—তাঁর উপর জোর চালাইবার পুরুষ রাজারও অধিকার নাই। শত শত বৎসর পূর্ব্বে পার্সীরা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে। তাহাদের স্ত্রীকন্যারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষা করিবার অধিক উপায় ও অবসর পাইয়াছে সত্য—কিন্তু উহার সঙ্গে তাহারা সেই পূর্ব্বের স্বতন্ত্রতাটুকু হারায় নাই বলিয়া উহাদের জীবন এখন সংসারে অধিকতর উজ্জ্বল ও অধিকতর উপকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার দেখ, কাশ্মীর, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশের পাহাড়ী স্ত্রীদের জীবন যে কত মার্জ্জিত, কর্ম্মিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, তাহা দেখিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই আহ্লাদিত হন।

তাহাদের পরিচ্ছদ অতি ভদ্র, চালচলন অতি সুমার্জ্জিত—আর তাদের জীবন সংসারে পুরুষদের অপেক্ষাও অধিক উপকারী। তাহারা বিদ্যার নাম মাত্র জানে না ; কিন্তু বাল্যকাল হইতে পুরুষজাতির সঙ্গে সমানে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহাদের জীবন এতদূর সাহসী, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয় যে, দেখিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার কোন উপায় ছিল না বটে, কিন্তু সংসারে স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদের একটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল—তাঁহারা অন্যান্য স্বতন্ত্র স্ত্রীদের ন্যায় গৃহের প্রকৃত রাণীস্বরূপ ছিলেন। বড় বড় কর্ম্মে স্বামীপুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ও তাঁহাদের মত বা অনুমতি লইয়া কাজ করা সকল নারীরই কর্ত্তব্য—কিন্তু ছোট ছোট বিষয়ে নারীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা দেওয়াই উচিত। প্রকৃত বিশ্বাস ও দায়িত্ব তাহাদিগকে বুঝিতে না দিলে তাহারা কি প্রকারে উহাতে অভ্যস্ত হইবে? আমাদের মা, দিদিমারা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, কাহারও অসুখ করিলে দেখিতে যাওয়া, অতিথি সৎকার, পরসেবা করা ও লোকজনকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। কিন্তু এখনকার হিন্দু নারীদের জীবনের বেড় এতদূর সংকীর্ণ ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে যে পিত্রালয়ে ভাইবোনদের পীড়া দেখিতে যাওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের নাই। আমরা এখন ঘরে বসিয়া ইংরেজী পুস্তক সকল ও অনেক মনোহর বাঙ্গালা গল্প পড়িয়াও আনন্দিত হইতেছি—সংবাদপত্র পড়িয়া দেশ বিদেশের খবর জানিতে পারিতেছি। আর আমরা পৃথিবীকে 'তিনকোনা' ভাবি না, ভূমিকম্প বাসুকির কাঁধ পরিবর্ত্তনের ফল মনে করি না সত্য—অথচ বঙ্গনারীর জীবনের কার্য্যতঃ উন্নতি কিছুমাত্রই হয় নাই। আমাদের সে পুঁথিগত বিদ্যা অন্দরমহলের চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই বদ্ধ আছে। হঠাৎ বাড়ীর বাহির হবার দরকার হ'লে—মনে কর জুনমাসের ভূমিকম্পে যেরূপ হ'য়েছিল, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু মহিলারা নিজেদেরকে যেরূপ রক্ষা করিতে পারিতেন, এখনকার স্ত্রীলোকেরা সেরূপ কিছুতেই পারিবেন না নিশ্চয়। শুনিয়াছি আমাদের পিতামাতামহীরা ভাঁড়ার ঘরে কত সাপ মারিতেন, কিন্তু এখন আমাদের একটা বিছা মারাও দূরে থাক, একটা আরসুলা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠি! এই সব দেখিয়াই কি স্বাধীন জীবনের সাহস ও উপকারিতা, আর পরাধীন জীবনের ভীরুতা ও অপকারিতা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না?

পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দেশ, ও সভ্য অসভ্য সব জাতি খুঁজিয়া দেখিলে আমার বোধ হয় বাঙ্গালীর মেয়ের পরাধীন অবস্থার ন্যায় এরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্য আর কাহারও জীবনে দেখা যায় না। আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মার্জ্জিত জাতিদের বাদ দিয়া, ভারতেরই অন্যান্য ও পাহাড়ী জঙ্গলা জাতি প্রভৃতির নারীর সঙ্গে হিন্দু মহিলাদের মিলাইয়া দেখিয়াছি বর্ত্তমান বঙ্গনারীদের অবরোধ-জীবন অতীব শোচনীয় ও কুফলদায়ক। কোন দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষরূপে জানিতে হ'লে আমরা সেই দেশের সাধারণ লোকেদের আচার ব্যবহার উত্তমরূপে দেখিয়া থাকি। পিতারা কন্যাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, পুত্রেরা মার উপর কি রকম শ্রদ্ধা ভক্তি করে, স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ চলিত, ভ্রাতারা ভগিনীদের কত মান্য করিয়া চলে, আর সমস্ত সাধারণ পুরুষ সাধারণ নারীদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখে, এই সব রীতি-নীতি পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা সেই জাতির প্রকৃত

সাংসারিক ও সাধারণ জীবনের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতির নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং হিন্দু মহিলাদের স্বাধীনতা আলোচনাকালে প্রথমে আমরা তাদের গার্হস্থ্য জীবন দেখিব।

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, দুচারিটী পরিবার বাদ দিলে, প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী গৃহেই স্ত্রীজাতি হীনভাবে আচরিত হয়। আর, সকল দিক দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাঙ্গালী স্ত্রীদের অবস্থা দিন দিন আরো মন্দ হইয়া দাঁড়াইতেছে! হয় ত আমার এ কথা পড়িয়া কোন পাঠক বলিয়া উঠিবেন—বাপ্ রে! ঠাকরুণদের আর কিছুতেই মন উঠে না!— আমাদের মা ঠাকুরমারা পচা নারিকেল তৈল মাখিয়া ও মেটে জমিতে বসিয়া দিন কাটাতেন, এখন এঁদের এসেন্সের গন্ধে ও চেয়ার সোফার ভিড়ে ঘর জম্ জম্ করে, তবু কিনা বল্‌ছেন, বর্ত্তমান নারীদের জীবন আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! কিন্তু বাস্তবিক এ হাসি তামাসার কথা নয়; আর যিনি গন্ধদ্রব্য ও আরামের জিনিসে প্রকৃত সুখ ও উন্নতি মনে করেন, তাঁর জন্যও আমি এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

যে নারীজাতির উপর হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সেই স্ত্রীলোকদের অবস্থা এদেশে যে ক্রমশঃ আরো শোচনীয় হইতেছে, তাহা কি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অস্বীকার করিতে পারেন? মূর্খ, বিদ্বান্, আমরা যে লোকদের সংসারে যাই, সেইখানেই দেখি—জননীর প্রতি পুত্রের অভক্তি, কন্যাদের প্রতি পিতার অবহেলা, ভগিনীদের উপর ভ্রাতাদের অনাস্থা, স্ত্রীর উপর স্বামীর ঘৃণা—ঘরে ঘরে থাকিয়া মনান্তর নামে গর্জ্জন করিতেছে। পুরুষদের তুলনায় বাঙ্গালীর মেয়েরা অতি অল্প শিক্ষিত, তাহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সেই সামাজিক দোষের জন্য নারীজাতির অপমান করা কি ভদ্রের উচিত?—না জ্ঞানীর কর্ম্ম? আমেরিকা ও ইংলণ্ডের দুদশজন বাদ দিলে কোন দেশের স্ত্রীলোকেরাই পুরুষের সমান বিদ্যাশিক্ষা করে না। আর আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কেবল বিদ্যাতেই মানুষের মন দৃঢ় ও চৌকোস হয় না। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ জ্ঞান চাই, বাহিরের অভিজ্ঞতা চাই, তবে ত মানবজীবন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত, সাহসী ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রকৃত জ্ঞান পাইবার উপায় বন্ধ, সে দেশের স্ত্রীলোকদেরকে আমরা কি প্রকারে সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর হইবার আশা করিতে পারি?

অনেকে বলিবেন, আজকাল ভারতবর্ষের ব্রাহ্মদের মধ্যে ত স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকটা চলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত তেমন সুফল দেখা যাইতেছে না। যাঁহারা স্বাধীনতার ব্যবহার জানেন না, তাঁহাদের পরবশ থাকাই শ্রেয়। অবশ্য, যখন আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতারা স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন ও নিজ নিজ স্ত্রীকন্যাদিগকে উহার ফল ভোগ করিতে দিতে উৎসুক, তখন একদিন না একদিন আমরা উহার সুফল পাইবই। কিন্তু সকলের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যে স্বাধীনতা ইংরেজ মহিলারা শত শত বৎসরের পরিশ্রম, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে পাইয়াছে, আমরা এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যেই সেরূপ অবাধ স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হই নাই। মানুষ এক দিনে চলিতে শিখে না, পাখীরা একবারে উড়িতে পারে না। চলিবার ও উড়িবার আগে জননীরা শিশুশাবকদিগকে যে কত যত্নে ও কত কষ্টে দাঁড়াইতে বা পাখা মেলিতে শিখায়, তাহা বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন। সেইরূপ স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত করিয়া হিন্দু মহিলাকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিন—দেখিবেন, তাহারা আর পড়িয়া যাইবে না।

জীবনের দৃশ্যমালা।

ইংলণ্ডে "বঙ্গমহিলা"র লেখিকা-প্রণীত।

কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন
দাস যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তাহাদের জীবন সংসারের ঠিক উপযুক্ত স্থানে অটল, অচল পাহাড়ের ন্যায় থাকিয়া গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, সন্তানদের শিক্ষক হবে ও স্বামীপুত্রদের সহায় হবে।

আবার এই বহুকাল আটকজীবনের ফলে ভারতে কেবল নারীজাতিই যে দুর্ব্বল, ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাহা নহে। হিন্দুদের এই অর্দ্ধক্ষয়প্রাপ্ত জীবনের মূলেও আমরা এই পরাধীনতার শিকড় দেখিতে পাই। অনেকেই নজর করিয়া থাকিবেন, হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া যাইতেছে। তাহাদের শরীরে সে জোর নাই, মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই, জীবনে সে উদ্যম নাই। সকল কাজেই তাহারা অনাস্থা দেখায়, সকল বিষয়েই যেন অবহেলা করে। এরূপ নিরুদ্যম, নিঃসাহস অবস্থায় আর কতকাল আমরা জীবন-যুদ্ধ করিতে পারিব?

দেশের অকালমৃত্যুর মূলেও আমরা হিন্দুনারীর এই পরাধীন জীবনের প্রভাব দেখিতে পাই। জন্মমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া জানিয়াছি, এদেশে যত শিশু জন্মায়, তার অর্দ্ধেক পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারা পড়ে! ইহা কি শোচনীয় বিষয়! যেমন একটী সুন্দর গোলাপচারা কোন মন্দ ভূমিতে রোপিলে তাহা শীঘ্রই মরিয়া যায়, সেইরূপ গৃহাবদ্ধ জননীর দূষিত দুগ্ধপানে শিশুফুলটি অচিরেই শুকাইয়া যায়। এরূপ হাজার হাজার উদাহরণ আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অকালমৃত্যুর রোদনে কোন্ গৃহ না আকুলিত হইয়াছে?

এখন আমরা এই সব উদাহরণ ও প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, স্বাধীন-জীবন জগতের যেমন কল্যাণকর, পরাধীন জীবন সেইরূপ অপকারী। স্ত্রীলোক ও পুরুষ এই দুই জাতি লইয়াই মানব-সংসার গঠিত। পরমপিতা জগদীশ্বর জগতের এই দুই জাতিকে এরূপভাবে সৃজিযাছেন ও পরস্পবকে এরূপ সাহায্যসাপেক্ষ করিয়াছেন যে একটির অভাবে অন্যটি ফুটিতে বা বাড়িতে পারে না, এমন কি খাটিতেও অপারগ। যে জাতির মধ্যে সমাজের এই দুটি অঙ্গই সম্পূর্ণ মিলিয়া কাজ করে—সেই জাতিই শীঘ্র সকলের উপর উঠিতে পারে। আর যাহাদের মধ্যে কেবল একটি অঙ্গ অবাধে খাটিবার অবসর পায়, কিন্তু অন্যটি কোন কাজেই অগ্রসর হতে অপারগ—সে জাতি খোঁড়া মানুষের ন্যায় সকলের নীচে বা শেষেই পড়িয়া থাকে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সংসারে অসীম অধিকার ও প্রশস্ত কর্ম্মভূমি আছে—দুজনে সমভাবে খাটিবে সত্য—অথচ দুজনের কাজ এরূপভাবে বন্দোবস্ত করা, যে, তাহাতে বিবাদ কলহ আসিয়া বিশৃঙ্খলা আনিবার যো নাই।

আমার আশা ছিল, সমাজ-বিবর্ত্তনের গতির সঙ্গে ক্রমে হিন্দুনারীদের অবরোধপ্রথাও একেবারে দূর না হয়, কিছু শিথিল হইয়া আসিবে ও তাহারা জীবন-ক্ষেত্রে খাটিবার অবসর পাইবে। আর ঐ কার্য্যের সঙ্গে তাহাদের মন অধিকতর মার্জ্জিত ও উন্নত হবে, হিন্দু স্ত্রী আবার সর্ব্বত্র পূজিত হবে। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি আমাদের দেশের নারীজীবনের গতি ক্রমশঃ সুমুখে না চলিয়া আবার পিছু হাঁটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেজন্য আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে—এ সঙ্কটকালে কেহ হাতেকলমে লাগিবা তাদের এ উল্টাগতি ফিরাইয়া না দিলে আর আমাদের উপায় নাই।

প্রদীপ, ফাল্গুন ১৩০৪

আজকালকার স্কুলের ছেলেরা

যিনিই অধিক দিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়াছেন, তিনিই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, আমাদের দেশের ছেলেরা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে। আমি সাধ্যমত এই বালকচরিত্রের অধোগতির কারণ দর্শাইতে চেষ্টা করিব।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উদার লোকের বহু আয়াসে ও যত্নে এদেশে যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রথম প্রচলিত হয় ; পরে ঁ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেশীয় ছাত্রদিগকে সুলভ শিক্ষাদানের জন্য ৩্ টাকা বেতনের স্কুল ও কলেজ খুলেন ; তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, এই অমূল্য বিদ্যারত্ন আজকালকার বালকমণ্ডলীর কাছে সামান্য পণ্যের ন্যায় গৃহীত ও অবহেলিত হইবে।

আমাদের দেশে প্রথম যখন ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুবালকদের আয়ত্তে আসে, তখনকার অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদের সেই বহু আয়াস ও পরিশ্রমলব্ধ শিক্ষা দ্বারা প্রগাঢ় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লভিয়া দেশের ও দেশবাসীদের মহা কল্যাণ সাধিয়া গিয়াছেন। ঁঅক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ প্রভৃতি মহাত্মাদের পুস্তকগুলি এখনও আমাদের বিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু হায়! তাঁহাদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্র সব এখন কোথায়?

হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গ বালকদের কাছে বিদ্যালয় এখন যেন দোকান মাত্র—যেখানে কয়েক বৎসর কিছু কিছু অর্থ দিয়া (সাধ্যমত যত সস্তায় হয়) দুই একটি 'পাশ' কিনিতে পারিলে কোন আফিসে একটি চাকরী মিলিবে—এই তাদের স্কুলে পড়ার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য। অবশ্য, আমাদের এ অবনত অবস্থার মধ্যেও দু একটী পরিশ্রমী ও জ্ঞানোৎসাহী ছাত্র এখনও দেখা যায়, কিন্তু আমি সে দুচারজনের কথা বলিতেছি না—হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন ছাত্রের বিদ্যায আলস্য, অনাস্থা ও অবহেলাতে দেশের মহা অপকার হইতেছে, তাহাদেরই বিষয় লিখিযা হৃদযবান্ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বদেশের একটি অন্তর্ব্যাধির কারণ দেখাইতেছি।

প্রাইভেট স্কুল বাদ দিয়া গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় সমূহেও দেখা গিয়াছে, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদেরকে যথার্থ বিদ্যা শিখাইতে ও নিয়ম রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেইখানেই ছাত্র সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আর যে যে শিক্ষালয়ে বালকদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই সেই স্কুলেই ছেলের ভিড় হয়ে থাকে। বালকদের এইরূপ শিথিল অভ্যাস দেখিয়া আজকাল অধিকাংশ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা বিদ্যালয়ের নিয়ম সব শিথিল করিয়া দিয়াছেন। ছেলেরা যখন ইচ্ছা স্কুলে যায়, যখন ইচ্ছা চলিয়া আসে, পড়া করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ে আচরণ যেরূপই হউক, প্রহার বা কোনরূপ শাস্তির ভয় নাই। আমাদের দেশের গৃহগুলি ছোট ছেলেদের পক্ষে যে রকম শৃঙ্খলাশূন্য ও অশিক্ষার স্থান, সেখানে শৈশবকাল থেকেই তারা কোনরূপ শাসন বা দমনে অভ্যস্ত হয় না ; সে কারণে বিদ্যালয়গুলিকেও তারা সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অনাটক দেখিতে ইচ্ছা করে। যে যে শিক্ষালয়ের কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ত্তৃপক্ষরা তাদের এই শিথিল অভ্যাসে প্রশ্রয় না দেন, সেই সেই পাঠাগারের প্রতি তাদের

মহা কোপ ও বিদ্বেষ দেখা যায়। কোন গুরুতর অপরাধের জন্য যদি কোন বালক দণ্ডিত হয়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ অভিভাবকের কাছে স্কুলের নামে অভিযোগ করে, আর সে, সে স্কুলে আর পড়িবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞাও করে। দুর্ব্বলহৃদয় অভিভাবকও, তাকে অমনি ট্রান্সফরের (transfer) চিঠি দিয়া জন্মের মত ছেলেটির বিদ্যার দফা রফা করিয়া দেন!

ইহা কার্য্যতঃ জীবনে দেখা গিয়াছে যে, কোন ভাল কাজই বিনা পরিশ্রমে, বিনা শিক্ষায় বা বিনা কষ্টে লাভ করা যায় না। সামান্য মুটে মজুরের কাজ ছাড়া সকল কর্ম্মেই প্রথমে কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষা ও শাসনের প্রয়োজন ; নহিলে প্রতি পদে পড়িয়া যাইতে হয়। সেই জন্যই গবর্ণমেন্ট ও অধিকাংশ মার্চেন্টের আফিসে তিন বৎসর অ্যাপ্রেন্‌টিস্ (apprentice) খাটাইয়া তবে নিযুক্ত করে। আর আমাদের বঙ্গবালকেরা মনে করেন যে—বিনা শিক্ষায়, বিনা পরিশ্রমে ও বিনা শাসনে,—কেবল মাসে মাসে তিনটী করিয়া টাকা দিয়াই দশ বৎসর পরে—তাঁরা এক একটী বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া স্কুল হতে বাহির হবেন।

এখনকার অধিকাংশ ছাত্রই কি প্রকারে শিক্ষিত হইয়া থাকে দেখুন। অতুলের বয়স সাত বৎসর, সে বাড়ীতে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াছে, তাকে এখন স্কুলে ভর্ত্তি না করিলে আর চলে না। তার পিতা কোন আফিসে ১০০ টাকা বেতন পান। তিনি পুত্রটীকে লইয়া পাড়ায় দুই তিনটী স্কুলে ঘুরিলেন—বিদ্যালয় অনুসারে আট আনা থেকে দুই টাকা পর্য্যন্ত ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসের মাহিনা। তিনি আট আনার স্কুলেই তাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—এত ছোট ছেলের জন্য বেশী মাহিনা দেওয়া পয়সা নষ্ট মাত্র।

চার পাঁচ বৎসর মাঝামাঝি পরীক্ষা দিয়া অতুল ক্লাসে উঠিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার পড়ায় মন কমিয়া আসিল। ফিফ্‌থ ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষায় সে একেবারেই ফেল। স্কুলের হেডমাষ্টার তাকে প্রমোশন দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সে মায়ের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া পিতার কাছ থেকে এক চিঠি হাজির করিল। মাষ্টার বাবু কি করিবেন, অভিভাবকের উপর দায়িত্ব দিয়া তাকে ক্লাসে উঠাইয়া দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়া বসিল ও সমপাঠীদের উপহাস থেকে এযাত্রা রক্ষা পাইল।

পর বৎসর সে শিক্ষায় আরও অমনোযোগী হইয়া স্কুল কয়েদখানার মত ভাবিল, আর মাসের মধ্যে ১৫ দিন কোন না কোন অছিলায় অনুপস্থিত থাকিল। তাহার এই আলস্য ও অনুপস্থিত থাকার কথা অভিভাবক শুনিলেও তিনি তার কোন প্রতিবিধান করিলেন না। এবার পরীক্ষায় সে সব বিষয়েই অতি কম নম্বর রাখিয়া সব নীচে পড়িল ও অনেক মিনতি করিয়াও প্রমোশন পাইল না। তখন সে অভিভাবকের কাছে স্কুলের নিন্দা আরম্ভ করিল। আজ পাঁচ ছয় বৎসর যিনি পুত্রের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই বা সন্তানকে শাসেন নাই, আজ তাহারই বাক্যে তাঁহার চোক ফুটিল! তাই ত, তাঁর এমন পরিশ্রমী ও শিক্ষায় মনোযোগী ছেলে বৎসর বৎসর ফেল হচ্ছে, ইহার কারণ কি? নিশ্চয় ও স্কুলের দোষ। থাক্, ও স্কুলে আর পড়িয়া কাজ নাই। যাও বাবা, তুমি ট্রান্সফর লইয়া অন্য স্কুলে যাও।

ভ্রমান্ধ অভিভাবকের কাছে তিরস্কার বা প্রহারের পরিবর্ত্তে এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া এ জন্মের মত অতুলের প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা উঠিয়া গেল। সে প্রতিবৎসর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েও বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রমোশন পাইতে লাগিল। ক্রমে এন্ট্রেন্স ক্লাসে উপস্থিত।

এখানে ত আর চালাকি খাটে না, ও কাহারও চোকে ধুলা দিবারও যো নাই। ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে যে অতুল শিক্ষক ও অভিভাবককে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, এখন সে নিজেই ফাঁকে পড়িল। তিন চারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে অতুলবাবু এক আফিসে ১৫ টাকায় আপ্রেন্টিস্ খাটিতে প্রবেশ করিল।

পিতার কত আশা ভরসা ও উৎসাহ যে পুত্রের শিক্ষা ও উপার্জ্জনের উপর ছিল ; নিজের দৃঢ়তা ও উপযুক্ত শাসন অভাবে সে সব মাটি হয়ে গেল! বড় জোর ৩০ টাকার কেরাণীগিরি অতুলের ভাগ্যে জুটিবে। এখনকার বালকদের, বিশেষতঃ কলিকাতার অধিকাংশ ছাত্রদেরই শিক্ষা ও জীবন এইরূপে শেষ হয়। ক্রমে তাঁরাই আবার অভিভাবক হন, ও পুত্রদের উপর আরও অনাস্থা দেখাইয়া থাকেন! এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকদের হ'তে আমরা আর কি আশা করিতে পারি? আমরা কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না যে দেশীয় লোকদের নৈতিক চরিত্র কত নীচ সোপানে নামিয়া পড়িয়াছে? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বালকেরা একটী মিথ্যা কথা বলিতে সঙ্কুচিত হত, এখন তাঁদেরই সন্তানেরা প্রত্যহ কত মিথ্যা কথা বলিয়া পাঠ ও প্রহার হতে অব্যাহতি লাভ করে। শিক্ষালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও মাষ্টারদের প্রতি আর তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই ; এমন কি, অনেক সময়ে তাহারা শিক্ষকদের অপমান পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।

এখন মনে করুন, অতুলের বিদ্যা শিক্ষার এই পরিণাম কি কেবল তার নিজের দোষেই হইল? অবশ্য তাহা নয়। সে বালক মাত্র। সে নিজের ভাল মন্দ কি জানে? প্রহারের ভয় ও পরিশ্রমে অবহেলা সব দেশের ছেলেদেরই ত দেখা যায়। তবে অন্যান্য স্থানের বালকেরা ত বঙ্গবালকদের মত শিথিল, দুর্ব্বল ও চরিত্রহীন মানুষ হয়ে দাঁড়ায় না। ইউরোপ, আমেরিকা ত দূরের কথা ; আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান ও খৃষ্টান বালকেরা ত হিন্দু ছাত্রদের ন্যায় এত অদম্য হয়ে উঠে নাই—ইহার কারণ কি?

কারণ—খ্রীষ্টান ও মুসলমান অভিভাবকেরা আমাদের বঙ্গপিতাদের মত এত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক নহেন ; আর খৃষ্টান ও মস্‌লেম বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষরা ছাত্রদেরকে অত প্রশ্রয় দেন না। তাদের মধ্যে সমস্ত স্কুলেই এক রকম শিক্ষা, নিয়ম ও শাসন প্রচলিত; সকলগুলির মধ্যেই একটা অন্তর্গত একতা ও সহকারিতা (co-operation) আছে। যে বালক কোন নিয়ম ও শাসনের বশীভূত থাকিতে না পারে, সে কোন স্কুলেই ভর্ত্তি হতে পারে না, সুতরাং দায়ে পড়িয়াও সে বিদ্যা শিখিতে ও দমনে থাকিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া, ফিরিঙ্গী ও মুসলমান অভিভাবকদের নিজ নিজ জাতীয় শিক্ষালয়গুলির উপর শ্রদ্ধা ও উহার কর্ত্তৃপক্ষদের উপর বিশ্বাস আছে। তাঁরা জানেন, স্কুল থিয়েটার নয়—শিক্ষার স্থান; সেখানে নিয়মে ও শাসনে না থাকিলে ছেলেটি কোনক্রমেই চৌকষ মানুষ হতে পারিবে না। সে কারণে তাঁরা বিদ্যালয়ের শাসনের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বনাশ করেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে পরস্পরের উপর এ ভক্তি ও বিশ্বাস নাই। হিন্দু অভিভাবকেরা আজকাল মনে করেন—স্কুল সকল দোকানের মত—বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা দোকানদার স্বরূপ—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা দূরে থাকুক, তাচ্ছিল্য ভাব দেখানই যেন

উপযুক্ত কাজ। ক্রমে এই ভাবটী অভিভাবক হতে ছাত্রদের মনে আসিয়াছে, এবং ইহাতেই আমরা বালকমণ্ডলীর অধোগতির প্রধান কারণ দেখিতে পাই। বাস্তবিক কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্যই অধিক বা সস্তা পাইলে কেহই উহার মূল্য বুঝিতে পারে না ও উহার আদরও করে না। কয়লার দামে হীরা লভিলে কেহ কি আর যত্ন করিয়া উহাকে মুকুটে তুলিবে, না লোহার সিন্দুকে রাখিবে? তখন উহা ছাইয়ের সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের স্কুলগুলিও এখন সেইরূপ কয়লার দামে হীরার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

বিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষার স্থান ; সেখানে উপযুক্ত বিদ্যা শিখাইয়া ও শাসনে রাখিয়া ছেলেদেরকে 'মানুষ' করা উহার উদ্দেশ্য। ঐ কার্য্য যে কত গুরুতর, ও ঐ উদ্দেশ্য যে কত মহৎ, তাহা আজকাল স্কুলের অনেক কর্ত্তৃপক্ষরাই যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। নিজেদের ঐ মহৎ কার্য্যের যোগ্য জ্ঞান, শক্তি ও অভিজ্ঞতা আছে কি না তাহা না ভাবিয়াই যাঁর ইচ্ছা এক এক খেয়ালের বাধ্য হয়ে স্কুল খুলিয়া বসেন। আর ছাত্র জুটাইবার জন্য বাড়ী বাড়ী দালাল পাঠাইয়া ছেলে যোগাড় করেন। অনেক ফ্রি ও হাফ ফ্রি ছাত্রে স্কুল ভরিয়া যায়। অধিক কি, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষরা পর্য্যন্ত অভিভাবকদের নিকটে গিয়া মিনতি করিতে লজ্জাবোধ করেন না ; আবার এরূপও দেখা যায়—এক স্কুলের শিক্ষকেরা অন্য স্কুলের কুৎসা গাইয়া অভিভাবকদের মন ভাঙ্গাইয়া দেন—ইহা কি দোকানদারী অপেক্ষাও নীচ ও ঘৃণার কাজ নয়?

এরূপে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া যে সকল স্কুল চালিত হইতেছে, সেখানে বালকদের মধ্যে নিয়ম ও শাসন কখনই রাখা যাইতে পারে না। স্কুল বিদ্যাশিক্ষার জন্য—সেখানে সন্তানকে পাঠাইয়া শিক্ষিত করুন, ভবিষ্যতে আপনারই ভাল হবে ; না করুন, আপনারই মন্দ—প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা নিজেদের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া অভিভাবকদের মন থেকে ঐ উচ্চ ভাবটিও তাড়াইয়া দিয়াছেন। কাজেই উহার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও চলিয়া গিয়াছে। তাঁরা মনে করেন নিজ নিজ সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাঁরা কর্ত্তৃপক্ষদেরকে চির ঋণে বদ্ধ রাখেন—এস্থলে তাঁদের কাজের উপর ক্ষমতা চালানতে গার্জ্জেনদের যেন স্বাভাবিক অধিকার আছে। বালকদের শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্ত্তে শুধু অর্থলাভই যে স্কুলের উদ্দেশ্য, সে স্কুলের প্রতি ছাত্র ও অভিভাবকদের সহজেই অভক্তি ও অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা। আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ই যখন এরূপে শিক্ষালয় নামে কলঙ্ক দিতেছে, তখন দুএকটি উচ্চ আদর্শের বিদ্যালয়ের বহু যত্ন ও পরিশ্রমেও কোন ফল দর্শিতেছে না।

আমি শুনিয়াছি, কলিকাতার স্কুল সকলের ন্যায় মফস্বলের বিদ্যালয় সকল এতদূর অধোদিকে আসিয়া পড়ে নাই। সেখানে শিক্ষালয়গুলিতে বালকদের বিদ্যাশিক্ষা ও শাসন কিছু ভালরূপে চলিয়া থাকে। কিন্তু দু এক স্থানের রিপোর্ট দেখিয়া জানা যায়, আজকাল মফস্বলের বালকেরাও কলিকাতার ছাত্রদের অনুকরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। সময়ে দমিত না হলে তারাও যে সহরের ছেলেদের মত অধঃপাতে যাবে তার সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয় ও ছাত্রসমূহকে এ অধোগতি হতে উদ্ধার করিতে হলে, এখন আমাদের

দেশের সমস্ত প্রাইভেট স্কুলগুলি একজোট হইয়া উহার সংশোধন ও সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক। সকল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা যদি এক হইয়া সবগুলিতেই এক রকম নিয়ম, শিক্ষা ও শাসন চলিত করেন, তাহলে আর বালকেরা স্কুলকে দোকান ভাবিয়া ক্রমাগত এক স্কুল হতে অন্য স্কুলে যাইতে পারিবে না। সব স্থানেই যদি মন্দ বালকদের প্রতি একরূপ নিয়ম ও দণ্ড বিধান হয়, তা'হলে পাঠশালা বদলাইয়া আর তারা উপযুক্ত শাসন হতে অব্যাহতি পাইবে না ও আলস্য ও অজ্ঞতায় দিন কাটাইতে পারিবে না। তারা দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম করিতে ও বিদ্যা শিখিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু আমাদের এ চিরদুর্ভাগ্য দেশে আমরা কি সে আশা করিতে পারি? আমাদের স্বদেশীয় কৃতবিদ্যরা আজকাল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া পাগল হইয়াছেন। যিনিই উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান লভিয়াছেন, তিনিই রাজনীতির নিশান ধরিয়া নিজ নিজ জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন! তাঁদের উচ্চ মনে এ সামান্য কথাটুকুও স্থান পায় না যে, যে দেশের চারিদিক দিন দিন অন্ধকারে ছাপিতেছে—গরীবেরা দুর্ভিক্ষের অন্ধকারে, ধনীরা স্বার্থের অন্ধকারে, শিক্ষিতেরা অনৈক্যের অন্ধকারে, ছাত্রেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে, প্রাচীনেরা কুসংস্কারের অন্ধকারে ও স্ত্রীলোকেরা অবরোধ-অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে—সে দেশে রাজনীতির প্রদীপ জ্বালিলেও উহা অচিরে নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আগে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা এক জোট হতে শিখুন, বিদ্যালয় সকল সংশোধিয়া প্রকৃত শিক্ষার স্থান করুন, দেশের ভবিষ্যত আশা বালকেরা যথার্থ জ্ঞানলাভে চরিত্রবান্ হউক, স্ত্রীলোকেরা জীবনের উদ্দেশ্য বুঝুক, দেশে জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হউক—তখন দেখিবেন, মানুষের যোগ্য স্বত্ব সকল ক্রমে ক্রমে আমাদের হস্তগত হবে। নহিলে, এখন এ 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো' আনিয়া দরকার কি? গবর্ণমেন্টের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র।

প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

বিলাতে সন্তানশিক্ষা

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় পুত্রকন্যাদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা এদেশে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের মধ্যে অনেক চাকর চাকরাণী দেখিয়া মনে করি বিলাতেও বুঝি ঐরূপ। এদেশবাসী ইংরেজদের মধ্যে প্রতি বড় সংসারেই এক এক জন ইউরোপীয় গবর্ণেস (Governess) ও তার নীচে দুই তিনজন দেশীয় বেহারা ও আয়া ছেলেমেয়েদের জন্য নিযুক্ত থাকে—সুতরাং সন্তানদের পালন ও শিক্ষার প্রতি মায়েদের বড় একটা মনোযোগ দেখা যায় না।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা দেখা যায়। সেখানে বেশি লোকজন রাখিতে অনেক টাকার দরকার, অত্যন্ত ধনীরাই সেরূপ বাবুয়ানা করিতে সক্ষম। সেজন্য, গৃহস্থ লোকদের সংসার ও সন্তানের ভার জননীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিলাতের গৃহিণীরাও এবিষয়ে অজ্ঞ নহেন। সুস্থ ও সবল দেহের দুগ্ধে তাঁহারা সন্তানের শরীরকে যেমন জোরাল করিয়া তুলেন, শিক্ষিত মনের উন্নতভাবে শিশুর হৃদয়কেও তদনুরূপ তেজাল করেন। আমরা এই শিশু চারা দেখিয়াই বুঝিতে পারি, ভবিষ্যৎ জীবনে ইহা কিরূপ সতেজ বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে।

শিশু একমাসের হইলেই মা তাকে কোলে বা টানাগাড়িতে লইয়া বেড়াতে যান। প্রত্যহ সকালে এক ঘণ্টা ও বিকালে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরিষ্কার বায়ু সেবনে জননী ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ভদ্রমহিলাদের এরূপে প্রকাশ্য স্থানে বেড়াইবার উপায় নাই, কিন্তু অধিকতর দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সন্তানদেরকেও বড় একটা বাড়ীর বাহিরে পাঠাতে ভালবাসেন না। নির্ম্মল বায়ুসেবন সুস্থ দেহগঠনের পক্ষে যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে না পারাই বোধ হয় তাঁহাদের এরূপ আচরণের কারণ।

এইরূপে প্রথম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চার পাঁচ বৎসর মার সঙ্গে বেড়ান ও মার কাছে শিক্ষার মধ্যেই শিশুর বাল্যজীবন ফুটিতে থাকে। আজকাল অতি অল্পবয়স্ক শিশুদের জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই কিণ্ডরগার্টেন স্কুল খোলা হইয়াছে ; এজন্য ঐরূপ ছোট ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত বাড়ীতে কিণ্ডরগার্টেন করিবার সুবিধা না হ'লে পিতা মাতারা এই সময় হ'তেই সন্তানদেরকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিণ্ডরগার্টেন শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বহুদিন পূর্ব্বে 'ভারতী' ও 'সখা'-তে দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম,* সুতরাং সে বিষয়ে এখানে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। উপযুক্ত বয়সে কার্য্যতঃ শিক্ষার (Practical Education) ন্যায় শিশুজীবনকে জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মপটু করিয়া তুলিবার পক্ষে উহা একটি প্রধান সাধন। যে শিক্ষায় মনের সঙ্গে হাতেরও চালনার দরকার তাহাই মানুষের জীবনে অধিক ফলদায়ক। ইউরোপীয়েরা উহার উপকারিতা এখন উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন ও সেই অনুসারে কাজ করিতেছেন—তাই তাদের জীবনে এত দ্রুত উন্নতি

* [দ্র. বর্তমান সংকলনের পৃ. ৪৯-৫৬। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা বিষয়ে কৃষ্ণভাবিনীর অন্য কোনো প্রবন্ধ 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।]

ঘটিতেছে। আমাদের কিন্তু ওরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পুত্রকন্যাদের সাত আট বৎসর পূর্ণ হ'লেই ইংরেজ পিতামাতারা তাহাদেরকে কিণ্ডরগার্টেন থেকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠান। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল ইংলণ্ডে অনেক আছে। সবগুলিই অতি সুশিক্ষিত হেডমাষ্টার বা হেডমিষ্ট্রেসের দ্বারা চালিত। শিক্ষকেরা অধিকাংশই অভিজ্ঞ ও উপাধিধারী। ঐ সব বোর্ডিং স্কুলে বালকবালিকারা অতি উত্তম নিয়ম ও শাসনের মধ্যে থাকে। আমাদের দেশীয় পিতামাতারা হয় ত ভাবিবেন, বিলাতের বাপমায়েরা বড় স্নেহহীন, অত অল্পবয়স্ক সন্তানদিগকে পরের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু উহা আপাততঃ কিছু নির্ম্মম বোধ হ'লেও উহার ফল অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি সুচালিত বিদ্যালয়ে বালক বালিকারা যেমন সকল বিষয়ে চৌকস জ্ঞান লভিতে পারে, গৃহে পিতামাতার কাছে বা শিক্ষক রাখিলেও ওরূপ শিক্ষা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। বাড়ীর শিক্ষা প্রায় পক্ষপাতী হইয়া থাকে ; অতিরিক্ত স্নেহের বলে পিতামাতা অনেক সময় সন্তানদের দোষগুণ ঠিক বিচার করিতে সক্ষম হন না ; সেজন্য ঘরে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা প্রায় একগুঁয়ে ও আত্মম্ভরী হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে অনেক একবয়সী ছাত্র একত্র থাকায় কর্ত্তৃপক্ষরা তাহাদের দোষ গুণ ভাল করিয়া দেখিতে পান ও সেই অনুসারে শাসন করেন। আর পরের কাছে থাকায় লজ্জা বা ভয়বশতঃ বালকেরা নিজ নিজ মন্দ বৃত্তিগুলি জানিতে শিখে, ও আড়াআড়ি বশতঃ তাহাদের সৎবৃত্তি সকল আরো উৎকর্ষ লাভ করে।

১৫/১৬ বয়স পর্য্যন্ত ইংরেজ সন্তানেরা বোর্ডিং স্কুলে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে পুত্রেরা কিরূপে অধিক শিক্ষিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থার অধিকতর উন্নতি করিবে, সে বিষয়ে ইংরেজ পিতারা অত্যন্ত যত্ন লন। আজকাল পুত্রদের ন্যায় কন্যাদেরকেও উচ্চশিক্ষা দিয়া বড় কাজের যোগ্য করিবার জন্য পিতামাতার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। সন্তানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজ অভিভাবকেরা অকাতরে ব্যয় করেন। পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হ'বেন—প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁর আয়ের চতুর্থাংশ, কখন কখন তার চেয়েও বেশি অর্থ, সন্তানদের শিক্ষার জন্য জমাইয়া রাখেন। যাঁর মাসে ৩০০্ টাকা আয়, তিনি প্রতিমাসে ১০০্ টাকা সানন্দে পুত্রের স্কুল খরচ দেন। তাঁহারা মনে করেন সন্তানদের বিদ্যার জন্য অর্থব্যয় করা জীবন-বিমাতে (Life Insurance) প্রিমিয়ম (Premium) দেওয়ার মত। যত অধিক অর্থব্যয় করিয়া পুত্রকে যত অধিক শিক্ষিত করা যায়, সে যোগ্য হয়ে তত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক গৃহস্থ পিতা বা বিধবা মাতা সংসারের অনাটন করিয়াও মাসে মাসে ৩০০্ টাকা ব্যয়ে ছেলেকে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের জন্য পড়াইয়া থাকেন। কারণ, কিছুদিন পরে ঐ ছেলে মাসে ২০০০/৩০০০্ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

সন্তানদেরকে ইংরেজ পিতামাতার এইরূপ উচ্চশিক্ষিত করিবার আগ্রহবশতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজ খোলা হইয়াছে। কোন গ্রাম বা নগরেই বিদ্যাচর্চ্চা বা শিক্ষার উপায়ের অভাব নাই। ঐ সকল স্কুল ও কলেজগুলির সুবন্দোবস্ত দেখিলে কোন বিদ্যাভিলাষী লোক সুখী না হয়ে থাকিতে পারেন না। সেদেশে কেহই কোন স্কুল বা কলেজ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, অধিকাংশ বিদ্যালয় কোন ধনী বা

সাধারণ লোকের দ্বারা স্থাপিত। অথচ কোন বালক বা বালিকাকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার নিয়ম নাই—কেন না, তাহারা জানে ভাল দ্রব্য বিনা পয়সায় পাইলে লোকে তাহার মূল্য বুঝিতে পারে না বা আদর করে না। আমাদের দেশের প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলি হইতেই আমরা তার প্রমাণ পাইতেছি। এদেশে শিক্ষিত লোক মাত্রেই বুঝিতে পারেন ও ছাত্রেরা নিজেও স্বীকার করেন যে কলিকাতার দুই চারটি প্রাইভেট কলেজের লেক্‌চার আজকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, তথাপি, কেবল ছাত্রবেতনের তারতম্য বশতঃ লোকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের আদর ও প্রাইভেট স্কুল কলেজগুলিকে তাচ্ছল্য করিয়া থাকে। আবার বিলাতের কলেজে ওরূপ ফ্রিশিপ না থাকিলেও সেখানে সকল বিদ্যালয়েই অনেকগুলি করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয় ; তাহাতে দরিদ্র-সন্তানেরা বুদ্ধিমান ও বিদ্যায় মনোযোগী হলেই অক্লেশে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারে। তাছাড়া ইংলণ্ডে সকল শিক্ষালয়েই অনেক ফণ্ড থাকাতে তাহারা ছাত্রদের বেতনের উপর নির্ভর করে না, সেজন্য ছেলেদেরকে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম ও দৃঢ় শাসনের মধ্যে রাখিতে পারে।

বিলাতের বালকেরা ৩/৪ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ২৩/২৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্কুল ও কলেজে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নহে। ছাত্রজীবন শেষ হইবার পর তাহারা নিজে নিজে যে জ্ঞান লভিতে আরম্ভ করে, সেই জ্ঞানলাভই তাহাদের যথার্থ শিক্ষা। সে দেশের লোকে কলেজের শিক্ষা ও পরীক্ষা দেওয়াকে জ্ঞানভাণ্ডারের পথদর্শকস্বরূপ ভাবে, বিদ্যালয়ের পাঠের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান উপার্জ্জিতে হয় যেন তাহাই শিক্ষা করে ; পরে নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে নানা প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জ্জিয়া মনকে ভূষিত করে। স্কুল ও কলেজের পাঠের সময় কেবল সহাধ্যায়ীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব এই ভাবিয়া ছাত্রেরা উৎসাহের সঙ্গে পড়ে ও বিদ্যালয়ের ধারানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু কলেজের পাঠ ও পরীক্ষা শেষ হলে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশিবার জন্য যে কৌতূহল জন্মায় তাহাই যথার্থ শিক্ষার মূল, এবং ঐ মূল অবলম্বন করিয়া ইংরেজ যুবকেরা যথাসাধ্য জ্ঞানসঞ্চয়পূর্ব্বক নিজেদের ও স্বদেশের উন্নতি করে।

আর একটি কারণে বিলাতের ছাত্রেরা ইচ্ছামত জ্ঞান উপার্জ্জিবার সুবিধা ও সাহায্য পায়। সেটি ইংলণ্ডীয় পিতার পুত্রদের প্রতি মিত্রভাব ও সৌজন্য প্রকাশ, ইংরেজ সন্তানেরা বয়স প্রাপ্ত হলে পিতামাতা তাহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন ; তাঁহারা বুঝেন যে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে মানুষের সদসৎ বিবেচনার শক্তি জন্মায়, তখন তাহারা শৈশবকালের ন্যায় সমস্ত বিষয়ে পিতামাতার মতের বা ইচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চাহে না ; সেজন্য পুত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই পিতামাতা তাহাদেরকে ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিতে বলেন। যে সন্তানের যেরূপ কাজে মনোযোগ ও ইচ্ছা, পিতা তাহাকে সেইরূপ শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন ; যাহার যেরূপ জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা তাহাকে সেই জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তির উপায় খুঁজিয়া দেন। যাহার এঞ্জিনিয়ার হইবার ইচ্ছা, পিতা তাহাকে জোর করিয়া কখন ব্যারিষ্টার করেন না ; যে ডাক্তারি করিতে চায় শীঘ্র লাভের আশায় তাকে কেরাণী বানান না ; চিত্রবিদ্যায় যার অনুরাগ তাকে সওদাগর হবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না ; বিজ্ঞান শিখিতে যে ছেলের আগ্রহ তাকে আফিসে দেন না।

এইরূপ যৌবনাবস্থা হতেই বালকেরা যে যার মনোমত পাঠাভ্যাস বা জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারে বলিয়া বিলাতের লোকের যেরকম দ্রুত ও স্থায়ী উন্নতি হইতেছে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও তদনুরূপ প্রশস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কেবল বিদ্যা লইয়াই সমস্ত জীবন কাটান। গ্রন্থরচনা কোন কোন ব্যক্তির জীবনের ক্রীড়াস্বরূপ ; কেহ বা নূতন নূতন জ্যোতিষের আবিষ্কার করাকে একমাত্র সুখ বলিয়া গণনা করেন, নানাপ্রকার বিজ্ঞানের অনুশীলন কোন কোন লোকের চির সহচর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছেলেরা ৭/৮ বৎসর হলেই ইংরেজ পিতামাতারা তাহাদিগকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠান ; ইংলণ্ডে ভদ্র সন্তানদের জন্য এরূপ পাবলিক ও প্রাইভেট স্কুল অনেক আছে, তার মধ্যে 'হ্যারো' 'ইটন' ও 'রাগবি'[২০] এই তিনটি অতি পুরাতন ও অধিক প্রসিদ্ধ ; এখানে ছাত্রেরা বিদ্যার সঙ্গে নানাপ্রকার বলকর খেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা করে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, দাঁড়বহা প্রভৃতি সকল রকম ক্রীড়াতেই দক্ষ হয়। হ্যারো ও ইটন বিদ্যালয়ের মধ্যে অতিশয় আড়াআড়ি চলে ; এক স্কুলের ছাত্রেরা ভাল হলে অন্যটির অপমান হবে বলিয়া দুই দলেই প্রাণপণ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকটির ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে সমাজ করিয়া নানা বিষয় লইয়া পরস্পর তর্ক করে, এবং কি বিদ্যাশিক্ষা কি ব্যায়ামশিক্ষা সকল বিষয়েই আড়াআড়ি করিয়া সাধ্যমত উত্তমরূপে শিখে। আবার দুইটির মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ প্রত্যেকটির আরো বেশি উন্নতি হয়। দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট ও নৌকাদৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া হইয়া থাকে ; উহাতে যে স্কুলের জয় হয়, সেইটি কোন প্রকার পুরস্কার পায়, এইজন্য উভয় পক্ষেই ছাত্রদেরকে ঐ সকল বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে অত্যন্ত যত্ন লয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালী বালকদেরকেই ইংরেজ বালকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু বঙ্গীয় বালকেরা চতুর ও বুদ্ধিমান হলেও অপরিণতত্ব বশতঃ অনেক শারীরিক ও মানসিক আমোদ হারায়। বাঙ্গালী ছাত্রেরা ১৭/১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হলেই অমনি যৌবনের মধ্যভাগে আসিয়াছেন ভাবিয়া গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন এবং সকল প্রকার বলদায়ক ক্রীড়া ও শারীরিক ব্যায়ামকে বালকের যোগ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অনেকে, ঐ সকল ক্রীড়ায় মন দিলে বালকেরা লেখাপড়া শিখিতে পারে না বা দুষ্ট হইয়া যায়—এই বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের স্কুল ও কলেজগুলিতে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার বন্দোবস্ত দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হবে। আমাদের দেশে, বিশেষ বাঙ্গালায়, আমরা যে ছাত্রদেরকে ক্রীড়ায় মন দিলে বিদ্যায় অবহেলা করিতে দেখি, সে ক্রীড়ার দোষে নয়, বালকদের দুর্ব্বল প্রকৃতির দোষ। বহুকালের অনভ্যাস ও অনুৎসাহ বশতঃ বালকদের মন এতদূর নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা যদি প্রাণ ভরিয়া খেলায় মন দেয়, তাহলে পড়ার জন্য আর তাহাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণেই আমাদের দেশে ক্রীড়াপ্রিয় ছাত্রদের মধ্যে এত মূর্খ বালক দেখিতে পাই।

জ্ঞানীমাত্রেই এখন বুঝিয়াছেন, মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক সুখ, অসুখ, বল ও দুর্ব্বলতার কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীর অসুস্থ হলে মনও অসুস্থ থাকে, মানসিক কষ্ট হলে শারীরিক পীড়া জন্মায়, আর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান থাকিলে মন সতেজ ও সক্ষম থাকে। সুতরাং বলিষ্ঠ বালকেরা যে লেখাপড়ায় অধিক পারদর্শী হইবে, ও তাহাদের জ্ঞান অধিক

দিন স্থায়ী হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ দেখিতে হইবে যে, মানুষের শরীর ও মন দুই আছে, একটিকে অবহেলা করিয়া অন্যটি কর্ষিলে শেষে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়, এবং শরীরের দুর্ব্বলতার সঙ্গে ভীরুতা, তেজোহীনতা প্রভৃতি মন্দ গুণেরও আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, কয়েকজন দেশীয় যুবক অতি অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া অনেক খ্যাতি লভিয়াছিলেন ; কিন্তু শরীর অবহেলাপূর্ব্বক দিনরাত কেবল মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা অল্প দিন পরেই পীড়িত হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন! ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! ইংরেজেরা এসকল বিষয় অতি উত্তম বুঝে ; ইহারা বরং মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা করিবে, তথাপি শরীরকে কদাচ অগ্রাহ্য করিবে না। বিলাতের কোন কোন স্কুলে বালকেরা অনেক সময় পাঠ পরিত্যাগ করিয়া খেলা ও ব্যায়ামে রত থাকে, এবং বিদ্যা অপেক্ষা খেলাতেই অধিক নিপুণ হয়। যদিও অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়; কিন্তু অল্প বয়সেই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক সুখ হারান অপেক্ষা সবল শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকা অনেকাংশে শ্রেয়।

স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া ইংরেজ বালকেরা কলেজে ভর্ত্তি হয়। সে দেশেরও উচ্চ শিক্ষা সচরাচর বিশ্ববিদ্যালয়েই দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ও ডব্‌লিন্—এই চারটি সকলের মধ্যে প্রধান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সকল ঐ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা ও দৃষ্টান্ত অনুসারেই স্থাপিত হইয়াছে ও উহারই অবিকল অনুকৃতি ; কেবল প্রভেদ এই যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি ভারতবর্ষের অপেক্ষা অনেক কঠিন।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক প্রকার, এই দুটি অতিশয় ধনী ও পুরান; আর পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহারা কোন কোন বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা করা, উপাধি, ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা এবং ছাত্রদেরকে নিয়মে রাখা ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। উহাতে বহুবিধ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে লাটিন, গ্রীক, অঙ্ক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধান। অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর অনেক স্থানের যুবকেরা কেম্ব্রিজে অঙ্কশাস্ত্রের উপাধি লইতে যায়। সুখের বিষয় আমাদের অনেক স্বদেশীয় ভ্রাতাও ঐ উপাধি লভিয়া আসিয়াছেন। ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা পরীক্ষা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে কোন একটিতে ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইলে উপাধি লওয়া যায়। কেম্ব্রিজে সর্ব্বশুদ্ধ সতরটা কলেজ আছে, অক্সফোর্ডেও ঐরূপ ; সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন বদান্য ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কলেজের এক একটি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাকে সচরাচর 'মাষ্টার' বলে। ইনি ও 'ফেলো' নামক কতকগুলি উপাধিধারী লোক কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। যে 'ফেলো' (Fellow) ছাত্রদের শিক্ষা ইত্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহাকে 'টিউটর' বলে, যে ফেলো ছাত্রদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করেন তাঁহাকে 'ডীন' বলে, প্রতি কলেজেই একটি ছোট গির্জ্জা আছে ; সেখানে প্রতিদিন উপাসনার সময় সকল

ছাত্রেরা উপস্থিত থাকে কি না খবর রাখা ডীনের কর্ম্ম। প্রত্যেক কলেজে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই ছাত্রদেরকে নানা বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ঐ ছাত্রবৃত্তিগুলি মাসে ৩০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ছাত্রেরা কলেজের ভিতরে বা নগরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বাসায় থাকিতে বাধ্য হয় ; তাহারা প্রতিদিন সকালে কি সন্ধ্যায় অন্ততঃ একবার গির্জ্জায় যায়। প্রত্যেক কলেজে ৯টা হতে ১২টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় কলেজের 'হলে' একদিকে কর্ত্তৃপক্ষরা ও অপরদিকে ছাত্রেরা বসিয়া ভোজন করে। রাত্রিতে কোন ছাত্রের বাহিরে যাইবার হুকুম নাই। কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের স্বভাবচরিত্র ও নীতিধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কোন ছাত্র নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

বি. এ. উপাধি লইতে হইলে প্রায় তিন বৎসর কোন কলেজের ছাত্র থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কলেজের ভিতর থাকিয়া এই উপাধি লইতে মাসে প্রায় ৩০০৲ টাকা করিয়া খরচ হয়, কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশিও ব্যয় করে, আবার কেহ বা ইহার কমেও চালায়। বড়মানুষ ও সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তানেরাই এখানে অধিক যায়, সেজন্য তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে হলে আবশ্যকের অপেক্ষা কিছু অধিক খরচ পড়ে। যাহা হোক, এই সব কলেজস্থিত ছাত্রেরা এই তিন বৎসরে যে শিক্ষা ও উপকার পায়, ও তাহাদের যেরূপ চরিত্র গঠিত হয়, তাহা ধরিলে এ ব্যয় সার্থক বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজ পিতারা সন্তানদের শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের কাছে থাকাতে ছেলেরা ভদ্রোচিত গুণ শিখিবে, বিদ্বান লোকের সংস্রবে বিদ্যোৎসাহী হবে, নির্ম্মল চরিত্রের দৃষ্টান্তে উন্নতস্বভাব হবে—এই ভাবিয়া গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত পিতামাতাও পুত্রদেরকে কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডে পাঠান। তাঁহাদের সে আশাও প্রায় বিফল হয় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী লোকেরা আদৃত হইয়া থাকেন। অক্সফোর্ডের এম. এ. বা কেম্ব্রিজের বি. এ.—হইলেই লোকে বুঝিতে পারে যে সে লোকটি যথার্থই ভদ্র, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র।

তাছাড়া, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিলে ছাত্রেরা অনেকগুলি উপকার পায়। প্রত্যেক কলেজের ছাত্র এক বাড়ীতে বাস করে, একত্র আহার করে, এক লেক্‌চার শুনে—এইরূপে পরস্পরের মধ্যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। প্রতি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সমাজ থাকায় ছাত্রেরা একত্র মিশিবার অনেক সুবিধা ও অবসর পায়; ইহা ব্যতীত, সকলে একসঙ্গে ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া থাকে। সকলেই প্রায় এক বয়সের ও এক অবস্থার লোক, সে জন্য সহজেই তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে ; এবং অনেক সময় সেই বন্ধুত্ব চিরজীবন স্থায়ী হইয়া থাকে। ছাত্রেরা ঐখানে সাংসারিক জীবনের প্রথম পরিচয় পায় এবং মানুষ ও মানুষের স্বভাব, আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে।—এইরূপে বহুযত্নে, বহুব্যয়ে ও বহুদিন নিয়ম ও শাসনের মধ্যে থাকিয়া এক একটি ইংরেজ বালক, পূর্ণবয়সে চরিত্রবান্ মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রদীপ, ফাল্গুন ১৩০৫

দেশী ও বিলাতী জিনিস

যখনই কোন দ্রব্য কিনিতে যাই—তখনই দোকানীদের মধ্যে—এটা দেশী, ওটা বিলাতী, এটা আসল জিনিস, ওটা নকল মাত্র—কথা লইয়া মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। দেশী ও বিলাতী আলু, মটর প্রভৃতির ভিন্নতা সকলেই জানেন। আজকাল দেশী সাবান, বিস্কুট, তালা প্রভৃতির সঙ্গে বিলাতী দ্রব্যের তুলনা করিয়া দোকানদারেরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে বলিয়া থাকে—আপনি বিলাতী ছাড়িয়া দেশী কিনিবেন কেন? আমি কিন্তু দেশী আলু, মটর পছন্দ না করিলেও দেশী বিস্কুট, দিয়াশলাই, কাপড়, শালের পক্ষপাতী। কেননা, দেশীয় চাষারা ভারতবর্ষের জমিতে লাঙ্গল চষিয়া, রোদে পুড়িতে পুড়িতে জল সেচিয়া যে সব আলু মটর সিম সব্জী বুনিতেছে, তুলিতেছে ও বাজারে চালান দিতেছে—তাহাকে সকলে বিলাতী ভাবিলেও বিলাতী নয়—দেশীই। তবে, হয়ত, ইউরোপীয়েরা প্রথম ঐ সব দ্রব্য এদেশে চলিত করে বলিয়া সাধারণ লোকে উহাকে বিলাত হ'তে প্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে ; অথবা আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা না থাকায় কোন ভাল দ্রব্য দেখিলেই তাহার বিলাতী নাম দি। কিন্তু তালা, কাপড়, ছুরি, সূতা প্রভৃতির বিষয় অন্য প্রকার। যে সব দ্রব্য বিলাতে প্রস্তুত হ'য়ে এদেশে আমদানী হয় তাহা অবশ্যই বিলাতী ; যেমন ছুঁচ, সূতা, কাগজ, কলম, শিশি, ওষুধ, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য ছোট বড় প্রায় সমস্ত জিনিসই বিলাত হ'তে আমদানী হয়, এবং এই সকল দ্রব্যের দেশী ও বিলাতী প্রস্তুতের মধ্যেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিহিত আছে। ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশে যে আমদানী হয় তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু দেশের তয়েরী জিনিসের অপেক্ষা বিদেশজাত দ্রব্যের যে অধিক সম্মান ও কাট্‌তি দেখা যায়—এই মহা আক্ষেপের বিষয়।

সকল সভ্য দেশেরই দস্তুর এই যে, তাহারা নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্য সকল বিদেশে পাঠাইয়া দেয় ও উহা অতি সস্তা দামে বেচিয়া খরিদ্‌দার বাড়াইবার চেষ্টা পায়। এই কারণেই আজকাল আমাদের দেশে জাপানী ও সুইডিস দিয়াশলাই, জর্ম্মন ছুঁচ ও চিনি, মার্কিন কল প্রভৃতি অনেক প্রত্যহ দরকারী জিনিস এদেশে ইংরেজপ্রস্তুত দ্রব্য হইতেও সস্তায় বিক্রীত হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য ক্রমে দেশী ও বিলাতী সমস্ত দ্রব্যের কাটতি এদেশ থেকে উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষের বাজার নিজেদের হস্তগত করে। আর এ সব বিষয়ে আমাদের চোক না খুলিলে সময়ে তাদের সে উদ্দেশ্য যে সফল হতে পারে ইহাও অসম্ভব নয়। কারণ, সকল শিক্ষিত জাতিরাই স্বদেশীয় দ্রব্যকে অধিকতর উন্নত অথচ সুলভ প্রস্তুত করিয়া বিদেশজাত জিনিসকে নিজেদের বাজার থেকে তাড়াইয়া দেয়। স্বদেশ ও স্বদেশীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকার দরুণ ক্রেতারা সহজে বিদেশী দ্রব্য কিনিতে চায় না। বিশেষ তাহারা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ভিন্ন দেশের আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা তাদের স্বদেশের প্রস্তুত দ্রব্যই ভাল ও সস্তা—তখন তাদের দেশভক্তি ও স্বদেশীদের প্রতি ভালবাসা ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। এইরূপে প্রতি দেশ ও প্রতি জাতির কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে ; তার সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীরাও পরিশ্রমী ও সম্পত্তিশালী হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশে সকলই উল্টা দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন

দোকানে পা দিবা মাত্র—দোকানী সগর্ব্বে বলিয়া থাকে—মশায় দেখুন, এ আসল বিলাতী, ইহাতে বর্মিংহামের ছাপ বা ম্যাঞ্চেষ্টারের মার্কা আছে—না হয় সুইড কি মার্কিন নাম আছে, ইহা কখনই নেটিভ নয়—এ বড় সরেস জিনিস—দেশী লোকের সাধ্য কি যে এমন জিনিস বানায়! এরূপ উক্তি আমাকে বড়ই বিষণ্ণ করিয়া তুলে। অজ্ঞ দোকানী না বুঝিয়া কেবল লাভের আশায় ওরকম বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ প্রতি বাক্যেই এতদূর স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবমাননা প্রকাশ পায়, যে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মর্ম্মে আঘাত লাগে। আমার স্বদেশীয় লোকে যদি বিদেশীয় দ্রব্যের চেয়েও ভাল জিনিস তয়ের করিয়া বাজারে চলিত করিতে পারেন—ভারতবর্ষেও ইউরোপের ন্যায় সকল জিনিসই প্রস্তুত করিবার উপায় ও সুবিধা আছে, অথচ উহা সস্তায় হতে পারে—ইহা লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলে আমাদিগকে আর দেশী দ্রব্যের প্রতি এত অনাদর ও অশ্রদ্ধার কথা শুনিতে হবে না।

বোম্বায়ের সাড়ী, মুর্শিদাবাদের তসর গরদ, ঢাকার মস্‌লিন ও কাশ্মীরের শাল যে বিলাতী ঐ সব আমদানী কাপড়ের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা ক্রেতামাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু বহুদিন পরাধীন থাকিয়া আমরা এতদূর মনুষ্যত্ব ও ভাল মন্দ বিচারের শক্তি হারাইয়াছি যে দেশী দ্রব্য ভাল পাইলেও আমরা তার প্রকৃত আদর করি না। নামডাক জাঁকজমকের প্রতি আমাদের বেশী নজর। এই বিষয়ে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে—ঘটনাটি অমূলক নহে—সত্য। কোন একজন ভদ্রলোক তাঁর চাকরকে এক কৌটা দাঁতের মাজন কিনিতে আট আনা পয়সা দিলেন। তাঁর গৃহিণী বড় মিতব্যয়ী—মাজনের জন্য মিথ্যা আট আনা নষ্ট না করিয়া এক পয়সার খড়ি গুঁড়াইয়া তাহাতে কর্পূর মিশাইয়া বাবুর কাছে পাঠালেন। কর্তার তাহা মনে ধরিল না। তিনি চাকরকে বকিতে লাগিলেন। সে বেচারী কি করিবে—উহা মাতাঠাকুরাণী দিয়াছেন। সে তাঁহারই কাছে উহা লইয়া গিয়া হাজির করিল ও বাবুর অসন্তোষের কথা জানাইল। কর্ত্রীঠাকুরাণী চতুরা—অল্পে ছাড়িবেন না। তিনি আট আনি রাখিয়া বাক্স থেকে এক পাউডারের কৌটা বাহির করিলেন, তাহাতে মাজন পূরিয়া এসেন্সের গন্ধ লাগালেন। তারপর কাগজে মুড়িয়া সূতা দিয়া বাঁধিলেন। আধ ঘণ্টা পরে চাকর উহা লইয়া গিয়া বাবুকে দিল। ডাক্তারখানার বিলাতী টুথপাউডার ভাবিয়া তিনি এবাব সন্তুষ্ট হইলেন। এখানে বলা বাহুল্য অধিকাংশ টুথপাউডারই ঐ উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজকাল পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত ষ্টুয়ার্ট ট্যানারী কোম্পানীর জুতাখানায় (আমার বোধ হয় দেশীয় লোকের সহানুভূতি অভাবেই তিনি উহার ইংরাজী নাম দিতে বাধ্য হয়েছিলেন) নানা প্রকার জুতা ও বুট প্রস্তুত হইতেছে, উহা বিলাতের আমদানী জুতা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, বরং কিছু সস্তা। অথচ আমাদের ধনী সন্তানেরা ডসনের তয়েরী বুট কিনিয়া সাহেবের বাড়ীর জুতা বলিয়া আস্ফালন করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকের বছরে এক জোড়া জুতা, ৪ জোড়া কাপড় কি এক থান লংক্লথ হলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু দেশীয় জিনিসপত্রের খরচ ও দেশীয় কারিগরদের উৎসাহ দিতে হলে ধনী লোকদের সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক। দেশের যত রাজরাজড়া, জজ, উকীল, জমীদারেরা

এক জোট হয়ে যদি এরূপ মনস্থ করেন যে তাঁহারা প্রাণান্তেও দেশী ছাড়িয়া বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না—বোম্বায়ের লংক্লথ, কি কাণপুরের টুইলক্লথ, কি ফরাসডাঙ্গার ধুতি ফেলিয়া ম্যানচেষ্টারের কাপড় লইবেন না, চীৎপুরের তালা অগ্রাহ্য করিয়া সেফিল্ডের লক কিনিবেন না—দেশের রেসমী কাপড় ছাড়িয়া বিলাতের সিল্ক কিনিবেন না—তাহলে আশা হয় ক্রমে সকল জিনিসই দেশে তয়ের হবে, দেশীয় কারিকর মিস্ত্রীগণের অধিকতর উন্নতি হবে—দেশের টাকা দেশেই রহিয়া যাবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপে, বিশেষ ইংলণ্ডে সকলই আমাদের হতে বিভিন্ন, আমাদের যেমন আত্মাভিমান নাই বলিলেই হয়, তাদের কিন্তু এই আত্মমর্য্যাদা অত্যন্ত প্রবল, তাদের নিজের প্রস্তুত কোন দ্রব্য যে অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য হতে হীন হবে, তাহা তারা সহ্য করিতে পারে না। বিলাতের জমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর বলিয়া পূর্ব্বে আলু মটর প্রভৃতি কৃষিজাত অনেক দ্রব্য সেখানে বিদেশ থেকে আমদানী হত, ও ঐ সব জিনিস বিলাতী সামগ্রী অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা যেমন পরস্পরের মধ্যে স্বজাতির অপমান সহিতে পারে না, সেইরূপ স্বদেশজাত দ্রব্যের নিন্দা শুনিতে চায় না, তাহারা প্রাণপণে খাটিয়া জমিতে উৎকৃষ্ট সার দিয়া এখন খুব সরেস তরিতরকারী ও ফল ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে। এখন ইংলণ্ডের কপি, কড়াইশুঁটি, আপেল, পেয়ারা প্রভৃতি ইউরোপের সর্ব্বত্র অতি আদরে গৃহীত হয়। সে দেশের কোন দোকানে গেলে দোকানী আগ্রহের সঙ্গে স্বদেশী জিনিসগুলিকে আগে দেখায় ও সগর্ব্বে বলে—এইটা ইংলিস মেক, সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট, ইহার সঙ্গে কোন জিনিসের তুলনা হতে পারে না, যদি ভাল জিনিস চান ত এইটা লউন। বিদেশের জিনিস আপনার মনের মত হবে না, ও দুদিনে ভেঙ্গে যাবে বা ছিঁড়ে যাবে—ইত্যাদি। ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সাধারণ মনের ভাব কত ভিন্ন। একটী কত উচ্চ, অন্যটি কত অবনত। এই ত গেল সামান্য দোকানদারের কথা ; দুই দেশের বড়-লোকদের মনেরও ঐরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়।

বিলাতে বড় বড় লোকেরা মিলিয়া এমন দুই তিনটি সম্প্রদায় করিয়াছিল, যাহা দ্বারা স্বদেশজাত শিল্পের রক্ষা ও বিদেশজাত শিল্পের অধিক আমদানী বন্ধ হয়। লর্ড ডিউক প্রভৃতির পুত্রকন্যার বিবাহের সময় যে যে দামী আসবাব পোষাক ও গহনার দরকার হয়, তাহা প্রায় সমস্তই ইংরেজ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন প্রিন্সেস লুইসের (যুবরাজের বড় মেয়ে) বিবাহের সময় আমাদের যুবরাণী (প্রিন্সেস অব ওয়েল্‌স্) সমস্ত কাপড় গহনা আসবাব ইত্যাদি সকল দ্রব্যই ইংরেজ কারিগর-নির্ম্মিত কিনিয়াছিলেন ; একটি জিনিসের জন্যও বিদেশে ফরমাস দেন নাই। ইংলণ্ড তাঁহার জন্মস্থান না হলেও এই ইংরেজ সম্মান রক্ষার জন্য বিলাতের লোকেরা তাঁকে প্রাণ খুলিয়া শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিল। কিন্তু বলিতে কষ্ট হয়, আমাদের দেশীয় ধনীরা সকল কাজকর্ম্ম উপলক্ষেই বিলাত হইতে অথবা বিলাতী দোকান থেকে দ্রব্যাদি আনাইয়া থাকেন। বড় মানুষদের বাড়ী সাজাইবার জন্য বিলাতী আসবাবের প্রয়োজন হয়—রাজকুমারদের বিবাহের সময় সাহেবের বাড়ী থেকে জুয়েলারী (জড়োয়া গহনা) আসে। আবার আজকাল

শুনিতে পাই কলিকাতার হ্যামিল্টনের দোকান থেকে ইয়ারিং, নেক্‌লেস্ প্রভৃতি না হলে ধনী গৃহিণীদের মন উঠে না। বলা বেশীর ভাগ, বিলাতী কারিগরেরা ভারতীয় স্যাকরা জহুরী প্রভৃতিকে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই। আজকালকার দেশীয় অলঙ্কারের কাছে ইয়ারিং ছাড়া অধিকাংশ বিলাতী গহনাই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক মহিলা অতি পরিষ্কার সোণার চেন হার ও বেলোয়ারী ছাড়িয়া বিলাতী কদাকার নেকলেস ও ব্রেসলেট পরিয়া অধিক সন্তুষ্ট হন ও নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাবেন। ইহার কারণ, দেশী জিনিস মাত্রেই আমাদের অনাদর ও অশ্রদ্ধা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমরা বহুদিন পরাধীন থাকিয়া মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা একেবারেই হারাইয়াছি। আমরা দিন দিন এক অসার, অগভীর, অচিন্তাশীল জাতিতে পরিণত হইতেছি। জাঁকজমক দেখিলে আমরা মাতিয়া উঠি, আড়ম্বর দেখিলে আমাদের তাক্ লাগিয়া যায়, সেই কারণেই দেশী কারিগরদের নির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের মনে ধরে না।

প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬

জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব

জাতীয় চরিত্র বলিলে দেশের সমস্ত অধিবাসীর প্রকৃতিই বুঝায়—ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি লইয়াই উহা গঠিত হয়। যে দেশের ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিতে অধিক উন্নত ও মহৎ চরিত্র দেখা যায়, সেই দেশই জগতে অধিক মহত্ত্ব ও গৌরব লাভ করে। এই চরিত্রবান জাতি শুধু বড় ও প্রসিদ্ধ লোকদের জীবন হইতে গঠিত হয় না—ছোট বড় প্রত্যেক গৃহে, সামান্য কুটীরে—পিতার কাজের সঙ্গে, মাতার কর্ত্তব্যের মধ্যে, স্ত্রীর আচরণের ভিতর—এই জাতীয় প্রাণ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়।

বর্ত্তমান বোর যুদ্ধ হইতে তাহাদের মধ্যে এই জাতীয় চরিত্রের আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। ইংরেজদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বোরদিগকে আমরা অতি সামান্য, নগণ্য জাতি বলিয়াই ভাবিতাম; মনে করিতাম উহারা আমাদের দেশের ইউরেসিয়ানদের মত অতি দুর্ব্বল ও অলস; ইংরেজদের সঙ্গে যুঝিবার ক্ষমতা তাদের কোথায়? কিন্তু গত চার মাসের যুদ্ধ বিবরণে[২১] আমাদের—আমাদের কেন, সমস্ত জগৎ-সুদ্ধ লোকের—সে তাচ্ছিল্য ভাব গিয়া এখন তাদের প্রতি সম্মান বাড়িয়াছে। তাদের শত্রুপক্ষেরা পর্য্যন্ত তাদের সাহস, বীরত্ব, রণকৌশল ও একপ্রাণতার প্রশংসা করিতেছে! তাদের এই জাতীয় চরিত্র সামান্য কুটীরে, লাগার (Laager) বা ডিপোর মধ্যে ও গোলাবাড়ীর ভিতরেই গঠিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে যখন পড়ি—শ্রমজীবী, কৃষিজীবী সকলেই—যাহাদের অস্ত্র ধরিবার শক্তি আছে—ট্রান্সভালের এরূপ সমস্ত অধিবাসী মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তখন বিস্মিত হই। তারা নিজেই নগর রক্ষার ভার লইয়াছে, প্রহরী ও গোয়েন্দার কাজ করিতেছে ও কয়লার খনি চালাইতেছে। বোর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত একপ্রাণ হইয়া সংসারের ও মাঠের কাজ করিতেছে, সৈন্যদের আহার ও পোষাক যোগাইতেছে, আহত ও পীড়িতদের সেবা করিতেছে—আবার 'লেডিস্মিথের' বেষ্টনকারী বোর সৈন্যদের কাছে গিয়া নিজ নিজ স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতাকে অভয়, উৎসাহ ও আনন্দ দিতেছে। সকলে আপন আপন গার্হস্থ্য ও পারিবারিক শোক দুঃখ ও বিরহ ভুলিয়া জাতীয় মান ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমভাবে দেহপাতে প্রস্তুত, আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত, খাটিতে সক্ষম। বিশাল চরিত্রের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়া মনে হয়, ধন্য বোর জাতি! অন্য জাতি এত জ্ঞানধর্ম্মের অভিমানে পুষ্ট হইয়া যাহা শিখিল না, এই দুই তিন শ বৎসরের কঠোর জীবন সংগ্রামে বোরজাতি তাহা শিখিয়াছে।

ইংরেজদের মধ্যেও এই জাতীয় একতা ও জাতীয় চরিত্র যে কতদূর উন্নত তাহা সকলেই জানেন। গার্হস্থ্য বিপদের ভিতরে ও পারিবারিক শোকের মধ্য দিয়া এই জাতীয় প্রাণ যে রকম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় সেরূপ আর কিছুতে নয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধ ইংরেজ জাতির মহাপ্রাণতারও অতি সুস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। এই জাতীয় ভাব সামান্য শ্রমজীবী ইংরেজ ভলান্টিয়ার হইতে বড় বড় লর্ড লেডিদের মধ্যে সমভাবে দেখিতে পাই। অল্পদিন হইল লর্ড রবার্টসের পুত্র বোর যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। এই নিদারুণ পুত্র ও ভ্রাতৃশোকে একান্ত কাতর হলেও লেডি রবার্টস ও তাঁর কন্যারা লর্ড রবার্টসকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে দিতে বিমুখ হন নাই; বরং অধিকতর নিকটে থাকিয়া স্বামী ও পিতাকে উৎসাহ

দিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাও কেপ্‌কলনিতে গিয়াছেন। এরূপ আত্মবিস্মরণের দৃষ্টান্ত এখন ব্রিটনের ঘরে ঘরে ঘটিতেছে, কত পিতামাতা একটি পুত্রকে হারাইয়া অপরটিকে যুদ্ধে পাঠাইতেছে ; কত ভগিনী অশ্রু চাপিয়া ভ্রাতাকে বিদায় দিতেছে ; কত স্ত্রী বুক বাঁধিয়া স্বামীকে চির আলিঙ্গন করিতেছে। প্রতিদিনের যুদ্ধ সংবাদ প্রত্যহ কত ঘরে শোকের খবর ও নিরাশার ছায়া আনিতেছে। অথচ কাহারও আপ্‌শোষ নাই!—হায়! কেন তাকে যেতে দিয়াছিলাম—বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ নাই! কারণ, জাতীয় মহত্ত্বের কাছে এই ব্যক্তিগত বিপদ ও শোককে ইংরেজেরা অতি তুচ্ছ মনে করে। প্রতি জনের এইরূপ অক্লেশে দেহপাত দ্বারা, প্রতি ব্যক্তির গার্হস্থ্যশান্তি বিসর্জ্জনের দ্বারাই জাতীয় মান, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় ক্ষমতা অটুট্ থাকিতে পারে—ইংরেজেরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই মহাবীজ শোণিতে ধারণ করে। সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া বর্ত্তমান ইংরেজ চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

এই বিশাল জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে বহুকাল ও বহু শিক্ষার আবশ্যক। অনেক পুস্তক পড়িলে বা বড় বড় উপাধি ধরিলে চরিত্র লাভ করা যায় না। উচ্চ বক্তৃতা বা তর্কের আড়ম্বরেও উহার পুষ্টি হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমভাবে পালিত হইলে সামান্য কুটীরে বা বড় প্রাসাদে উহা সমভাবে জন্মিতে পারে। ইংলণ্ডের আজকাল বড় বড় লর্ড ডিউকেরা যে জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, সামান্য শ্রমজীবী ভলন্টিয়ার সেই মহৎভাবে উৎসাহিত হইয়া দেশের জন্য আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিতেছে—দুই শ্রেণীর প্রাণেই জাতীয় দায়িত্ব একভাবে সমস্ত জীবনকে ভরিয়া ফেলিয়াছে, দুই চরিত্রই সমানে মহৎ নাম পাইবার যোগ্য।

আমাদের দেশে ঐরূপ জাতীয় জীবন ও বিশাল চরিত্র গঠিত হইবার পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় আছে, তার মধ্যে আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার অধিক প্রভাব দেখা যায়। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে একান্নবর্তী গৃহের বন্ধন অধিকতর দৃঢ় ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতর বহু পরিজনের একত্রবাসের দরুণ পরস্পরের সম্পদ বিপদে মানুষের হৃদ্বৃত্তিগুলি চালনার অধিক পরিসর পাওয়া যাইত। আজকাল যদিও সেরূপ বহুজনাবদ্ধ পরিবার প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে আমাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডী আরো প্রশস্ত পথে না গিয়া বেশী গুটাইয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি ব্যক্তির নিজ নিজ গৃহে বা সংসারে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট না থাকিলেই আমরা অতি সুখে দিন কাটাই। আমরা আত্মীয় স্বজনের প্রতি যেমন কর্ত্তব্যের জন্য দায়ী, স্বদেশ ও স্বজাতির নিকটেও সেইরূপ দায়ী—এ উন্নত জাতীয় ভাব এখনও আমরা হৃদয়ে ধরিতে শিখি নাই। নিজ গৃহটি আমাদের কাছে নিজ দেশের সমান, আপন পরিবারটি সমস্ত স্বজাতির অনুরূপ—আর আমি নিজে সে সবের সর্ব্বময় কর্ত্তা—এই নিকৃষ্ট ভাব আমাদের জীবনে এতদূর মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের কাজকর্ম্মে ও কথাবার্ত্তায় এতদূর প্রকাশ পায় যে, উহা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব।

সকল দেশ ও সকল জাতির অবস্থা খুঁজিয়া দেখিলে, আমরা ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, যে দেশের লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যত অধিক কঠোরতা সহ্য করে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি তত অধিক জোরাল ও ধারাল হয় আর তাহাদের চরিত্রও অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়। এস্কুইমো, ল্যাপ্ প্রভৃতি অতি শীতপ্রধানদেশের জাতিরা

উহার প্রধান উদাহরণ। ঐ লোকদের বাসভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা একান্ত প্রতিকূল হওয়ায় তাহারা নানা উপায়ে আপনাদিগকে স্বাভাবিক শত্রু হইতে রক্ষা করিতে শিখে। সকলেই শীতের জ্বালায় অস্থির, শাদা ভালুকের ভয়ে ত্রস্ত, ও একমাত্র শিকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এরূপ অবস্থায়, যে পরিশ্রম করিয়া বা বুদ্ধি খাটাইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন না করে, তাহাকেই—হয় শীতের প্রকোপে, নয় ভালুকের কবলে, নতুবা অনাহারে প্রাণ হারাইতে হয়। সে কারণে শিশুকাল থেকেই তারা নানা উপায়ে শিকার ও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে শিখে। সিল ও তিমি মৎস্য ধরিবার জন্য তারা গৃহ ছাড়িয়া অনেক দূর ঘুরিতে বাধ্য হয়, কখন বা ছোট ছোট ডিঙ্গির ভিতরেই বরফের মধ্যে দুই তিন মাস কাটিয়া যায়। আজীবন এই প্রকার কঠোরতার কোলে পালিত হওয়ায় তাহাদের শরীর সবল ও চরিত্র দৃঢ় হয়। বিপদকালে সকলে প্রাণপণে পরস্পরের সাহায্য করে। পরনিন্দা, কলহ, চুরী প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুর্ব্বল চরিত্রের দোষ তাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।

অন্যদিকে যে দেশে যত অনায়াসে ও বিনা পরিশ্রমে জীবিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানকার অধিবাসীরা তত বেশী অলস ও দুর্ব্বলচরিত্র হইয়া থাকে। আমাদের দেশেই ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ—আবার বঙ্গদেশের মধ্যেও পূর্ব্ববাঙ্গালা অধিক উর্ব্বরা ও ফলপ্রদ। সেখানকার জমি এত জলা ও সরস যে কেবল কাদায় লাঙ্গল দিয়া বীজ বুনিলেই চার মাস পরে কৃষকেরা এত ধান তোলে যে, সমস্ত বৎসর আর আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। সেজন্য সেখানে দাসদাসী বা শ্রমজীবী লোক পাওয়া ভার। সকলেই একরূপ নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট ভাবে জীবন কাটায়, আর পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা, মোকদ্দমা করিয়া সময় নষ্ট করে। ইহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলায় চুরী, ডাকাতি, জাল ও মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির অপরাধ অধিক ঘটিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পরিবারব্যবস্থা আলোচনা করিলেও ভাল মন্দ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা চরিত্রগঠনের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উপাদান দেখিতে পাই। ইংরেজদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ায় আইন বশতঃ অন্যান্য পুত্রেরা জীবিকার জন্য নিজ নিজ চরিত্র ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এরূপ স্থলে শরীর সবল ও চরিত্র দৃঢ় না হইলে কেহই জীবনে সফল হইতে পারে না ; সেজন্য বাল্যবয়সেই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ইংরেজ যুবকেরা যত সদ্বৃত্তিগুলির চালনা দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও সৌভাগ্যের উপায় করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে নিজ নিজ পরিবার মধ্যে অন্নসংস্থানে থাকাতে লোকেরা বেশী নড়িতে চায় না, কাজ করুক বা না করুক দুটি খেতে ত পাবে—এই প্রবাদ বচন অনেক স্থলে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে শাপের মত হইয়াছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারব্যবস্থা দ্বারা কত উদ্যমশীল ও শ্রমপটু জীবন চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোকের পুত্র পৌত্রগণ যে অলস ও বিলাসী হয়, তাহাও এই সামাজিক ও পারিবারিক রীতির ফল। জীবিকা নির্ব্বাহ বা অর্থোপার্জ্জন পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হইলেও উহা মানবজীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য নয়—ইহা অতি অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে,

সুতরাং যে সমাজে প্রতি ব্যক্তিকে জীবিকার জন্য খাটিতে হয় না, সেখানে অলসতা ও উহার সহচর যত মন্দ গুণ আসিয়া মানব চরিত্রকে আক্রমণ করে। আমাদের সমাজেও তাহাই ঘটিয়াছে।

তাছাড়া, বহুকাল পরিবারবদ্ধ থাকায় আমাদের মনের ভাব এত অপ্রশস্ত হইয়া গিয়াছে যে, উহা সকল ঘটনা ও কাজকর্ম্মে প্রকাশ পায়। পুত্রকন্যাগুলি চিরকাল আশপাশে থাকে, ইহাই হিন্দু পিতামাতার একান্ত ইচ্ছা। চাকরীর জন্য পুত্র কি জামাতা কিছু দূরস্থানে গেলে জননী ভাবিয়াই আকুল, এমন কি, নিজ নিজ গ্রাম, সহর, কি অঞ্চল ছাড়িয়া অন্যত্র সন্তানদের বিবাহ দিতেও পিতামাতার অমত দেখা যায়। অনেক সময় কলিকাতার বাহিরের যোগ্য পাত্র ত্যজিয়া পিতামাতা নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমাদের সাধারণ জীবনেও এই সংকীর্ণতা সর্ব্বত্র দেখা যায়। ইউরোপ বা ইংলণ্ডের রাস্তায় কি উদ্যানে যখন পাঁচজন ভদ্রলোক একত্র হয়, তখন তাহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তায় মনোযোগ করিলে তাহাতে গার্হস্থ্য বা আফিস জীবনের স্বার্থ আন্দোলন অতি অল্পই থাকে। সাধারণস্থানে সকলেই সাধারণ বিষয়ের আলাপ করে। উঁচু, নীচু, ছোট বড় সকলেই এক ভাবে সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা বা রাজনীতির আলোচনা করে। নিজের দেশে কি অন্য স্থানে কোথায় কি হইতেছে—সকল বিষয়ের উত্তম খবর রাখে। কিন্তু আমাদের দেশের কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে কি মফস্বলের ময়দানে—দেশীয় লোকদের মধ্যে আত্ম ও আফিস ছাড়া কোন বিষয়ের আলাপ শুনিতে পাই না। শিক্ষক বা ছাত্রশ্রেণীর মধ্যে স্কুল কলেজের প্রসঙ্গই প্রধান! কোন্ কলেজের নিয়ম পড়া, কোন্ স্কুল ছাত্রদিগকে বেশী প্রশ্রয় দেয়, কোন্ প্রফেসর কেমন লেক্‌চার দেয়—ইত্যাদি কথা ছাড়িয়া তারা প্রায় অন্য সাধারণ কি জাতীয় বিষয়ের আন্দোলন করে না, আর ডেপুটি, মুন্সেফ ও উকীলবাবুদের সমস্ত হৃদয় যেন আইনের কূট প্রস্তাবে পূর্ণ থাকে। কাহার কাছারীতে কি মোকর্দ্দমা হইল, কোন্ তরফের সাক্ষী ঘুষ খাইয়াছে, কাহার সাহেব কাহার উপর চটা বা সন্তুষ্ট, কাহার বেতন বৃদ্ধির কত বিলম্ব—প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয় ভিন্ন কোন উচ্চ ভাব কি জাতীয় চর্চ্চা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না। এক কথায়, ইংরাজীতে যাহাকে talking shop বলে, আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতারা অবসর কালে সেই আলাপেই রত থাকেন। কোনরূপ মহৎ ভাব কি উন্নত বিষয় আমাদের সংকীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্রতম কোণেও স্থান পায় না। স্বদেশের উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যখন আমরা জাতীয় প্রাণ ও জাতীয় মহত্ত্বের প্রতি এরূপ ঔদাস্য বা তাচ্ছিল্য দেখিতে পাই, তখন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতদের ত কথাই নাই। দুই বেলা দুইটি ভাত পাইলেই তারা সন্তুষ্ট। উচ্চ জীবনের মহত্ত্ব তারা কিরূপে বুঝিবে?

আমাদের মহচ্চরিত্র গঠনের আর একটি প্রতিবন্ধকতা এই যে, আমাদের দেশের লোকেবা সর্ব্বত্র জ্ঞানের অপেক্ষা ধনের সম্মান অধিক করে। বিশাল চরিত্রের অপেক্ষা বড় সিন্ধুকের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হয়। কেবল গরীব বা নীচ শ্রেণীর মধ্যে নয়—শিক্ষিত ধনবানদের মধ্যেও এই অর্থপূজা সমান দেখিতে পাই। সে কারণে সকলেই স্বতন্ত্রতায় বিসর্জ্জন দিয়া বড় বড় চাকরী পাইবার জন্য লালায়িত! যাঁরা গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ম্ম পান তাঁরা আপনাদিগকে

যথা ভাগ্যবান ভাবিয়া অপরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আমরা মাসিক আয় অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের মূল্য স্থির করি। যথার্থ ধার্ম্মিক, উদার ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি অর্থের আড়ম্বর দেখাইতে না পারিলে, সকলের চক্ষে অতি সামান্য লোক বলিয়া অনাদৃত হন। আর অনেক চরিত্রহীন লোক অর্থের বলে সমাজের সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া হইয়া থাকেন। **Money covers a multitude of sins.** অর্থাৎ টাকায় অনেক পাপ ঢাকিয়া ফেলে এ ইংরাজী প্রবাদটি এ দেশে যত দূর সত্য ফলিতে দেখিয়াছি, বিলাতেও তত দেখি নাই।

আমাদের আর একটি দোষ, দেশের মধ্যে কোন মহৎ সবল চরিত্র দেখিলেই অতিরিক্ত চাটুবাদে আমরা তাঁহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করিয়া ফেলি। নিজের প্রশংসায় কর্ণপাত করে না জগতে এরূপ দৃঢ়প্রবৃত্তির লোক অতি অল্প—বিশেষ আমাদের এই দুর্ব্বল চরিত্রের মধ্যে উহা নিতান্ত বিরল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও সফল লোকদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা স্পষ্ট দেখা যায়। কোন শিক্ষিত লোকের মধ্যে মহত্ত্বের আভাস পাইলেই তাঁহার চারিদিকে চাটুকারদের দল জুটিয়া থাকে, আর ক্রমাগত তাঁর কাণে প্রশংসার ঢাক পিটাইয়া তাঁকে আত্মগর্ব্বিত ও স্বার্থপর করিয়া তুলে। এইরূপে যে বিশাল চরিত্র বিকশিত হইবার অবসর পাইলে সময়ে জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হ'তে পারিত, তাহা কাঁটার ভিতর পড়িয়া সংকীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া শীঘ্র বিনাশ পায়।

জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রারম্ভেই আমরা যদি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই, তাহলে আমাদের মধ্যে কোন কালে যে ডারউইন বা হাক্সলি, গ্ল্যাডস্টোন বা মোক্ষমূলার[২২] প্রভৃতির ন্যায় বিশাল চরিত্রের অধিষ্ঠান হইবে এরূপ আশা করা যায় না। তবে মানুষের 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'। আমাদের সমাজের মধ্যে নানা প্রকার ধ্বংসশক্তি থাকিলেও একদিন না একদিন ঐ বিষেই বিষক্ষয় হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন, দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে দারিদ্র্য জ্বালা কিরূপ বাড়িতেছে, সাধারণ লোকের সমৃদ্ধিক্ষেত্র ক্রমশই অপ্রশস্ত হইয়া যাইতেছে। এই সঙ্কুচিত ক্ষেত্রের প্রবল ঘর্ষণে আলোড়িত হইয়া, আজ কাল অনেকে সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডী ভেদিয়া বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িতেছেন। এই সব শ্রমপটু জীবনের সঙ্কলনে, দুই চারিটি করিয়া মহৎ চরিত্রেব বৃদ্ধিতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সমষ্টিতে আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠিত হইবে। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্ম ও স্বার্থ ভুলিয়া বিশাল দেশব্যাপারে লিপ্ত হইব ও সর্ব্বদা স্বদেশের আনন্দ ও সুখ দুঃখের আলোচনা করিব। শুধু আলোচনা নয়—আমরা প্রতি ব্যক্তি দেশের জন্য দেশের লোকের জন্য খাটিতে শিখিব। তাহলে নিশ্চয় এক দিন আমাদের চরিত্র মহৎ হইবে, আর আমাদের স্বজাতি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবে।*

প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭

* এই প্রবন্ধ মাঘ মাসে লিখিত হইয়াছিল। [স. প্রদীপ]

পাহাড়ী মেয়ে

গত মে মাসে দার্জ্জিলিংএ বাসকালে হিমালয়ের গম্ভীর ও মহিমাময় সৌন্দর্য্য দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সেখানকার সবল ও সতেজ পাহাড়ী রমণীদিগকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে ইউরোপে সুইস ও ওয়েল্‌স দেশীয় স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যে দেশে সমতল ও পার্ব্বত্য প্রদেশ সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির অবাধ স্বাধীনতা আছে, সেখানে উহাদের মধ্যে কিছু অধিক বিশেষত্ব দেখা যায় না, কেবল নিম্ন ভূমির অপেক্ষা উচ্চ ভূমির স্ত্রীলোকেরা অধিক কষ্টসহ ও কর্ম্মক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পাহাড়ী মেয়েদের তুলনা করিলে যেন 'আকাশ পাতাল' প্রভেদ দেখিতে পাই। চোখের পুরাণ আবরণ খুলিয়া গিয়া সব যেন এক নূতন ধরণে গঠিত বোধ হয়। মনে ভাবি, আমাদের কি বিড়ম্বনা, যখন নিজের দেশেই, (কলিকাতা হইতে কেবল চব্বিশ ঘণ্টা রেল পথের মধ্যে) স্ত্রীস্বাধীনতার এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন কি না স্বদেশীয় ভ্রাতাদের সম্মুখে আদর্শ ধরিয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইবার জন্য আমরা ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া বেড়াই!

অনেকেই জানেন, দার্জ্জিলিংএ তিনরকম লোকের বাস—নেপালী, ভুটিয়া ও লেপ্‌চা। নেপালীরা দেখিতে অধিকতর সুশ্রী ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ; ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। সেজন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের সঙ্গে ইহাদের আচারব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ভুটিয়া ও লেপ্‌চারাই যথার্থ পাহাড়ী—এই উভয় জাতিই দেখিতে প্রায় একরকম। রং ফর্শা, মাথায় খাট, লম্বায় ৪ ||০ কি ৫ ফুটের বেশী নয়, মুখ গোল, নাক চেপ্টা, চোক ছোট, নারাঙ্গা উঁচু ; কেবল লেপ্‌চাদের রং কিছু বেশী সুন্দর। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই প্রায় তুল্য সবল ও দৃঢ়কায়। পুরুষেরা কামিজ, জামা, কোট, পাজামা, টুপি, গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ ও কখন কখন খুব মোটা বুট পরে। স্ত্রীলোকদের পোষাকও অতি ভদ্র ও সভ্য। তাহারা খুব মোটা সাড়ী বা সাড়ীর সঙ্গে বডি ও জামা পরে। তাহার উপর এক গরম শাল বা র‍্যাপার গায়ে দেয়। পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় টুপি বা ঘোমটা দেয় না, চুলের বিণনী করিয়া পিঠে ঝুলাইয়া রাখে।

একদিন আমার একটী বন্ধুকন্যা জিজ্ঞাসা করে—পাহাড়ী মেয়েদের আপনার কি রকম বোধ হয়? ইহারা খুব jolly না? বাস্তবিক এরূপ সরল, প্রফুল্ল ও আনন্দময় মুখ আমরা সমতল ভূমিতে অতি অল্পই দেখিতে পাই। সর্ব্বদা খোলা বাতাসে কঠিন পরিশ্রম করায় ইহাদের শরীর যেমন সবল ও শক্ত হইয়াছে, নিজেরা জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হওয়ায় মনও সেইরূপ সতেজ ও স্বতন্ত্র হইয়াছে। অর্থের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেও ইহাদিগকে সর্ব্বদাই সুখী ও আনন্দিত দেখা যায়। কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই ইহারা রাস্তায় বসিয়াই তাস ও ঘুঁটি খেলে, গান গায় ও সিগারেট খায়। পাহাড়ী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে—এক এক জন প্রায় আধমণ পাথর পিঠে বাঁধিয়া প্রত্যহ উঁচু পাহাড়ের উপর বহিয়া লইয়া যায়। প্রাতঃকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত তাহারা

ঐরূপ পাথর বহা, পাথর ভাঙ্গা ও রাস্তা মেরামতের কাজ করে। অনেকে শিশুসন্তানকে পিঠে বাঁধিয়াই খাটিতে থাকে।

যে কোন কাজেই হো'ক না, সমভাবে অভ্যস্ত হ'লে স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠিক এক প্রকার কাজ করিতে পারে। এই পাহাড়ী স্ত্রীলোকদেরকে দেখিয়া আমাদের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। ঈশ্বর নারীজাতিকে কঠিন কর্ম্মে অক্ষম করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই ধারণায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা ও কার্য্যক্ষেত্রে সমান অধিকার দিতে অস্বীকৃত, আশা করি এ দৃশ্যের দ্বারাও তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইবে।

স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা সর্ব্বত্রই এক সঙ্গে প্রায় এক কাজ করে, সুতরাং পুরুষেরা নারীদিগকে মান্য করিয়া চলে। একদিকে যেমন আপনাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া মনে ভয় ও সঙ্কোচ নাই, অন্যদিকে সেইরূপ স্ত্রীজাতিকে অক্ষম বলিয়া হেয় জ্ঞান নাই। উভয়েই একত্র খাটিবে, এক সঙ্গে উপার্জ্জন করিবে ও জীবিকানির্ব্বাহে পরস্পরের সাহায্য করিবে—এই ভাব তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীপুরুষদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারও অতি ভদ্র ও নির্দোষ। দেখিতাম, অনেক যুবকযুবতী ও বালক বালিকারা বিশ্রাম কালে পাহাড়ের উপর বা রাস্তার ধারে বসিয়া প্রত্যহই গানবাজনা ও ক্রীড়া আমোদ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনরূপ দূষ্যভাব বা অশ্লীল আচরণ দেখা যায় না।

পাহাড়ী নারীরা এত পরিশ্রমী যে, তাহাদিগকে আমি কখন অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। অনেকে বলিবেন, শীতের জন্য তাহারা নড়িতে বাধ্য, কিন্তু শুধু তাহা নয়। কাজ তাহাদের জীবনের সঙ্গী—না খাটিলে আহার পাইবে না। এই জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা তাহাদিগকে এতদূর কর্ম্মিষ্ঠ করিয়াছে যে, উহা তাহাদের জাতীয় স্বভাব-স্বরূপ হইয়াছে। পাঠকেরা নজর করিয়া থাকিবেন, যেখানকার লোকেরা স্বাভাবিক অলস, সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই মানুষেরা সমান ভাবে আলস্যের আশ্রয় লয়। এই শীতকালের সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের বাঙ্গালী গ্রামবাসীদের ঘরে বা উঠানে এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড, আর তার চারি ধারে বসিয়া সকলের আগুণ পোহানর দৃশ্যটি কোন পাঠকেরই অগোচর নাই। পাহাড়ীরা সেরূপ নিশ্চল ভাবে আগুণ বা রৌদ্রের সাহায্যে শীত তাড়ানর পরিবর্ত্তে খাটিয়া উহাকে পরাজয় করে। পাহাড়ের পথে উপর নীচে, চড়াই উৎরাই করাই ত এক মহা পরিশ্রম ; তার উপর পিঠে পাথরের বোঝা বা কাঠের মোট লইয়া উঠা নামা করা যে কত দূর কষ্টকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা যিনি একবার পর্ব্বত দর্শন করিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন।

ভুটিয়া ও লেপ্চাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই। যুবতীরা ১৫।১৬, আর যুবকেরা ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় বিবাহ করে না। শুনিয়াছিলাম, উহাদের বিবাহ বন্ধন কিছু শিথিল। এ বিষয়ে আমি ঠিক কথা জানিবার জন্য একটি কুলিমেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিল—না, তা নয় ; যাহাদের স্ত্রীপুরুষে মিল না হয়, তারাই পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া দু'জনের স্বেচ্ছামত আবার বিবাহ করে। কিন্তু যেখানে দু'জনে যথার্থ ভালবাসা থাকে, ও ছেলেপিলে হয়, সে স্থলে স্ত্রীপুরুষে কখন পৃথক হয় না। এ নিয়ম অন্যান্য সভ্য জাতিদের আইন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। যে দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, সেইখানেই স্ত্রীত্যাগের

ন্যায় স্বামিত্যাগের প্রথাও আছে। অবশ্য আমাদের হিন্দুর চোখে ঐরূপ আইন বড় উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই নিয়ম সমাজের উভয় জাতির পক্ষেই সমান হিতকারী। বিবাহের উদ্দেশ্যেই মিলন। দুটি ভিন্ন জীব মিলিয়া মনে প্রাণে, কাজে কর্ম্মে, সুখে দুঃখে ঠিক একটি প্রাণীর ন্যায় চলিবে। যেখানে এরূপ মিলন হয় না, যে দম্পতী পরস্পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়, সেখানে সমস্ত জীবন বিবাদ কলহ, অসুখ অশান্তির মধ্যে কাটানর অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষে আলাদা হওয়াই শ্রেয়। সকলেই জানেন, 'ধরে বেঁধে প্রেম, আর মেজে ঘসে রূপ' মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

অন্যান্য জাতিদের ন্যায় পাহাড়ীদের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক ধর্ম্মপ্রবণ। তাহাদের প্রতি পর্ব্বের দিনই দেখিতাম, সারি সারি স্ত্রীলোকদের দল নানা রকম পূজোপকরণ লইয়া 'অবজারভেটরি' (Observatory Hill) হিলের উপর পূজা দিতে যাইতেছে। ঐ উঁচু পর্ব্বতের উপর তাহাদের দেবতার একটি ছোট গম্বুজ আকারের মন্দির আছে। সেইখানে তাহারা ঘি, ধূপ্ ও চায়ের পাতা পোড়াইয়া পূজা করে। আর, নানা রঙ্গের নূতন কাপড়ের বা কাগজের টুক্‌রাতে মন্ত্র লিখিয়া খুব লম্বা লম্বা পাহাড়ী তল্‌তা বাঁশের উপর ঝুলাইয়া দেয়। তাহাদের বাসস্থানের চারিদিকেও ঐরূপ কাপড়ের টুক্‌রা বাঁশের উপর বা গাছের গায়ে ঝুলিতে দেখা যায়। উহাদের বিশ্বাস, ঐ সব মন্ত্রের ভয়ে ভূত প্রেত উপদেবতারা পলাইয়া যায়। তাহাদের ঠাকুরের পূজার জন্য একজন লামা বা পুরোহিত আছেন ; তিনি বিশেষ পর্ব্বের দিনে আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা ও আরতি করেন। অন্যান্য সময়ে স্ত্রীলোকেরা নিজেই মন্ত্র পড়িয়া ঠাকুরের পূজা দেয় ও দেবতার কাছে মানস জানায়। পাহাড়ীরা নামে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু সকল অজ্ঞ লোকদের ন্যায় তাহারাও সাকারবাদী, আর তাহাদের অশিক্ষিত অন্তর নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। উহাদের বিশ্বাস, প্রতি পাহাড়ের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। একদিন অর্চ্চনাকালে একটি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা কাহার পূজা করিতেছ? সে উত্তর করিল—খোদার, আমরা আগে নিজের মুলুকের খোদাকে পূজা দি, তারপর এই পাহাড়ের দেবতার পূজা করি, নহিলে আমাদের নিজ দেশের ঠাকুর রাগ করেন। এই বাক্য হইতেই পাঠকেরা তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

দুঃখের বিষয়, পাহাড়ী ভাষা না জানাতে উহাদের সঙ্গে গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারি নাই। অনেকে বিদেশীদের অধীনে কাজ করাতে কিছু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা এখনও উত্তমরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা পালি, হিন্দী ও দেশজ পাহাড়ী শব্দ লইয়া গঠিত। এই কারণে তাহা আমাদের কাণে বড় জটিল বলিয়া বোধ হয়।

দার্জ্জিলিংএ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থাপিত একটি বড় ভুটিয়া স্কুল আছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভদ্র বালকেরা পাহাড়ী ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ের জন্য মিসনরিদের দুই তিনটি শিক্ষালয় আছে। সেখানে তাহারা লেখাপড়ার

সঙ্গে সেলাই ও পশমের শিল্পকার্য্য শিখে। মিসনরি রমণীদের অনুগ্রহেই পাহাড়ী মেয়েরা অনেকে নানা রকম আবশ্যক পশমের দ্রব্য বুনিতে শিখিয়াছে। প্রত্যহই দেখিতাম, মেয়েরা অবকাশ পাইলেই রাস্তায় বসিয়াই গলাবন্ধ বুনিতেছে বা জামা সেলাই করিতেছে। দার্জ্জিলিং ইংরাজের নির্ম্মিত, আর এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরাজ। সেজন্য পাহাড়ীদের মধ্যেও দুচারিটি ভালমন্দ ইউরোপীয় প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রতি রবিবারে শ্রমজীবীরা পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম লয়, আর ধোয়া ও সুন্দর পোযাক পরিয়া আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। আবার বিলাতের ন্যায় শনি রবিবারেও এখানকার মজুরদের মধ্যে অধিক মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রভৃতি কুরীতিও প্রবেশ করিয়াছে, দেখা যায়।

যে দেশে স্ত্রীলোকেরা নিজে খাটিয়া সংসার চালাইতে সমর্থ, সেখানে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষের বশ্যতাস্বীকার অসম্ভব। সুতরাং পাহাড়ী মেয়েরাও অতিশয় স্বতন্ত্রা ও স্বাবলম্বনপ্রিয়া। স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা-বশতঃ উহাদের চেহারায় ও চালচলনে যে তেজ প্রকাশ পায়, তাহাতে পুরুষেরা কখন স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রভুর ন্যায় আচরণ করিতে সাহস করে না। তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন সমানভাবে পুরুষদের সঙ্গে বাহিরের কাজ করে। পাহাড় ভাঙ্গা, পাথর তোলা, মোট বহা, রাস্তা খুঁড়া, জল টানা প্রভৃতি সব রকম কঠিন কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা নিযুক্ত থাকে। যখন তাহারা ভারী কাজে অপারগ হয়, তখন গৃহের কাজকর্ম্ম করে, আর যে সব সমর্থ স্ত্রীরা কাজে যায়, তাহাদের সন্তান রক্ষণ করে।

শুনিয়াছি, দার্জিলিং যখন সিকিম রাজ্যের অধীন ছিল, তখন পাহাড়ীরা বেশি সরল, সত্যবাদী ও মিতব্যয়ী ছিল। এখন নানা জাতির সংস্রবে আসাতে ও মজুরী করিয়া অনেক অর্থলাভ হওয়াতে উহারা অধিকতর কপটাচার, লোভী ও অমিতব্যয়ী হইয়াছে। পয়সার জন্য ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বলে। উহাদের আয় যথেষ্ট, কাজ অনুসারে রোজ ছয় আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত। ৯।১০ বৎসরের বালকবালিকারাও ।০ আনা করিয়া মজুরী পায়। তথাপি উহারা ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। প্রত্যহ বার্ডসাই ও পান চুরটেই কত পয়সা নষ্ট করে। দশ বার বৎসরের ছেলে মেয়েরাও এই কুঅভ্যাস শিখিয়া থাকে। তাহার উপর, মাহিনা হাতে পাইলেই শরীর শোভনের জন্য পুতি ও কাঁচের মালা, চুড়ি, শাঁখা ও ইয়ারিং প্রভৃতিতে মেয়েরা যে কত অর্থব্যয় করে তাহা উহাদের গহনা দেখিলেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ, ঐ সামান্য সাজগুলিও সেখানে অতি মহার্ঘ। যে পুতির দাম এদেশে চারি পয়সা কি ছয় পয়সা, তাহা আমি পাহাড়ী মেয়েদিগকে ছয় আনায় কিনিতে দেখিয়াছি।

অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও পানদোষ আছে। পুরুষেরা আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক দেশীয় মদ বা ব্রাণ্ডিতে অপব্যয় করে ; রমণীরাও এ দোষে বাদ যায় না। তবে মাতাল নারীর মত জঘন্য দৃশ্য এক দিনও আমার চক্ষে পড়ে নাই। খাদ্যে পাহাড়ীদের কোন বাছবিচার নাই। গো-মাংস, শূকর মাংস, মুর্গী প্রভৃতি সবই উহারা সমান আগ্রহের সহিত উদরসাৎ করে। যাহারা অধিক দিন হিন্দুদের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারা কিছু মিত-ভোজী।

দার্জিলিংএ পাহাড়ী মেয়েদের স্বাধীনতার প্রভাব এতদূর যে, আমাদের দেশীয়

ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত সেখানে স্ত্রীকন্যাদিগকে বাহিরে বেড়াইতে দেন। অনেক অবরুদ্ধা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ মহিলাদিগকে আমি তথায় রাস্তায় বিচরণ করিতে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলাম। সাধারণ স্থানে বেড়াইবার সময় একটি বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিলে আরো ভাল হয়। ভদ্র স্ত্রীকন্যাদের বাহিরে যাইবার কালে কিছু গম্ভীরভাবে সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। লাল, গোলাপী, হল্‌দে প্রভৃতি অতি উজ্জ্বল বর্ণের পোযাকের পরিবর্ত্তে কাল, ধূসর, নীল প্রভৃতি ঘোরাল রংএর কাপড় পরা উচিত। ভরসা করি, আমার এ বাক্যটি পাঠিকারা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন

সখী, ফাল্গুন ১৩০৭

কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উ:ঃতি

Heaven helps those who help themselves—যাঁহারা নিজের সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হয়েন—এই প্রবাদ বাক্যটি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। মানবজীবনে আত্মসাহায্যের ইচ্ছাই ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল স্বরূপ। ঐ মূল অনেক লোকের প্রকৃতিতে প্রোথিত হ'লেই জাতীয় বল ও শক্তির উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভিতরের সাহায্য যত উপকারী ও ফলদায়ী, বাহিরের সাহায্য তেমন নয়। কোন লোক বা জাতি নিজে কষ্ট করিয়া একটি দ্রব্য পাইলে বা কার্য্য সাধিলে তাহার চরিত্র যেরূপ দৃঢ় ও সতেজ হয়, পরের সাহায্য পাইলে বা সাধিলে সেরূপ হয় না, বরং আরও নিস্তেজ ও অসহায় হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষার ও বিদ্যালয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরের প্রবাদ বাক্যটির অর্থ অধিক বোধগম্য হইবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার কি দ্রুত উন্নতিই হইয়াছে! পূর্ব্বে যেখানে একটি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, এখন সে স্থলে অন্ততঃ দুই তিনটি ছোট বড় স্কুল উঠিয়াছে—তালপাতা ও খাঁকের কলম ছাড়িয়া ছেলেরা স্লেট পেন্সিল বা পেন কাগজ ধরিয়াছে ; শিশুশিক্ষার পরিবর্ত্তে হয় ত ফার্ষ্ট বুক পড়িতেছে, মাদুর ফেলিয়া বেঞ্চিতে বসিতেছে—তা ছাড়া, ম্যাপ, গোলক, ফুটবল ক্রিকেট—প্রভৃতি বিলাতী বিদ্যালয়গুলির সরঞ্জামের ঢেউ সহর ডিঙ্গাইয়া পল্লিগ্রামে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন, সকলে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার যেরূপ সুফল আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই হইতেছে না। প্রকৃত শিক্ষার ফলে সে নিরেট ও দৃঢ় মানুষের পরিবর্ত্তে আমাদের চারিদিকে কি এক ফাঁপা ও হাল্‌কা চরিত্রের উদয় হইতেছে। বালকেরা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া কলেজে উঠিতেছে, প্রতি বৎসর কত ছাত্র বি, এ, এম, এ, উপাধি ধরিয়া বাহির হইতেছে—অথচ যে চরিত্রগঠন ও জাতীয় উন্নতি শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহার কিছুই ফলিতেছে না। ইহার কারণ, এই সব বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য আমরা অন্য জাতি দ্বারা বাহির হইতে পাইয়াছি। এই শিক্ষার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা যদি অন্তর্জাতীয় হইত, বালকেরা যদি কার্য্যতঃ শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দ্বারা সুফল ফলিত।

ইউরোপের সর্ব্বত্রও দেখা যায় যে, অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়গুলিও মানুষকে কার্য্যতঃ সাহায্য দিতে পারে না , ইহা কেবল ব্যক্তিগত বা জাতীয় চরিত্রগঠনে পথদর্শকস্বরূপ। বহুদিন হইতে সকলেরই এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, উত্তম শিক্ষানীতি বা রাজনীতি দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে সভ্য ও কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু উত্তমশিক্ষাপ্রণালী বা নিয়মের দ্বারা যদিও মানুষকে ভাল পথে রাখিবার চেষ্টা করা যায়, এবং উৎকৃষ্ট আইনের সাহায্যে মানুষের জীবন, স্বত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়, কিন্তু কোনরূপ কঠোর শাসনেই অলসকে পরিশ্রমী, অমিতব্যয়ীকে মিতব্যয়ী ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী করিতে পারে না। এইরূপ আমূল উন্নতি কেবল ব্যক্তিগত কার্য্যশক্তি বা স্বার্থত্যাগের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

মানব ইতিহাসের সকল কালেই দেখিতে পাই যে, সকল জাতির শাসনরীতি সেই সেই

জাতির লোক সমাজের চরিত্রের প্রতিকৃতি মাত্র। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ভালমন্দ জাতীয় চরিত্রের সমষ্টি দ্বারা সেই সেই জাতির আইন কানুন স্থিরীকৃত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভাল লোকেরা ভালরূপে, আর মন্দেরা মন্দরূপে শাসিত হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে, কোন জাতির বা রাজ্যের শক্তি তাহার শাসন-প্রণালী অপেক্ষা লোক সমাজের চরিত্রের উপরই অধিক নির্ভর করে। এমন কি, মানব জাতির সভ্যতাও মানব সমাজের স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের আত্মোন্নতি দ্বারাই সাধিত হয়।

জাতীয় অবনতি যেমন ব্যক্তিগত অলসতা, স্বার্থপরতা ও পাপের ফল—জাতীয় উন্নতিও সেইরূপ ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কার্য্যক্ষমতা ও সততার সমষ্টিমাত্র। যে সকল সামাজিক কুনীতি দেখিয়া আমরা মনস্তাপ পাই, তাহাও অধিকাংশ স্থলে মানুষেরই কলুষিত ও অকর্ম্মণ্য জীবনের শাখা প্রশাখা। অনেকে আইনের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু যতদিন না মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অবস্থা আমূল বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়, ততদিন উহা কোন না কোন প্রকারে বাড়িতে থাকিবে। গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনকালে—উহাতে রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক বিষয়েরও আন্দোলন হইবে পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। যে সকল দেশহিতৈষী ভ্রাতারা ঐ মহৎকার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যদি অল্প সময়ও দেশীয় লোকদিগকে কার্য্যমূলক জ্ঞান ও আত্মোন্নতির শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদারতা অধিকতর উচ্চ, স্বদেশপ্রেম অধিকতর গভীর ও তাঁহাদের সাধু চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

মানুষ নিজেকে ভিতর হইতে যেরূপে শাসন করে—তাহারই উপর ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তি যত নির্ভর করে, বাহিরের শাসনের উপর ততদূর করে না। মানুষের পক্ষে নৈতিক অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও পাপাভ্যাসের দাস হওয়া যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখজনক, যথেচ্ছাচার রাজার অধীনে ক্রীতদাস হওয়াও সেরূপ নয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ে দাসত্ব ধারণ করে, রাজা বা শাসন-রীতির পরিবর্ত্তনে সে কখন স্বাধীন হইতে পারে না।

সকল সভ্যজাতিই বহু শতাব্দীর চিন্তাশীল ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা—সামান্য কৃষক হইতে অভিজ্ঞ দার্শনিক পর্য্যন্ত—সকল প্রকার শ্রমশীল ও কার্য্যকরী মানুষই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথিয়া থাকে। এক পুরুষের অবসানে আর এক পুরুষ—আর এক বংশ আসিয়া ঐ গুরু কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এইরূপে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারা সকল জাতির বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ম ও প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

এই কার্য্যতঃ শিক্ষা দ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছা ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত চরিত্রে যেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ অতি অল্প জাতির মধ্যেই দেখা যায়। উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই সাধারণ ও সামান্য শ্রেণীর ভিতর হইতে চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির উৎপত্তি হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে, দোকানে, রাস্তায় ও কারখানায় মানুষ কি কার্য্যতঃ শিক্ষা পায়, তাহাই আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। সকল জাতির এইরূপ কার্য্যতঃ শিক্ষাকেই জর্ম্মণ পণ্ডিত শিলর[২৩] মানবজাতির প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গিয়াছেন। কার্য্য,

সদাচার ও আত্মসংযমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে পারে—উহাই মানুষকে জীবনের সকল কর্ত্তব্য প্রকৃষ্টরূপে সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। যাবতীয় মহৎ চরিত্রের আখ্যায়িকা পড়িয়াও আমরা এই জ্ঞান শিক্ষা পাই যে, মানব জীবন—অধ্যয়ন অপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা, সাহিত্য অপেক্ষা আদর্শ দ্বারা, জীবনী অপেক্ষা চরিত্র দেখিয়া অধিক কার্য্যমূলক জ্ঞানলাভ করে। আর ঐরূপ অভিজ্ঞ লোকসমাজের সমষ্টিতেই মানবজাতি ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকে।

জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কার্য্যমূলক জ্ঞানের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে। আমরা কে, কোথায় আছি, আমাদের শক্তি কতদূর, আমরা কি কাজ করিতে সমর্থ—এই সব গুরু বিষয়ে উহাই আমাদের মনকে সর্ব্বদা চিন্তাশীল রাখে। উহাই আমাদিগকে সুখময় কার্য্যের ন্যায় নিরানন্দ কর্ত্তব্যের দিকেও অগ্রসর করে। উহা আমাদিগকে গতানুশোচনা বা মনস্তাপের দ্বারা কার্য্যশক্তি বৃথা নষ্ট করিতে দেয় না। যদি আমরা একবার কোন কাজে বিফলকাম হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ অধিক সতর্কতার সহিত আবার সেই কাজ সাধিতে শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করেন, কল্পনাপ্রিয় লোকের মধ্যেই এই কার্য্যমূলক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। অবশ্য, অতিরিক্ত কল্পনায় মুগ্ধ ভাবুকদের পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে। কেন না, শরীরের ন্যায় মনেরও কখন কখন কেবল একটি অংশেরই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বামনদিগের বৃহদাকার হাত, পা ও মাথা তাহাদের দীর্ঘতা গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে, কল্পনাশক্তির সহিত কার্য্যমূলক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। কেননা, আমরা সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাই, যাঁহারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল।

বেকন[২৪] বলিয়াছেন—এই মানব জীবনের নাটকের মধ্যে কেবল ঈশ্বর ও স্বর্গের দূতেরা দর্শক হইবেন ; চিন্তাশক্তি ও কার্য্যশক্তির সর্ব্বদাই মিল থাকিবে। শনি ও বৃহস্পতি—এই দুটি প্রকাণ্ড গ্রহের যোগের ন্যায় বিশ্রাম ও পরিশ্রমের, চিন্তা ও কার্য্যের দৃঢ় যোগ থাকিবে। এইরূপ মিলনই কার্য্যমূলক জ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবনে আমরা এইরূপ কার্য্য ও কল্পনার যোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাই। কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারাই অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সব কর্ম্মিষ্ঠ বিখ্যাত ইংরাজদের মধ্যে আমরা সূতার কলের আবিষ্কারক স্যর রিচার্ড অকরাইট, চিফ জষ্টিস লর্ড টেণ্ডরডেন্[২৫] ও চিত্রকর টর্ণরকে[২৬] দেখিতে পাই। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই সব প্রসিদ্ধ ও পূজ্য ব্যক্তিরা জীবনারম্ভেও নাপিতের দোকানে কাজ কবিতেন!

এমন কি, সর্ব্বদেশ আদৃত শেক্সপীয়রও অতি সামান্য শ্রেণীতে জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহার পিতা কসাইয়ের কাজ করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি নিজেও পশম আঁচড়ানর কি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার নাটক সকল পড়িলে, তাঁহাকে শুধু

এক কাজের নয়—সকল কাজের ও সকল বিষয়ের কার্য্যপ্রধান জ্ঞানে দক্ষ বলিয়াই স্থির হয়। তিনি নিজ রচনায় সমুদ্র সম্বন্ধে এমন সব যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া নাবিকেরা তাঁহাকে এক জন নাবিক বলিয়াই স্থির করে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক লেখা পাঠে যাজক ও পুরোহিতেরা ভাবেন, তিনি নিশ্চয় কোন যাজকের কেরাণী ছিলেন। আবার তাঁহার অশ্ববিদ্যায় নিপুণতা দেখিয়া অশ্ব ব্যবসায়ীরা বলেন, তিনি ঘোড়ারও কাজ করিতেন। বাস্তবিক, জীবন নাটকে তিনি যে একজন প্রকৃত নট ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি জীবনে নানা খেলা খেলিয়া ও নানা দিক দেখিয়া যে অসীম কার্য্যমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক সমূহে আমরা সেই জ্ঞানেরই পরিচয় পাই। যত দিন মানব জগৎ থাকিবে, তত দিন উহাও অবিনাশী থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে।

আবার ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলে নৌবিদ্ কুক[২৭], ও কবি বরণের[২৮] আবির্ভাব দেখিতে পাই। বিখ্যাত বেন জনসন্‌ও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার জীবনের প্রথমে কার্য্যমূলক জ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মহৎ চরিত্রের ইতিহাস খুঁজিলে এইরূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ পাই, সকল স্থলেই কঠিন পরিশ্রম মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল।

শ্রম ব্যতীত কোন কর্ম্মেই পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। আত্মোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি—সকলে বিষয়েই শ্রমশীল হস্ত ও চিন্তাশীল মস্তক একত্র মিলিয়া জয়লাভ করে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মিলেও কার্য্যক্ষমতা ভিন্ন কেহ কখনই বিখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, উইলের দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কার্য্যজ্ঞান ও শিক্ষা উহা দ্বারা আত্মগত করা যায় না। লোকে অর্থ দিয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই টাকা দিয়া আত্মচর্চ্চা কিনিতে পারে না। সে জন্য, এই সব সামান্য শ্রমজীবীদের মধ্যে এত মহৎ চরিত্র দেখিয়া ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, মানুষের আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির জন্য কার্য্যমূলক জ্ঞান যত আবশ্যক, অর্থ বা পরের সাহায্য তত নহে। সুখময় ও সচ্ছল জীবন মানুষকে কষ্ট ও বিপদের সঙ্গে যুঝিতে শিখায় না। সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পালিত হইলে মানুষের উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতা চালনার অভাবে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতরূপে, যে দারিদ্র্য বা সঙ্কটপূর্ণ জীবনকে মানুষ মহাপাপ বলিয়া ভয় পায়, তাহাই আত্মসাহায্য দ্বারা মানবজীবনে শুভ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। জীবনযুদ্ধের এইরূপ ব্যক্তিগত কার্য্যমূলক জ্ঞানই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩০৮

বিধবার কাজ ও ব্রহ্মাচর্য্য

হিন্দু শাস্ত্র যেমন বিধবার জীবন যাপনের জন্য কঠোর বিধি প্রচলন করিয়াছেন, জগদীশ্বরও সেইরূপ তাঁহাদের জীবনের উচ্চব্রত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা বা ঔদাস্যবশতঃ একদিকে যেমন ব্রহ্মাচর্য্যার নিয়ম শিথিল হইয়া গিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ শিক্ষার অভাবে বিধবারা তাঁহাদের জীবনের কাজের দায়িত্ব বুঝিতে অক্ষম রহিয়াছেন। অবশ্য দুই চার জন এরূপ উদারস্বভাবা ও মহৎহৃদয়া মহিলা আছেন যাঁহারা আপনা হইতেই আত্মীয় স্বজনের সেবা ও পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রৌঢ়া ও প্রবীণা বিধবাদের কথা আমি বলিতেছি না, ভগবান হয় ত তাঁহাদিগকে সন্তান সন্ততি দিয়াছেন অথবা পরিণত বয়সে তাঁহারা নিজেঁই নিজ কাজ বুঝিয়া লইতে পারেন। আমি ভাবিতেছি ঐ হতভাগিনী বালবিধবাদের কথা। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বেই যাহাদের কাছে সংসার মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করে ; জীবনের সুখাস্বাদ গ্রহণের প্রারম্ভেই যাহাদের জীবন শ্মশানে পরিণত হয়—সেই অবলা, কোমলা, নির্দ্দোষী অথচ দুর্ভাগ্য বালিকাদের মুখের দিকে চাহিবামাত্রই আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য জগতে আর কোন দেশে নাই! মনে হয় এই অবোধ বালিকারা কি পাপ করিয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রকার তাহাদের প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন?

যদি বলি, যাহারা স্বামী কি পদার্থ বুঝে নাই, স্ত্রীর গুরুত্ব জানে নাই, সংসারের দায়িত্ব যখন মাথায় লয় নাই, সেই কুমারী বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া গৃহিণীর আসনে বসাইয়া দাও, উহারা জগতের অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া, সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন দ্বারা হাসিয়া খেলিয়া জীবন অতিবাহিত করুক ; তবে অমনি হিন্দু পিতাগণ দশমুখে শাস্ত্রের দোহাই দিবেন, অবশেষে চন্দ্রনাথ বাবুর "হিন্দুপত্নী" শীর্ষক প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন।[২৯] আমি হিন্দু শাস্ত্র অধিক পড়ি নাই, তাহার মূল বিধিগুলি জানি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকাট্য শাস্ত্রবিশ্লেষণ পড়িয়াছি। আর রামায়ণ মহাভারত পাঠেও জানিয়াছি পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যেও সন্তানহীনা বিধবাদের পুনরায় স্বামী গ্রহণের প্রথা ছিল। তা ছাড়া, চন্দ্রনাথ বাবুর 'হিন্দুপত্নীর' যথার্থ মর্ম্ম কয়জন বুঝিতে পারেন? যখন অনেক প্রবীণা ভার্য্যাও বহু বৎসর স্বামীর সঙ্গে ঘর করিয়াও পতিতে মিশিয়া যাইতে বা পতির আত্মীয়দিগকে নিজের করিয়া লইতে পারেন না, তখন যে ১২।১৩ বৎসরের বালিকা, বিধবা হইলেই—শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া—চিরজীবন সেই অপরিচিত বালক স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতে পারিবে ইহা যে একরূপ অসম্ভব।

কিন্তু আমরা জোর করিয়া স্বাভাবিক গতি রোধ করিয়া ঐ অপরিপক্ব জীবনটীকে যদি শুকাইয়া ফেলিতে চাই বা উহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে চালাইয়াও উহাকে সজীব রাখিতে চেষ্টা পাই, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ঐ বালিকাগুলির শিক্ষার অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যে দিন হতভাগিনীর স্বামী ইহলোক ত্যজিয়া যায়, সেই দিন হইতেই তাহার মনে যেন এই ভাব বদ্ধমূল হয় যে ভগবান তাহাকে অন্য প্রকারে জীবন যাপিবার জন্য ও অন্যরূপ লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য করিবার নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন। সংসার প্রবেশের

পূর্ব্বেই সে যখন প্রধান সংসারসুখে বঞ্চিত হইয়াছে তখন এ জগতের ঐহিক সুখসম্ভোগে তাহার আর কোন অধিকার নাই। নিষ্কামভাবে জীবন যাপিলে সাংসারিক সুখের অপেক্ষাও অধিক উন্নত আনন্দ ও বিমল শান্তি তাহার আয়ত্ত হইতে পারে। শরীর ও মনের সংযম, ইন্দ্রিয় দমন, পরের সেবা ও সাধারণের কাজে জীবন উৎসর্গ দ্বারা সে ইহজগতে প্রচুর শান্তি ও আনন্দ পাইবে, নতুবা তাহার জীবনে সুখের সহিত শান্তি, উল্লাসের সহিত আনন্দ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে, এক ভয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষা ও নিরাশার আগুনে যাবজ্জীবন জ্বলিতে থাকিবে। সেই কোমল অথচ হতাশাপূর্ণ প্রাণটীকে ইহজগতের মরুভূমি হইতে তুলিয়া স্বর্গের উপবনে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করুন, ইহজীবনের অস্থায়ী বাসনা আকাঙ্ক্ষা ত্যজিয়া যাহাতে সে পরজীবনের উচ্চ সুখশান্তিতে অধিকারী হইতে পারে, সংসারের ক্ষণিক উল্লাসের পরিবর্ত্তে পরকালের অনন্ত আনন্দে ডুবিতে পারে—সেই অক্ষয় অমর শান্তির জন্য ঐ জীবনগুলিকে প্রস্তুত করুন, দেখিবেন তাহাদের ভবিষ্যতে কি হইবে ভাবিয়া আর আমাদিগকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। এই মহৎ কাজ সাধনের জন্য বালবিধবাদের পিতামাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি অভিভাবকদিগকেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত একবার অভ্যাস হইয়া গেলে উহা সমাজের আর কঠোর শাসন বলিয়া কখনই বোধ হয় না। মাছ মাংস আহার না করা যে বিশেষ কষ্টকর তাহা নহে। উহা কিছুদিন না খাইলে আপনা হইতেই উহাতে একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। জৈনেরা ও পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা কখন আমিষ ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃই জীবহত্যা করিয়া আহারকে অতি গুরুতর পাপ মনে করেন। আত্মীয়ের মধ্যেও অনেক সধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিরামিষ আহার করেন। আর মোটা বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত হইলে স্ত্রীলোকেরা অতি চিকণ কাপড় পরিতে স্বতঃই লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। আবার প্রাণে বৈরাগ্য আসিলে কোন বিধবাই চুল কাটিয়া ফেলিতে বা সন্ন্যাসিনী সাজিতে অনিচ্ছুক হন না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যার এই বাহ্যিক উপকরণগুলি বিধবার জীবনে কি প্রকারে আনিতে হইবে? আমার মতে জীবনে বৈরাগ্য আনয়নের একমাত্র উপায় জ্ঞান ও কাজশিক্ষা। অজ্ঞান ও নিষ্কর্ম্মা জীবন দ্বারা এ জগতের যত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

অধিকাংশ প্রবীণা স্ত্রীলোকদের স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গেই মনে একটা দারুণ বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসিনী করিয়া দেয়। তাঁহারা পতির সঙ্গেই জীবনের যত বাসনা কামনা ও সুখাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান ও দুর্ব্বল তাঁহারা নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষা করেন, আর যাঁহাদের শিক্ষা ও শান্তি আছে, তাঁহারা কার্য্যস্রোতে জীবন ভাসাইয়া পরহিতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন।

কিন্তু শিক্ষাহীনা শক্তিহীনা ও উদ্দেশ্যবিহীনা বালবিধবাদের জীবনে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতেই কাজের ও ব্রহ্মচর্য্যার দিকে লওয়ান যে কত গুরুতর ব্যাপার তাহা লিখিয়া বুঝান অসাধ্য। সমাজের শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের জন্য আইনের দরকার হয় না, মূর্খ বা অজ্ঞান ব্যক্তিদের মধ্যেই চৌর্য্য বা হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য নিবারণের নিমিত্ত আইনের দণ্ডবিধান করিতে হয়। সেইরূপ অবোধ বালবিধবাদের জন্যই

শাস্ত্রের বিধান আবশ্যক। কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন—জ্ঞান ও সংযমশিক্ষা।

নানারূপ সুশিক্ষা পাইয়া যে মনটী মার্জ্জিত, উন্নত ও সংযত হইয়াছে তাহার কাছে কোন মন্দ অভ্যাস ত্যাগ বা শারীরিক সুখ আরাম ও আয়েস বিসর্জ্জন দেওয়া বেশি কষ্টকর বোধ হয় না। আমি দেখিয়াছি দু একটী অজ্ঞ ও অশিক্ষিতা বিধবাকে শুভ্রবেশ পরাইবার জন্য আত্মীয়দিগকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু যে বালিকাদিগকে পিতামাতা প্রথম হইতেই সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে প্রণোদিত করেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া পরসেবায় ও জগতের কাজে জীবন সমর্পণ করেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বালিকারা বিধবা হইবামাত্র, তাঁহারা যে সংসারের আবর্জ্জনা নন, কোন বিশেষ কাজের জন্য আদিষ্ট হইয়া জগতে আসিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

ব্রহ্মচর্য্যা কথাটী যত সহজ কাজটী তত নয়। বাহ্যিক অপেক্ষা আন্তরিক বৈরাগ্যই অধিক ফলপ্রদ। শারীরিক ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে মনের বাসনা, কামনা ও সুখাশা বিসর্জ্জন দেওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। এরূপ বৈরাগ্য দুর্ব্বল ও অসংযত মনে কখন স্থান পায় না। সে কারণে প্রথম হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ঐ কোমল মনগুলিকে সবল ও সংযত করিয়া উহাদিগকে নিষ্কাম ভাবে পরের জন্য কাজ করিতে শিখাইলে তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক মহৎ কাজ সাধিত হইতে পারিবে। ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুমারীদের দ্বারা সাধারণের যে সব উপকার সাধিত হয়, আমাদের দেশের বিধবারা শিক্ষা পাইলে অনায়াসে সেই সব কাজ করিতে পারিবেন। যাঁহাদের কোনরূপ সংসার-বন্ধন নাই, স্বামীসন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নাই, তাঁহারা সরলপ্রাণে জগতের কাজে জীবন উৎসর্গিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা বিধবাদের এই কার্য্যশক্তি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।

বোম্বাইয়ের সারদাসদন, পুনার বিধবাআশ্রম ও কলিকাতার শিল্পসমিতি[৩০] স্থাপন দ্বারা যে মহোদয়ারা বিধবাদিগকে নানারূপ বিদ্যা জ্ঞান ও শিল্পকার্য্যে সুশিক্ষিতা করিয়া তাঁহাদের জীবনে নূতন কাজের পথ ও জীবিকার উপায় খুলিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্রী। কিন্তু এত বড় দেশে ২।৩টী বিধবাশ্রমে কি হইবে? তাঁহাদের জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রতি নগরে এক একটী আশ্রম বা শিক্ষালয়ের আবশ্যক। ঐসব শিক্ষালয়ে শিক্ষা পাইয়া তাঁহারা সকল কার্য্যে পারদর্শিনী হইলে সহজেই তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবেন। এদেশে যেসব অঞ্চলে অবরোধ প্রথা নাই সেখানেও বিবাহিতা মেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রচলন নাই, সুতরাং অন্তঃপুর-শিক্ষার ভাব বিধবাদিগকেই লইতে হইবে।

তাহা ছাড়া প্রতি গৃহে রোগীদের সেবা সচরাচর বিধবারাই করিয়া থাকেন। এই মহৎ কাজটী উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে উহার জন্য যে কত শিক্ষা, ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সে কারণে এই সেবাব্রতের জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিধবাদের জন্য শিক্ষালয় থাকা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশে এখনও ভদ্র হিন্দু

বিধবারা হাসপাতালে গিয়া সেবিকা বা নার্সের কাজ শিখিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এই সব গুরুতর কাজের ভার লইতে হইলে প্রথমে বিধবাদের চরিত্রগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান—স্বার্থত্যাগ ; দ্বিতীয়—আত্মশাসন ; তৃতীয়—আত্মবিসর্জ্জন। এ জগতে যে ব্যক্তি যতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহা দ্বারা ততখানি বেশি পরের কাজ হয়। মানব-মনের কর্ষণের সঙ্গে স্বার্থের ইচ্ছা দূর হইলেই উহা স্বতঃই পরার্থের দিকে ধাবিত হয়। তখন হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যত মলিনতা অন্তর হইতে চলিয়া যায়। আত্মশাসন দ্বারা সংযমশিক্ষা হয় ; যে-কোন কুবাসনা বা অসৎ প্রবৃত্তি মনে উদিত হইবা মাত্র উহা দমিত হইলে মন সুসংযত ও চরিত্র সবল হয়। স্বার্থবর্জ্জিত ও আত্মশাসিত মনের কাছে আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ কাজ হইয়া আসে। একটী অসংযত মনে সামান্য পানখাওয়ার অভ্যাসটী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কত কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু একটী সুশাসিত মন আফিমের নেশা পর্য্যন্ত অনায়াসে ছাড়িতে পারে। ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সংযত মনের শক্তি কত প্রবল, ও সুশাসিত চরিত্র কত সবল। সে কারণে প্রথম হইতেই বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা সংযম শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের চরিত্র গঠন করিলে তাঁহারা এ জগতে নিরাপদে আপন আপন কাজ করিয়া যাইবেন, ইহাতে সমাজেরও প্রচুর লাভ হইবে ও দেশেরও মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।*

প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮

*[এই প্রবন্ধেব প্রতিবাদে লিখিত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পত্রটিব জন্য পরিশিষ্ট ২ অংশের তৃতীয় লেখাটি দেখুন।]

চিন্তা ও কাজ

সেক্সপিয়রের "মার্চেন্ট অফ ভেনিসে" পোরসিয়া যখন তাঁহার সহচরীকে বিষণ্ণভাবে বলিতেছেন—কোন কাজের ইচ্ছা করার ন্যায় কাজ সম্পাদন করা যদি সেইরূপ সহজ হইত, তাহা হইলে ছোট ছোট উপাসনা গৃহগুলি বড় বড় গির্জ্জা হইত, দরিদ্রের কুটীরগুলি রাজপ্রাসাদ হইত। সে কারণে আমার মনে কোন বড় কাজ সাধনের ইচ্ছা বা চিন্তা উঠিলেই আমি পোরসিয়ার ঐ বাক্যটী স্মরণ করিয়া এই বিশাল জগতে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্রশক্তির কথা ভাবি। অথচ এই ক্ষুদ্র শক্তির সমষ্টিতেই ত পৃথিবীতে কত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও ত আমাদের ভাবিবার বিষয়।

চীন দেশের উত্তরদিকে ৮০০ ক্রোশব্যাপী অভেদ্য প্রাচীর, মিশরের কীর্ত্তিস্তম্ভ পিরামিড সকল, জগন্নাথের মন্দির ও আগরার তাজমহল—এ সব ত ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শক্তি সমষ্টিরই ফল। বর্ত্তমানকালের বহুদেশব্যাপী রেলওয়ে এবং তাড়িতের দ্বারা সংবাদও মানববুদ্ধির শক্তির বলে সাধিত ও চালিত হইতেছে। প্যারিসের ইফেল টাওয়ারও ঐ শক্তিসমষ্টির ফল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবের দ্বারা ঐ সব বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইতে যে কত দৃঢ় শক্তি ও কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা কি আমরা একবারও চিন্তা করি। দেশ ভ্রমণ কালে কলের গাড়ীতে কত দ্রুত এ দেশ ও দেশ দেখিয়া বেড়াই, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া বা মানবের কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া কত পরিতৃপ্ত হই, কোথাও বা ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হই, কোথাও বা মানুষের কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই, অথচ ক্ষুদ্র মানুষের ভিতর যে এই বিরাট শক্তি নিহিত আছে, তাহা কয়জনে ভাবেন?

চিন্তা কাজের জননী স্বরূপ। চিন্তাশীল ব্যক্তির শক্তি ও উদ্যমের প্রভাবেই যত বড় বড় কাজ সাধিত হয়, যে দেশে যত অধিক চিন্তাশীল লোক আছেন, সেই দেশে তত অধিক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার ও নূতন কল কারখানার সৃষ্টি হয়। যে দুর্ভাগ্য দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব, সেখানে নূতন কাজেরও অভাব দেখা যায়। লোকে পুরাতন দ্রব্য ও পুরাতন কাজ লইয়াই নাড়াচাড়া করে।

আবার কোন বিষয় কাজে পরিণত করার তুলনায় উহা সাধনের চিন্তা বা ইচ্ছা করা যত সহজ, তার চেয়েও সেই বিষয়ে শুধু কথা বলা আরো সহজ, কেন না, তাহাতে বিন্দুমাত্র মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যক হয় না। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে বর্ত্তমান কালে আমরা এইরূপ চিন্তাহীন ও চিন্তাশীল, নিরুদ্যম বাক্যপ্রিয় ও উৎসাহী কর্ম্মক্ষম লোকের মধ্যে অসীম প্রভেদ দেখিতে পাই।

মুখের কথা বলিতে কিছুই খরচ হয় না, কিন্তু কাজ করিতে হইলে চিন্তার ও শক্তির আবশ্যক, পরিশ্রম ও অর্থের প্রয়োজন—সে কারণে দেখিতে পাই, অধিকাংশ লোক উপদেশ দিয়া ও কথা বলিয়াই খালাস হন। হাতে কলমে কাজ করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। কিন্তু শুধু কথার আড়ম্বর ও কাজের ঘটা আমাদের দেশে যত বেশী দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যান্য দেশে তত বেশী দেখা যায় না। জাপানীদের ত কথাই নাই, আজকাল চীনেরাও নিরুদ্যম জীবনের অপকারিতা ও কর্ম্মিষ্ঠ জীবনের উপকারিতা বুঝিয়া এখন সকলে

একজোট হইয়া কেমন কাজে অগ্রসর হইতেছেন; দেখিলে কত আনন্দ হয়!

ইউরোপের মধ্যে সাধারণ ইটালীয়েরা ও ফরাসীরা অপেক্ষাকৃত বাক্যপ্রিয়, সে কারণে কাজে তাহারা ইংরাজ ও জর্ম্মণদের অনেক নীচে পড়িয়া আছে। আবার জর্ম্মণ পণ্ডিতের তুলনায় ইংরাজ পণ্ডিতেরা তত গভীর চিন্তাশীল না হইলেও তাঁহারা নিজ নিজ উদ্ভাবনাগুলিকে (Theories) কার্য্যতঃ জ্ঞানে (Practical wisdom) পরিণত করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের যশও অধিক দূর পর্য্যন্ত ঘোষিত হয়। উদ্ভাবনা শক্তি ও কার্য্যতঃ জ্ঞানের প্রভেদ এই যে, একটী কেবল মানবের মনেই চিন্তাতে আবদ্ধ থাকে, অপরটী কাজের সঙ্গে যোগ হইলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগতের উপকার সাধন করে। জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মানবজাতির উপর কার্য্যতঃ জ্ঞান ও কাজের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়।

একজন মানুষের কাজের জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি তাঁহার চারিদিকের সমস্ত লোককে টানিয়া কাজে অগ্রসর করায়, একটা জাতির কার্য্যক্ষমতা দ্বারা অপর জাতিরা স্বতঃই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধনে তৎপর হয়। কার্য্যশক্তিই মানবজীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে। আমরা কি—কোথায় আছি—কেন জগতে আসিয়াছি—আমাদের কতদূর শক্তি—আমরা কি কাজ করিতে পারি—উহাই সর্ব্বদা আমাদিগকে ঐ সব স্মরণ করাইয়া কাজে অগ্রসর করায়। কার্য্যতঃ জ্ঞানই মানুষকে সকল কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত করে। উহাই আমাদিগকে গতানুশোচনা ও মনস্তাপের দ্বারা বৃথা শক্তি নষ্ট করিতে দেয় না। যদি আমরা একবার কোন কাজে বিফল হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে পুনরায় অধিক সতর্কতার সঙ্গে সেই কাজের সহিত যুদ্ধ করিতে শিখায়।

অনেকে মনে করেন, কল্পনাপ্রিয় লোকদের মধ্যে কার্য্যতঃ জ্ঞান বা কার্য্যশক্তি প্রায় দেখা যায় না। অবশ্য, অতিরিক্ত কল্পনায় মুগ্ধ মানুষের পক্ষে এ ধারণাটি কতক সত্য হইতে পারে। কেন না, মনের ও শরীরের ন্যায় কখন কখন কেবল একটী অংশের বৃদ্ধি দেখা যায়। বামনদের বৃহদাকার হাত পা ও মাথা যেমন তাহাদের দীর্ঘতা গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ অনেক সময়ে অতিরিক্ত উদ্ভাবনা বা কল্পনাশক্তি মানবের কার্য্যশক্তি নাশ করে।

কিন্তু তাই বলিয়া কল্পনাশক্তি ও কার্য্যতঃ জ্ঞানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই এ কথা মনে করা ভ্রম। চিন্তা ও কল্পনা ব্যতীত কাজের উদ্ভাবনা বা আবিষ্কার হইতে পারে না, আর জগতেও আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, যে সকল কার্য্যক্ষম লোকেরা জীবনে মহৎ কাজ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই চিন্তাশক্তি প্রবল ছিল।

বেকন বলিয়াছেন—"এই মানবজীবনের অভিনয়ে কেবল ঈশ্বর ও স্বর্গীয় দূতেরা দর্শক। চিন্তাশক্তি ও কার্য্যশক্তির সর্ব্বদাই মিল থাকিবে ; শনি ও বৃহস্পতি এই দুই প্রকাণ্ড গ্রহের যোগের ন্যায় মানুষের মধ্যে বিশ্রাম, পরিশ্রম, কল্পনা ও কার্য্যের দৃঢ় যোগ থাকিবে।" এইরূপ যোগের দ্বারাই কার্য্যতঃ জ্ঞানের ও কাজের বিস্তার হইবে।

এই যে আমাদের দেশের রাজা, আমাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ইংরাজ জাতি—বুদ্ধিতে বাঙ্গালী তাঁহাকেও পরাস্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ইংরাজ যুবকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালীর জয়লাভই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু এত বুদ্ধি, এত উচ্চ শিক্ষা ও এত শ্রেষ্ঠতার

মধ্যেও আমরা—যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি। আশা করি সুপ্রভাতের শুভ্র আলোক আমাদের দেশের এই অন্ধকার দূর করিতে সাহায্য করিবে।

এখন দেখা যাক, এত বুদ্ধির প্রাধান্য সত্ত্বেও আমরা কার্য্যতঃ জ্ঞান ও প্রকৃত কাজে এত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি কেন? সব জাতির উন্নতির ক্রমবিকাশ দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বুদ্ধির সঙ্গে কাজের, মনের সঙ্গে শরীরের যোগ না হইলে কোন মানুষের বা কোন জাতির অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনা বা নূতন কলের আবিষ্কার করিলে, দশজন কর্ম্মিষ্ঠ লোক তাহার অনুশীলন ও পরীক্ষা দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হন। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা যতক্ষণ না তাহাতে সফল হন, ততক্ষণ তাঁহারা ক্ষান্ত হন না। এইরূপ কার্য্যশক্তি চালনায় এবং কার্য্যতঃ শিক্ষার দ্বারা একটি গভীর কল্পনা ১০০ জন লোকের মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। উহা যেন সকলেরই নিজস্ব হয়, সবাই একজোট হইয়া সেই তত্ত্বের মীমাংসা সাধনে বা সেই আবিষ্কারের সুফল দর্শনে দৃঢ়সংকল্প হয়। এরূপ সমবেত শক্তি ও অধ্যবসায়ের কাছে অসাধ্যও সাধ্য হইয়া উঠে। এই প্রকারে বড় বড় কাজ সাধিয়া সভ্য জাতি আরো উন্নত, ও শ্রেষ্ঠ জাতি আরো প্রধান হয়।

গত শতাব্দীর কাজের ইতিহাসে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকায় এই একজোট কার্য্যশক্তির অনেক উদাহরণ দেখিতে পাই। রেলওয়ে তাড়িত-বার্ত্তা ও বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি এখন আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য বিষয়গুলি সবই উনিশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত ও কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। এক এক জন উহার আবিষ্কারক বটে, কিন্তু কত হাজার লোকের একজোট কাজের দ্বারা উহা মানুষের এরূপ আজ্ঞাবহ হইয়াছে, আর মানবজাতির কত উন্নতিসাধন করিতেছে। এ সব ত গেল জগৎব্যাপী কাজ। ভিন্ন ভিন্ন দেশেও অনেক বড় বড় কাজ মানুষের এই একজোট শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতীয় একজিবিসন, প্যারিসের জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনী, চিকাগোর মহামেলা—এ সবও গত শতাব্দীর সমবেত কার্য্য সমষ্টির ফল। এরূপ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাজের চিন্তা ও সম্পাদনে মানুষের মনের ক্ষুদ্রত্ব চলিয়া যায়। ব্যক্তিগত দ্বেষ, হিংসা ভুলিয়া সব প্রাণ হইয়া খাটিতে থাকে। এই প্রকার দেশব্যাপী কাজের দ্বারাই মানুষের মন আরো উচ্চ ও মানব জাতি প্রকৃত উন্নত হইতে পারে। উহা দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পের ও কলকারখানার চালনে জাতিগত শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে।

যে জাতির মধ্যে চিন্তার সঙ্গে কাজের, মনের সঙ্গে শরীরের যোগ নাই—সে জাতি হাজার বুদ্ধিমান হইলেও কখন পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে, ইহা আশা করা যায় না। আমাদের মধ্যেই তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই। পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাদের এই দুরবস্থার ভিতরেও মাঝে মাঝে ২।৪টী চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। কেহ বা একটী নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিতেছেন, কেহ বা নূতন রসায়ন, কেহ বা অঙ্কের মূল (Origin) দেখাইতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তাঁহাদের সে মহৎ উদ্ভাবনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত একজোট শক্তির বড়ই অভাব। আমাদের মাথা আছে হৃদয় নাই, দেহ আছে শক্তি নাই, ইচ্ছা আছে একতা নাই। এই কারণে

আমরা মিলে মিশে কাজ করিতে একেবারেই অক্ষম। একজন মহৎ চিন্তাশীল লোকের উদ্ভাবনাকে আমরা আমাদের দেশের গৌরব ভাবিয়া নিজস্ব করিয়া লইব, কোন লোকের আবিষ্কৃত যন্ত্রের পরীক্ষায় নিজ নিজ প্রাণ সমর্পণ করিব—এইরূপ উন্নত বাসনা যেদিন আমাদের মনে স্থান পাইবে ; চিন্তার সঙ্গে যেদিন আমাদের দেশে কাজের যোগ হইবে, মাথার সঙ্গে দেহের যোগ হইবে, সেই দিন বাঙ্গালী জাতির 'সুপ্রভাত' হইবে।

সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৯

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল

প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক একটি নারী সমিতি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ, ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক ও অবস্থাগত উন্নতি সাধন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে (১) ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রীজাতিকে একত্র করিবার জন্য ইহার সভ্যদের মধ্যে সাময়িক মিটিং ডাকা হয়। (২) ভারতবর্ষীয় নারীদিগের চারদিকের অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। (৩) ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে ভারতমহিলাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি হয় ও সদ্‌গ্রন্থ সকল স্বল্পব্যয়ে ও সহজে তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে "পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার" নামে ডিপো খোলা হইয়াছে। ঐরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণ পোষণের সুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই মহাসমিতির শাখা স্থাপিত করিয়া যাহাতে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য সকল প্রদেশে ও সকল নগরে সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার শাখা লাহোর, করাচী, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে খোলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সেক্রেটারীগণ উদ্যোগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাজ চালাইতেছেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল কলিকাতায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা স্থাপিত হইয়া স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৯১১ সালে শ্রীমতী সরলা দেবী কলিকাতায় আসিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে মিটিং ডাকিয়া বঙ্গ মহিলাদের নিকট এই মহা সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতা মহিলা সাগ্রহে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দেড় বৎসরের উপর কলিকাতায় অন্তঃপুর শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রথমে ৬ জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১৬টী বয়স্থা বালিকাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, এখন প্রায় ২০ জন শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে ১২০টী বিবাহিতা স্ত্রীলোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ছাড়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে সমিতি কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে একটী ছোট বালিকাদের জন্য স্কুল খুলিয়াছেন, ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা এখন ৫০ জন। ৩ জন শিক্ষয়িত্রী ইহার কাজ চালাইতেছেন।

নারী জাতির হিতকারী যত প্রকার কার্য্য এ পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে তার মধ্যে নারীর সাহায্যে নারী জাতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা এই প্রথম। এই প্রথম প্রয়াসেই যেরূপ সফলতা লাভ করা যাইতেছে তাহাতে আশা হয়, অচিরে এই সমিতির দ্বারা দেশের একটী প্রধান অভাব দূর হইবে। আর ভারতের সমস্ত স্ত্রী-জাতি এক বাঁধনে বদ্ধ হইয়া পরস্পর

পরস্পরের উন্নতির সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইবে।

কলিকাতার শাখা সমিতিতে প্রায় ৬০০ জন মেম্বর হয়েছেন। জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে যে কোন স্ত্রীলোক এই ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করিবেন তিনিই ইহার সভ্য হইতে পারেন। ইহার মেম্বরগণের প্রবেশিকা ফি ১্ এক টাকা মাত্র, আর বার্ষিক চাঁদা ১্ এক টাকা। বৎসরেক ১০ টাকা চাঁদা দিয়া প্রায় ৮০ জন মহিলা মুখ্য মেম্বর হয়েছেন।

অন্তঃপুরস্থ নারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে শিক্ষয়িত্রীদের পারিশ্রমিক লওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ সমিতির ফণ্ড বৃদ্ধি হইলে গৃহস্থ ও দরিদ্রপরিবারদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখন আশা করা যায়, ভারতের সমস্ত নারী উদ্যোগী হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্যকে স্থায়ী করিবেন। আর ইহা দ্বারা দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

মহিলা, কার্ত্তিক ১৩১৯

জলন্দর কন্যা-বিদ্যালয় *

আমরা প্রতি বারেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধিবেশনে বঙ্গীয় বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে' থাকি, এবারে জলন্দর কন্যা-মহাবিদ্যালয় ও পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে আপনাদের কিছু বলতে ইচ্ছা করি। আমি এ পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়টি দেখি নাই, কিন্তু গত সালে আর্য্যসমাজের যে পাঁচটী মেয়ে সেখান থেকে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপে ও কথাবার্ত্তায় যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছি তাই আজ আপনাদের জানাব।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক জলন্দরে কন্যা-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এটী বালিকাদের দৈনিক স্কুলই ছিল ; ক্রমশঃ ইহার সঙ্গে কন্যাশ্রম (বোর্ডিং), বিধবাশ্রম ও অনাথাশ্রম যুক্ত হওয়াতে বিদ্যালয়টীকে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী করে' তোলা হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে এখানে ৪২৫টী বালিকা ও বয়স্থা মহিলা শিক্ষা পাচ্ছেন। তার মধ্যে ১৫০টী কন্যাশ্রমে থাকে, ৫০টী বিধবাশ্রমে ও ১০০টী অনাথাশ্রমে বাস করে। অবশিষ্টগুলি দৈনিক ছাত্রী। এই মহৎ শিক্ষাকার্য্যে ১০ জন পুরুষ শিক্ষক ও ১৫ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই সেখানকারই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, সেজন্য তাঁরা ঐ কাজ ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করে' উহার উন্নতির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আর্য্যসমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে' বা ভিক্ষা দ্বারা চাঁদা তুলে এই স্কুলটী চালাচ্ছেন। বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ বড় হওয়াতে স্কুল-কমিটি জলন্দর সহরের এক ক্রোশ দূরে প্রায় ৫০ বিঘা জমি কিনেছেন। সেখানে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য নানা স্থান হ'তে অর্থ সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। এ দেশ থেকেও তাঁরা প্রায় দশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গেছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ন্যায় তাঁদেরও মুখ্য বাক্য—ভগবানে নির্ভর করে' যে যার কর্ত্তব্য করে' যাও, তিনিই ফলাফলের কর্ত্তা।

জলন্দর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ধর্ম্মনীতি ও ব্রহ্মচর্য্য শিখান হয়। কন্যাশ্রম ও বিধবাশ্রমের মেয়েরা প্রত্যহ বেদপাঠ, স্তবগান প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করতে বাধ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে শিখে। এইরূপে আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ হওয়াতে এই অল্প সময়ের মধ্যে পাঞ্জাবী নারীদের ভিতরে যে কিরূপ স্ত্রীশক্তি জেগে উঠেছে তা দেখলে বাস্তবিক আমরা আনন্দের সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ করি। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-জাতির যেরূপ উন্নতি হয়েছে, বাঙ্গালা দেশে ৬০ বৎসরে তা হয় নাই।

ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কুমারী ও বিধবা কন্যারা অল্প বয়স হতেই ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বদেশের জন্যে ও স্বজাতির উন্নতির জন্যে সুখারাম বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

* গত ডিসেম্বর মাসে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শেষ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আর্য্যসমাজের শিক্ষিতা মহিলারাই সর্ব্ব প্রথম প্রচারিকা হয়ে মহল্লায় মহল্লায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়ে মূর্খ ও দরিদ্র নারীদের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। সেই সমাজের মেয়েরাই কত কষ্ট ও অসুবিধা সহে দেশে দেশে চাঁদা সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। কি তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা! কি তাঁদের মনের তেজ! কি তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে, বিনা আত্মবিসর্জ্জনে, বিনা ত্যাগে আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এ শক্তি কোথায় পাব?

ঐ পাঞ্জাবী মেয়েদের উদাহরণ দেখে কি আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি না যে আর্য্যসমাজের জলন্দর-মহাবিদ্যালয়ে যে প্রথা অবলম্বন করে' স্ত্রীশিক্ষা চলছে উহাই ঠিক পথ। আমাদেরও সেই শিক্ষাপন্থা ধরে' চলা উচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পাঞ্জাবের চেয়েও কত বেশি শিক্ষা বিস্তার হয়েছে, এ প্রদেশে শতকরা ৪ জন মেয়ে লিখতে পড়তে পারে, সে দেশে ২০০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র। আমাদের মধ্যে কত মেয়ে উপাধি পেয়েছেন, কত বালিকা সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ হয়েছেন, কতজন ডাক্তারও হয়েছেন—কিন্তু বঙ্গমহিলার সে মনের বল, হৃদয়ের উচ্চতা, প্রাণের গভীরতা কোথায়? প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষকে মানুষ করা', মানুষের ভিতর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা, মানুষকে পার্থিব লাভালাভের উপরে তুলে দেবতার আসনে বসান। ঐ পাঞ্জাবী মহিলাগুলি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দ্বারা দেহের শক্তি ও আত্মার তেজ লাভ করেছেন, যাহা দ্বারা তাঁরা শত শত পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন, কত পথ হেঁটে পল্লীতে পল্লীতে পরিদর্শন করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কত মিতাহারে কঠোর শয্যায় দিবারাত্রি যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, দেশের কাজের জন্য, নারী জাতির উদ্ধারের জন্য, তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা ভারতীয় জননী গঠন করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এত শিক্ষিতা হয়ে ও এত শিক্ষার সুযোগ পেয়েও আমরা পাঞ্জাবী ভগিনীদের ন্যায় মনের বল ও হৃদয়ের তেজ সঞ্চয় করতে পারছি না কেন? প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে একটা কথা বল্‌তে হলে আমরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, রাস্তায় এক পা চল্‌তে হলে আমাদের যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়! তাঁদের সাদাসিদে পরিচ্ছদের কাছে আমাদের পোষাকটা পর্য্যন্ত যেন আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়! এই-সব দেখে স্পষ্টই বোধ হয় আমরা যে-পথ ধরে' চলেছি, ভারতীয় নারীর পক্ষে তাহা প্রকৃত আদর্শস্বরূপ ঠিক পথ নয়। এ পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কেবল পাশ্চাত্য বা বিলাতীর অনুকরণেই হয়েছে; অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ইংরেজি স্কুলে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে শিক্ষা পাচ্ছেন। তার ফলে অনেক মেয়ে ড্রইংরূমে অতি সুন্দর ইংরেজী কথা কইতে ও পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারেন ; অনেক মহিলা বিলাতী আদবকায়দায় অতি সুন্দর ভাবে নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারেন—কিন্তু জীবনের কঠোর ব্রতসাধনে জয়ী হতে পারবেন কয়জন? প্রকৃত আদর্শ নারীর উচ্চাসনে বসবার যোগ্য হয়েছেন কয়জন?

অবশ্য আমি ২।৪টী বঙ্গমহিলা বাদ দিচ্ছি, যাঁরা সকল বিষয়েই পারদর্শিনী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের দেখে আমাদের ইহা স্পষ্ট বোধ হয়েছে যে পাশ্চাত্য

অনুকরণে শিক্ষা আমাদের ভারতীয় রমণীর পক্ষে কিছুমাত্র হিতকরী নয়। আমরা বহুকাল অশিক্ষা ও অবরোধের মধ্যে থেকে দেহের শক্তি ও মনের বল ও সাহস হারিয়েছি। আমরা যে-শিক্ষা দ্বারা সেই স্ত্রীশক্তি ফিরে পাব, যার চর্চ্চায় ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে, যে-সংযমের দ্বারা আমরা সকল অবস্থায় নিজেদের সমান ভাবে চালাতে পারব, যাতে আমাদের সংকীর্ণ মন প্রশস্ত ও উদার হয়ে সকলকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারবে—যাতে আমরা পরস্পরের দোষ ক্ষমা ও গুণ গ্রহণ করতে শিখব—সেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষাপ্রথা আমাদের মধ্যে চলিত করতে হবে। .

পাঞ্জাবী মেয়েদের দেখে ইহাও স্পষ্ট বুঝা গিয়েছে যে, আমাদের এ প্রদেশের নারীর উচ্চশিক্ষা বাহিরের দিকে খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু আপনারা তলিয়ে দেখবেন ইহা অন্তঃসারশূন্য। এ শিক্ষা দ্বারা আমাদের মনের বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি না বেড়ে আরো কমে যাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় যতই শিক্ষার অভিমান করি না কেন, যতদিন না আমরা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী বর্জ্জন করে' ভারতীয় বা প্রাচ্য ভিত্তির উপর শিক্ষাপ্রথা স্থাপিত করব, আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ করব, ততদিন আমাদের প্রকৃত শিক্ষা বা উন্নতি কখনই হতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ২।১টী মেয়ের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবে বাঙ্গালীমেয়েরা কখনই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

উপসংহারকালে মাননীয় লর্ড বিশপের কথাগুলি উদ্ধৃত না করে' থাকতে পারছি না। গত সপ্তাহে ডায়োসিসন বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাইজ-বিতরণ-উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন—ভারতীয় নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী কখনই ঠিক হবে না। আদর্শ রমণীর উদাহরণ খুঁজবার জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে যাবার দরকার নাই। এ দেশের মহিলারা যে রকম উচ্চ ধর্ম্মের, সতীত্বের ও শাসনকার্য্যের পর্য্যন্ত আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, সে রকম জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। সেই-সব উন্নত নারীচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের অনুসরণ করে' চললেই বর্ত্তমান ভারতীয় কন্যাদের শিক্ষা যথেষ্ট ফলপ্রদ হবে।—তিনি বিদেশী হয়েও বুঝেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্য মহিলাদের পক্ষে কখনই প্রকৃত উপকারী হতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা অনেক সময় ছায়াটা ধরে প্রকৃত বস্তুকে হারিয়ে ফেলি। সে কারণে প্রথম থেকেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল যাতে পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করে বাঙ্গালী মেয়েদেরও তাঁদের মত শক্তিশালিনী করে গড়তে সক্ষম হয়, আমাদের সকলেরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২০

জগতে নারী

প্রেমের প্রতিমা, দয়ার সাগর,
করুণা-নির্ঝর, স্নেহের নদী।
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
পৃথিবীতে তুমি না থাকিতে যদি।

যে মহাত্মা উপরের কবিতাটী লিখিয়া নারীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই জগতে নারীর আসন যে কত উচ্চ তাহা অনেকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে যদি মায়ের স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ও স্ত্রীর আত্মসমর্পণ না থাকিত তাহা হইলে সংসার যে নিতান্তই মরুভূমিসম নীরস ও উত্তপ্তবালুকাময় বোধ হইত তাহা নিশ্চয়। কিন্তু দেশ, কাল, অবস্থা ও শিক্ষা ভেদে সকল দেশেই নারীজাতি যে ঐ উচ্চ আসন হইতে কত নীচে নামিয়াছে, পুরুষ যে নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, আমরা ক্রমশঃ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সমস্ত জগতের সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিতে বা বলিতে গেলে পুরাতন মহাদ্বীপের কথাই আমাদের মনে প্রথমে উদয় হয়। উহার মধ্যে আবার এশিয়া-মহাদেশ ও উহার সমাজ ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেজন্য এশিয়ার মহিলাদিগের বর্ণনা লেখা আমাদের প্রথম কাজ। কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, সুতরাং সমস্ত পৃথক-জাতীয় ভারতললনাদের বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া ও তাহার আলোচনা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের বাসভূমি এত বড় প্রকাণ্ড দেশ এবং ইহাতে এতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাহাদের এত বিভিন্ন আচার ব্যবহার, রীতিনীতি দেখা যায় যে, তাহা হইতে সমগ্র ভারতমহিলার চরিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থা সঠিক বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ কাজ যতদূর কঠিন ছিল, এখন রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সর্ব্বত্র যাতায়াতের ও মেলামেশার সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে ইহা ততদূর কষ্টসাধ্য বোধ হয় না।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক, বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক ও পাঞ্জাবী মহিলায় কখন দেখা সাক্ষাৎই হইত না। কিন্তু এখন কত মার্হাট্টীয় মহিলা বাঙ্গালায় বাস করেন, কত বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পাঞ্জাবে বা মহীশূরে যান। আমরা সকলেই যে ভারতে জন্মিয়াছি, এ ভাব এখন আমরা অনেকটা বোধ করিতে শিখিয়াছি। লোকে বলে "পৃথিবীর এক অর্দ্ধের লোক অন্য অর্দ্ধের অধিবাসীরা কিরূপে দিন কাটায় তাহা জানে না।"

কিন্তু বৌদ্ধ, মুসলমান, জড়োপাসক ও পার্সী নারীদের বাদ দিয়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কেবল হিন্দুনারীদের মধ্যেও এত প্রভেদ দেখা যায় যে, এক প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য প্রদেশের নারীদের বিষয় কিছুই জানেন না। এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে এত বিভিন্নতা ও অজ্ঞতা কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই দেখা যায়। এ অজ্ঞতা বা শৈথিল্যের কারণও খুঁজিতে হয় না। আমাদের দেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধন এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমাজে এত ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি চলিত ও উহা অপর দেশীয়

লোকের কাছে এতদূর অগম্য যে, এক প্রদেশবাসীদের পক্ষে অন্য ভাগের অধিবাসীদের বিষয় সমস্ত ভালরূপে জানা এক প্রকার দুঃসাধ্য। আবার অবরোধ প্রথা বশতঃ ভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় স্ত্রীলোকদের বিষয় জানিবার সুবিধা ও উপায় অতি অল্প।

আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, মনে করিতাম সকল হিন্দু স্ত্রীলোকদের অবস্থাই বুঝি আমাদের মত, এবং ভারতের অন্যান্য দেশীয় মহিলাদের চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থা মিলাইয়া নিজেদের উন্নতি করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কিন্তু আজকাল শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় ভগিনীদের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিয়াছে, এখন আমরা বুঝিয়াছি যে বঙ্গদেশ সমস্ত ভারতবর্ষ নয়, এবং বঙ্গনারী হিন্দুস্থানের অন্যান্য রমণীদের প্রতিকৃতি নয়। এই জ্ঞানার্জ্জনের ভাব আমাদের মনে যখন জাগিয়াছে তখন উহা দ্বারা জ্ঞান বিস্তার করা একান্ত কর্ত্তব্য ভাবিয়া আমি সাধ্যমত ভারতীয় নারীগণের অবস্থা সংগ্রহ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে রাজপুত মহিলাগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সংসারে উচ্চ সম্মানের পদ পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সে অধিকারে পুরুষজাতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। নারীগণ সর্ব্বদাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত আচরিত হন, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানসূচক দেবী ও মা ভিন্ন অন্য কোন নামে ডাকিতে সাহস পায় না। যদিও মোগল সম্রাটদিগের অনুকরণে দুই চারিজন রাজা ও মহারাজা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বহুবিবাহ কখন প্রশ্রয় পায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে একভার্য্যা-গ্রহণ প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। আর পত্নীর প্রতি স্নেহ ও যত্নে রাজপুত পুরুষেরা অন্যান্য হিন্দুদিগের অনেক উপরে। "উভয়ের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস যাবজ্জীবন থাকুক"—বিবাহকালে এই সরল প্রতিজ্ঞা বাক্যই উহাদের দম্পতির প্রেম ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেয়। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞা কঠিন আইনের কার্য্য করে।

আমরা বাল্যকাল হইতে যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ আদর্শ নারীদের পূজা করিতে শিখি, তাঁহারা সকলেই রাজপুত মহিলা ছিলেন। যে ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর সতীত্ব ও সাহসের কথা পড়িয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই, সেই বীরনারী পদ্মিনী রাজপুত মহিলা। যে কৃষ্টকুমারীর অকাল মৃত্যুতে হৃদয় গলিয়া যায়, অথচ বালিকার মনের তেজ ও পিতৃভক্তি দেখিয়া আমরা বার বার প্রশংসা করি—সেই ধর্ম্মপ্রাণা কৃষ্টকুমারীও রাজপুতবালা।

একথা সত্য যে মুসলমানদিগের রাজত্বকাল হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় ভদ্র রাজপুতদিগের কন্যাগণও অপেক্ষাকৃত অবরুদ্ধ থাকেন, কিন্তু তাহা দ্বারা পুরুষদের উপর নারীর প্রভাব কিংবা সংসারে তাহার অধিকার কখন কমিয়া যায় নাই। গৃহে উঁহারা যেরূপ সুখ, সম্মান ও মর্য্যাদা ভোগ করেন তাহাতে রাজপুত নারীদের অবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য রমণীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। রাজপুত স্ত্রী সংসারে স্বামীর দক্ষিণ হস্ত, তাঁর সহিত পরামর্শ না করিয়া গৃহকর্ত্তা কখন কোন কাজে অগ্রসর হন না। রাজপুত বীরেরা জননীর আশীর্ব্বাদ না লইয়া কখন কোন কার্য্যে যাইতেন না। স্ত্রীলোক যে গৃহের দেবীর ন্যায়, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রক্ষা যে পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য,

এ জ্ঞান প্রতি রাজপুতের শিরায় শিরায় নিবিষ্ট ছিল।

ইতিহাসে পড়িয়াছি, রাজপুতবালাদের প্রেম ও প্রশংসা লাভের আশায় এবং উহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার অভিপ্রায়ে পুরুষেরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিত। পুরাকালে স্বয়ংবর প্রথা রাজপুতদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তাহারা সেরূপ প্রকাশ্যে পতিবরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও গোপনে পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।*

[ক্রমশঃ]।

বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২১

*[কৃষ্ণভাবিনী সম্ভবত লেখাটি শেষ করতে পারেননি, সেই কারণে লেখাটির পরবর্তী সম্ভাব্য অংশগুলো পাওয়া যায়নি।]

পরিশিষ্ট

Srimati Krishnabhabini Das

The greatest, most active, and most unostentatious of social workers among Bengali women has passed away from the scene of her earthly labours. *Srimati* Krishnabhabini Das was the widow of the late Professor Devendranath Das, B.A. (*Cantab*), and the daughter-in-law of the late Babu Srinath Das, a leading millionaire Vakil of the Calcutta High Court. She was in England with her husband for eight or nine years, in the eighties of the last century; and many Indians who were in London in those days saw her passing hours day after day absorbed in her studies in the library of the British Museum. When she returned to India with her husband she was a true helpmeet to him, working devotedly with him to establish and conduct the now extinct Century School, which later grew into the Century College. After the death of the husband and of her only daughter, she threw herself heart and soul into the movement for the education and uplift of her sisters. With the help of teachers maintained by the *Stree-mahamandal,* of which she was secretary and chief worker, she carried on the work of zenana tuition for years in a thoroughly unsectarian manner. She did not accept state help for this or any other of her activities, as she did not like any interference with her liberty in the choice of means and methods. She got even poor women of meagre education to do some useful teaching work. She also maintained a school for girls with a hostel attached, where she brought up, among others, some girls from very poor families who could not pay their way. Many orphans were maintained by her. She also conducted a rescue home.

Though she had been in England for about a decade and was an educated lady, she was not in the least Anglicised or Eurasianised. Neither from her dress, nor from her speech or manners, could it be guessed that she was other than an ordinary *purdahnashin* Hindu lady. With the self-less, pure and unostentatious devotion of the typical Hindu widow, she combined the method, the energy, and the spirit of active social service of the West. She was a Bengali writer of repute in prose and verse. Her prose style bore the stamp of individuality.

Though she was a *pardahnashin* Hindu lady and a millionaire's daughter-in-law, she led the austere life of a sannyasini, not spending more than fifteen rupees a month on herself, as we learn from an intimate friend of hers, and often walking the crowded streets and lanes of Calcutta to obtain help for her institutions.

We could not obtain any photograph of hers, as she was very unwilling to be photographed. But fortunately when she was once engaged in conversation in the residence of Sir.J. C. Bose, Miss Larcher made a pencil sketch to hers without her knowledge. This we have much pleasure to reproduce, and are very thankful for permission to do so.

The Modern Review, April 1919, p. 413.

নারীজগতে কৃষ্ণভাবিনীর স্থান

প্রাতঃস্মরণীয়া, পরম পূজনীয়া, স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের অভাবে, যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন এরূপ প্রত্যেক নারীই আজ অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এই বেদনানুভূতি কি কেবল শূন্যতাই প্রকাশ করিতেছে; ইহার মূলে কি বেদনাতীত কোন পরম লাভের আভাস নাই? কৃষ্ণভাবিনী পার্থিব জীবনের শেষে কি কেবল পৃথিবী শূন্য করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, যাইবার সময় পৃথিবীর জন্য, নারীজগতের জন্য পৃথিবীর অতীত কিছু কি রাখিয়া যান নাই? যদি গিয়া থাকেন তবে তাহারই দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিবার জন্য আজ নারীজগৎ প্রয়াস পাইতেছে সন্দেহ নাই।

নারীর প্রতি নারীর এরূপ সার্ব্বজনিক শ্রদ্ধার প্রকাশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখা যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও দীন দুঃখী সকল শ্রেণীর নারীই কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে নিজের একটি গভীর সম্বন্ধ অনুভব করিতেন। এই সম্বন্ধ-অনুভূতিই, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে, আজ একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ আকার লাভ করিয়া প্রকাশ পাইতে উদ্যত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর নারীই আজ একবাক্যে বলিতেছে কৃষ্ণভাবিনীকে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। নারীর হৃদয়ে এই চেষ্টা এই আকাঙ্ক্ষা জাগিবার কারণ আছে, কৃষ্ণভাবিনী নিজের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পরার্থপর জীবনের দ্বারা সমগ্র নারীজাতিকে এমন একটি উচ্চতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যেদিকে তাকাইলে নারীর চক্ষু আর ফিরিতে চাহে না, পশ্চাতে চাহিতে পারে না, ধরণীর সুখভোগকে তৃণসম জ্ঞান করে। নারীহৃদয়ের অনন্যসাধারণ অনির্ব্বচনীয় প্রেমকে ভোগশূন্য স্পৃহাশূন্য অবস্থায় কৃষ্ণভাবিনী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে জগৎ দেখিয়াছে নারীর জীবনের মূলে, তাহার অন্তরতম প্রাণের মূলে কিসের অধিষ্ঠান, কিসের বলে নারী জগতে বিচরণ করিয়া থাকে। পতিহীনা, কন্যাপুত্রহীনা কৃষ্ণভাবিনী কিসের আশায় জগৎকে ভালবাসিয়াছিলেন? কিসের আশায় তিনি

নারীহিতব্রতে আপনাকে অবাধে উৎসর্গ করিয়াছিলেন? সমস্ত জগৎকে একযোগে ভালবাসিবার যে পরম অধিকার, কৃষ্ণভাবিনী তাহাতে অধিকারিণী ছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সেই অধিকার না থাকিলে কেহ আপনাকে এমন নিঃশেষে জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিতে পারে না। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনে আর সমস্ত মরিয়া কেবল প্রেম সার হইয়াছিল, প্রেম ছাড়া সে জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাই সে জীবন এত সহজ এত অনাবিল এমন মোহমুক্ত। নামের মোহ, প্রশংসার মোহ, খ্যাতি প্রতিপত্তির মোহ দূরে থাক, মানব-আত্মার গভীরতর মোহরাজ্য হইতেও তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রদায়ের মোহ, মহাপুরুষত্বের মোহ পর্য্যন্তও তাঁর অন্তঃকরণের সীমার মধ্যে স্থান পাইত না ;—এমনি তিনি বিশুদ্ধ-আত্মা ছিলেন।

সেই কৃষ্ণভাবিনীকে নিজের জীবনে লাভ করিবার, সেইরূপ চরিত্রে চরিত্রবতী হইবার জন্যই আজ নারীসমাজে এই ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। সেই জন্যই আজ এই-সকল সভা-সমিতির আয়োজন, এই নারীসমাবেশ। কিন্তু এতবড় অসাধারণত্ব অন্তরের মধ্যে ধারণ করিয়াও সেই মহীয়সী নারী যে নিজেকে নিতান্ত সাধারণ করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই বিশেষত্বের আলোকেই সমস্ত নারীজগৎ আজ উদ্ভাসিত। অসাধারণত্ব অনেক স্থানে বরং দেখা যায়, কিন্তু অসাধারণত্বকে এরূপ সাধারণ করিয়া ফেলিতে পারা যে কত দুর্লভ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই আলোকেই ধরণীর ধূলিকণা আলোকিত হইয়া উঠে, প্রাণহীন প্রাণ পায়, মূঢ়ব্যক্তি চেতনা লাভ করে, জনসাধারণ জাগ্রত হইয়া ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। কৃষ্ণভাবিনী নারী হইয়া যাহা করিয়া গিয়াছেন, যে জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত দুর্লভ।

নারীজগৎকে এতবড় গৌরব দান করিয়া কি অনাড়ম্বরে যে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি নিঃশব্দে যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে উপনীত হইয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে বেদনায় অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রোগশয্যায় তাঁহাকে বেদানার রস খাওয়াইতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন আমার মত ব্যক্তি কি বেদানার রস খায়? জীবিত অবস্থায় তিনি বলিতেন রোগ হইলে আমাকে যেন হাঁসপাতালে পাঠান হয় এবং মৃত্যু হইলে আমার দেহ যেন শববাহী সরকারী গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যায়, ইহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে তাঁহার এরূপ পরিণাম হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু যে মৃতদেহের সঙ্গে শত-শত নারী পদব্রজে শ্মশানে গমন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইত সেই দেহ নিঃশব্দে চারিজন মাত্র বাহকের স্কন্ধে লোকচক্ষুর অগোচরে অনাড়ম্বরে চলিয়া গেল, কেহ দেখিতেও পাইল না, জানিতেও পারিল না। এই আড়ম্বরের যুগে এরূপ অনাড়ম্বরতা কেহ কি কখনো দেখিয়াছেন? পরম সৌন্দর্য্যের আধার পরমাত্মা, কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর এই সুন্দর সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া সে জীবনে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিলেন, ইহা কে না বলিবে?

শেষ হইয়াছে, কৃষ্ণভাবিনী চলিয়া গিয়াছেন। রাখিয়া গিয়াছেন জিতেন্দ্রিয়, সুসম্বৃত, নির্ভীক, নিরভিমান, অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ এক মহান্ নারী-চরিত্র। দেশের সমস্ত নারী আজ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিদারুণ বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে নারীত্বের পরম গৌরবের নিকট

শ্রদ্ধায়, প্রেমে অবনতমস্তক হইয়া আপনাদের জীবনকে ধন্য মনে করিতেছে।

কৃষ্ণভাবিনীর জীবন ঈশ্বরপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া নারীসমাজ যেন পরম কল্যাণের অধিকারিণী হন এই প্রার্থনা।

শ্রী হেমলতা দেবী[৩১]

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায়

আজ যাঁহার স্মৃতিসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, ও পরে শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন জগদ্বিখ্যাতা মহিলা হইবেন তাহার আভাস শৈশবকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর তিনি যখন দাস-মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধনের জন্য ও উচ্চশিক্ষা-লাভেচ্ছু হইয়া বিলাত-গমনের বাসনা করেন। তখন বিলাত-গমনের নাম শ্রবণ করিলেই সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। যাঁহারা বিলাতে গমন করিতেন তাঁহারা জাতিচ্যুত হইয়া পিতার অবাধ্য ত্যজ্যপুত্র রূপে পরিগণিত ও এমন কি বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়েরও সেই অবস্থা ঘটে। কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াও সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, ঐ যে হিন্দুশাস্ত্র-মতে হাতে হাতে সঁপিয়া দিবার সময় মা বাবা বলিয়া দিয়াছিলেন—"পতিই দেবতা, সুখে দুঃখে বিপদে তাঁর চিরসঙ্গিনী থেকো,"—সেই "পতিই দেবতা" এই কথা প্রাণে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বিলাতে গমন করিবার বাসনা করেন, ইহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তাঁহাকে মধুর সান্ত্বনাবাক্য ও উপদেশাদি দ্বারা ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেন ; কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাস উত্তরে বলেন, "আমার সব যাক্ তাতে দুঃখ কি? সীতা রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করে' রামের সঙ্গে বনে যেতে পেরেছিলেন আর আমি তো কোন্ ছাড় [যদ.]!"

এই সময় তাঁহার দুই বৎসরের একটি কন্যা ছিল। তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। নিজে হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারেন নাই, কন্যা তিলোত্তমাকে দিয়া সে সাধ পূর্ণ করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল ; কিন্তু বিলাত-গমনে তাঁহার শ্বশুর-মহাশয় তিলোত্তমার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এই পাত্রে পড়িয়া তিলোত্তমা অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতেন, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহিতেন না। মাতার উপযুক্ত কন্যা হইয়া নীরবে অশ্রুজল ফেলিতেন। তবুও এক মুহূর্তের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করিতেন না।

দশ বৎসর যাবৎ বিলাতে থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ দাস যখন সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন. তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান না দিয়া ত্যজ্যপুত্র করেন। তিনি সস্ত্রীক কখনও পৃথক বাটীতে কখনও হোটেলে থাকিতেন। তখনই তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াকে লইয়া ট্রামে ও পদব্রজে গমনাগমন করাইয়া স্ত্রীস্বাধীনতা শিক্ষাদান করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া সঙ্কোচের ভাব দূর করেন। এই সময়ে কৃষ্ণভাবিনী দাস নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বিলাতীভাবে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন।

এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইতেন মাত্র। তাঁহাকে নিকটে রাখার সাধ্য তাঁহার ছিল না, কারণ তাঁহারা বিলাত-ফেরত।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বরিশালে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা শীঘ্রই ছাত্র ও দেশবাসিগণকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

এইরূপে কিছু কাল সংসার-ধর্ম্ম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়[৩২] পরলোক গমন করেন, তখন কৃষ্ণভাবিনী দাস অত্যন্ত নিরাশ্রয়া ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। শ্রীনাথ দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার গৃহে তাঁহাকে স্থান দেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য চালচলন যাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, পতিবিয়োগে তিনি একেবারে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। আহারাদি এদেশীয় হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ মানিতেন না।

পতিবিয়োগে তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা তিলোত্তমা পরলোক গমন করেন।

আঘাতের পর আঘাতেই কৃষ্ণভাবিনীর জীবন-তরীর মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কিন্তু ব্যথাহারী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল—এক সন্তানের জন্য যাহা পারি নাই জগতের সকল সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তাহা করিতে হইবে। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শান্তি। বৃথা শোক করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই কেন? নারী যদি জীবনে দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে না পারে তবে নারীর সার্থকতা কিসে?

তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন নাই, জগতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার স্বামী আই-এ ও বি-এর পাঠ্য বইএর নোট লিখিতেন। সেই বইএর বার্ষিক আয় প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একখানি বাড়ী জীবনস্বত্ব লিখিয়া দেন, ইহার ভাড়াও মাসে প্রায় ৬০।৭০ টাকা হইত।

স্বামীর নোট লিখার সম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়ার ৬০।৭০ টাকা—এই সকল টাকাই তিনি

অনাথ ছাত্রছাত্রীদিগের বেতন ও নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। নিজের জন্য ১০্ টাকা মাত্র রাখিয়া দিতেন, ইহাতেই তাঁহার সব ব্যয় সঙ্কুলান হইত। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম দিন যখন কৃষ্ণভাবিনী দাসের সহিত পরিচিত হইতে গেলাম, সে যে কি মূর্ত্তি দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। ত্যাগে সন্ন্যাসিনী, ব্যবহারে মাতৃরূপিণী, রূপে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেজে জ্বলন্ত অগ্নি। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত পরিচয় হইয়াছে, অমন আপনা হইতে মাথা তো কাহারও নিকট কখনও নীচু হয় নাই, এ যে আপনা হইতে মাথা নীচু হইয়া পড়িল, এমন প্রাণ হইতে প্রণাম আমি আর কাহাকেও কখনো করি নাই।

ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল ততই তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতে লাগিলাম। দেবীই বটে—দেবী না হইলে যে পতিতাদের দেখিয়া আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাই, তিনি তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণ শীতল করিতেন। অনাথা বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি শক্তি সামর্থ্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমার এক সন্তান গিয়েছে, তার জায়গায় সহস্র সন্তান পেয়েছি—আনন্দময় আঘাতের ভিতর যে এত আনন্দ রেখেছেন তা জান্‌তাম না।" তিনি জীবনে সত্যকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানও পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ভিত্তি যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজও তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে।

যাঁহার বাৎসরিক আয় ৩।৪ হাজার টাকা, কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ নগরীতে তিনি কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে, কি বর্ষাকালে পদব্রজে কনে-বৌটির মত আপাদমস্তক দেশী মোটা চাদরে ঢাকিয়া নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন। নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে ট্রামে যাইতেন। কিন্তু ক্বচিৎ কখনও তাঁহাকে গাড়ী চড়িতে দেখিয়াছি। বিদেশে যাইতে হইলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া কখনও মধ্যম শ্রেণীতে যাইতেন না, বলিতেন—"নিজের আরামের চেয়ে ঐ টাকা যাদের প্রয়োজন তাদের দিলে প্রাণে আরাম পাই।"

তাঁহার হাত দুখানি সর্ব্বদাই কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। এমন কি দাসদাসীদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে দেখিলে তাহাদের কার্য্য নিজে ভাগ করিয়া করিতেন। ব্যথিতের ব্যথা দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিত ও চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। কি অনাথাশ্রম, কি বিধবাশ্রম, কি বন্ধুবান্ধবের বাটী, যখনই যেখানে যাইতেন তাঁহার স্বামীর প্রিয় খাদ্যদ্রব্যাদি চাদরের নীচে লইয়া যাইতেন ও নিজের হাতে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তিনি আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন তাই নীরবে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিময় তাঁহার স্নেহক্রোড়ে তাঁহাকে স্থানদান করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হউক। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসানেও তাঁহার অতিপ্রিয় মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ভগবান মহামণ্ডল ও তাঁহার সম্পাদিকাকে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আজ আর তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিব না ; দেশের এ দুর্দ্দিন নয়, সুদ্দিন। এই নবজাগরণের মন্ত্রে কৃষ্ণভাবিনীর আদর্শে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম যে যেখানে আছ জাগ।

দেবী কৃষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু বঙ্গদেশের নয়, সমগ্র ভারতের ও নারীজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের এই সুসময়—এস সকলে তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করি। পরহিতব্রত পালন করি—এই অভাগা দেশের চারিদিকে হাহাকার, দুঃখে তাপে আর্ত্তনাদে আমরা কি বধির হইয়া থাকিব? আমরা যে নারী জাতি! নারীর কর্ত্তব্য, নারীর ধর্ম্ম, নারীর মাতৃত্ব, নারীকে দেবী করিবে তবেই নারীজন্মের সার্থকতা। তাই কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আজ কেবল এই গাহিতে ইচ্ছা হয়—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

শ্রীক্ষেমঙ্করী দেবী

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

কৃষ্ণভাবিনী দাস

১৯০৪ সালে কৃষ্ণভাবিনীর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। সে সময় আমি দার্জ্জিলিং-এ ছিলাম। Mall-এর বাগানের কাছেই আমার বাড়ী ছিল। প্রায় প্রত্যহ Mall-এ য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা একটী বঙ্গমহিলাকে দেখিতে পাইতাম। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিতাম, কারণ ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইলেও তাঁর মুখের ভাব কি নম্রতায় পূর্ণ ছিল! অমন নম্র মুখের ভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। দুজনেই দুজনকে দেখিতাম, চাহিয়াও থাকিতাম, কিন্তু কখনো কথা কহিতে পারি নাই। একদিন Mall-এর বাগানের কাছ দিয়া একটি Funeral যাইতেছিল, Boscolo হোটেলে এক মেমের একটি শিশু সন্তান মারা যায়, শুনিয়াছিলাম। সেই সময় আমি ও কৃষ্ণভাবিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলাম। তার পর যে যার গন্তব্য পথে যাই। পুনরায় যখন সেই শোকার্ত্তা জননী গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন Mall-এর একটী দোকানের কাছে আমাদের দেখা হয়। ঘটনাক্রমে আমরা উভয়েই বেড়াইয়া সেই স্থানে আসিতেছিলাম। উভয়েই সেই শোকার্ত্তা জননীর সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হই। সেই শোকের অশ্রুর সঙ্গে আমার কৃষ্ণভাবিনীর সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তার পর প্রায় প্রত্যহ নিয়মিত Mall-এর বাগানে আমাদের দেখা হইত। সেই আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত; কিন্তু তখনো তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাই নাই। দার্জ্জিলিং হইতে আসার পর তাঁহার কথা বেশী মনেও হয় নাই। তবে মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার লেখা দেখিতাম। তার কয়েক বৎসর পরে আমি বোলপুরে যাই।

একমাস বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের মধ্যেই বাস করি। সেখানে একদিন শুনিলাম যে দু-হপ্তার মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্বামী ও কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন। শুনিয়া মন ব্যথিত হইয়াছিল। তার কয়েক বৎসর বাদে শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য আরম্ভ করেন, ও কৃষ্ণভাবিনী দাসকে তাঁর সহকারিণী করেন। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল আরম্ভের পর ১৯১৪ সালে, কলিকাতায় আমার সহিত পুনরায় কৃষ্ণভাবিনীর সাক্ষাৎ। যদি

পূর্ব্বে পত্রে জানা না থাকিত যে তিনি সেইদিন সেই সময় দেখা করিতে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কোনমতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না। কোথায় সেই ইংরাজী পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা মহিলা, আর এ একেবারে হিন্দু ঘরের বিধবার মত আসিয়া উপস্থিত! এখনো যেন চোখের সামনে তাঁহাকে দেখিতেছি। সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় হইল। তার পর তাঁর জীবনের সকল ঘটনার কথাই তিনি আমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হইত। যখনি কলিকাতায় গিয়াছি, ছুটিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে কি গভীর ভালবাসাই জন্মিয়াছিল! তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাকে দেখিলেই তাঁর মৃতা কন্যাকে মনে পড়ে। হয় ত সেই কারণে অত গভীর স্নেহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জীবনে কখনো তাঁর সঙ্গ বেশী ভোগ করিতে পারি নাই।

একবার সেই ১৯১৪ সালে জুলাই মাসে তাঁর সঙ্গে দুই দিনের জন্য বোলপুর গিয়াছিলাম। পথে কি যত্ন! সেদিন যাত্রার পথে ট্রেণে উভয়ের জীবনের ঘটনা উভয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। "আপনার জীবন-কাহিনী আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখুন।" প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। পরে আমায় বলিয়াছিলেন যে, লিখিতেছি। একবার আমায় তাহা দেখাইয়াও ছিলেন।

আমরা সন্ধ্যার সময় বোলপুরে উপস্থিত হইলাম। যে দুই রাত্রি বোলপুরে ছিলাম, আমি শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর গৃহেই শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রে দুইজনে কত গল্প করিতাম! সেই দুই রাত্রে তিনি তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা আমার নিকট মন খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

আমি পৃথিবীতে অনেক বিদুষী মহিলা দেখিয়াছি, অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর মত স্বর্গীয় পবিত্র সরল মন অতি অল্প মহিলারই আমি দেখিয়াছি। পৃথিবীতে কোন মহিলাকে আমি এমন শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। তিনি পূজার যোগ্যই ছিলেন। নিজে তিনি নিজের কোনও গুণই জানিতেন না, বা সে বিষয়ে তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না! বড় হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। মাটিতে মিশিয়া মাটি হইয়া তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার সেই শুভ্র বিধবার বেশ মনে কেমন একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগাইয়া দিত। সেই সুন্দর মুখে সর্ব্বদা কেমন এক পবিত্র আলো জাগিয়া থাকিত। সেই জ্যোতিপূর্ণ চক্ষে কি নম্রতার ভাব ছিল, অত বয়স হইয়াছিল, কিন্তু একটু কোন প্রশংসার কথা বলিতে গেলেই লজ্জায় মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। সকল সময়েই যেন সকলকে সঙ্কোচ। কতবার তাঁহাকে মর্ম্ম-বেদনায় নীরবে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। কত অন্যায়ভাবে লোকে তাঁকে কত কথা শুনাইয়াছে। কখনো একটা কথার উত্তর দিতে দেখি নাই। আমি তাঁকে কতবার এজন্য কত কথা বলিয়াছি, এমন কি ধমকাইয়াছি, "কেন আপনি এত সহ্য করেন?" ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের মিটিং-এ মাঝে মাঝে তাঁকে কত কথাই শুনিতে হইত। তিনি কতবার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন, তবু কখনো তাঁর দোষ নাই, এ সরল সত্য কথাটুকু বলিয়াও প্রতিবাদ করেন নাই। নীরবে কত কাজই করিয়াছেন, সে কাজের কি হিসাব আছে! তিনি নিগৃহীতা মেয়েদের উদ্ধার করিতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, সেজন্য তাঁহাকে পুলিস কোর্টেও যাইতে হইয়াছে। আমি কতবার মানা করিয়াছি, কিন্তু তাঁর একাগ্রতা দেখিলে

বাধা দেওয়া কঠিন হইত। সেই সব মেয়েদের লইয়া ভবানীপুরে যে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দু'বার সেখানেও গিয়াছিলাম। কোথায় অনাথ আশ্রম, কোথায় নিবেদিতার স্কুল, কোথায় কার বাড়ী, সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি। তাঁর সঙ্গে ঘুরিতে কি ভালই লাগিত! মনে হইত, কত শিখিবার আছে। অনেক সৌভাগ্যে তাঁর মত বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু বেশী দিন তাঁর সঙ্গ পাই নাই।

তাঁর 'জীবনের দৃশ্যমালা'[৩৩] যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানিবেন, সেই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁর জীবনী কিরূপ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি শৈশবেই বিবাহিতা হন, ও সেই সময় হইতে স্বামীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় প্রণয়ে তাঁর হৃদয় বিকশিত হয়। উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়িলে স্ত্রীর জীবনের কিরূপ বিকাশ হয়, তাহা আমার বিশেষভাবে জানা আছে বলিয়াই শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয়ের সহিত আমার যেমন গভীরভাবে পরিচয় হইয়াছিল, তেমন খুব কম লোকেরই হইতে পারে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম অনুমান ১৮৬৪ সালে। তিনি বহরমপুরের অন্তর্গত 'কাজলা' গ্রামে কোনও জমীদারের গৃহে জন্মিয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়সে কলিকাতার বৌবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের দুই বৎসর বাদে দেবেন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছয় বৎসর বাদে তাঁহার স্বামী যখন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়, তাঁহার জননী সকলেই সেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগতকে সমাজে লইতে চাহিলেন না, এবং কৃষ্ণভাবিনীকে স্বামী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন ; বলিলেন, তবুও তিনি যদি স্বামীর সহিত যান, তাহা হইলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তখন তাঁহার শিশু কন্যার বয়স পাঁচ বৎসরের একটু উপর হইয়াছিল। সমাজের ও নিষ্ঠুর আত্মীয়দিগের কঠিন শাসনে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সীতার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

যখন তিনি স্বামীর সহিত গমন করিলেন, তখন শিশু কন্যাকে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট রাখিয়া গেলেন। কারণ তিনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অর্থাভাবে কন্যাকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না। যখন পুনরায় দুই মাস পরে তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডে যাইবার সময় তাঁহাকে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, তখন মায়ের নিষেধ, শ্বশুর-মহাশয়ের আদেশ, কন্যার স্নেহ কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি এ সকল ত্যাগ করিয়া গেলেন! কিন্তু তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের সমাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা পরিত্যাগ করিলেন ; অর্থসাহায্যেও বঞ্চিত করিলেন। সেজন্য কৃষ্ণভাবিনী শিশু কন্যার মঙ্গলের জন্য তাহাকে শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সেই কন্যার স্নেহ বন্ধনে উভয় পক্ষের মঙ্গলই হইবে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও কন্যাটিকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যখন পতিপ্রাণা সতী স্বামীর সহিত চলিলেন, তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া বলিল, (*জীবনের দৃশ্যমালা*)

যাই যদি সব ত্যজি স্বামীর সদনে,
তাহলে ছাড়িতে হবে আত্মীয়-স্বজনে।
হায়রে নিষ্ঠুর নর এমন আচারে
কেমনে সৃজিলি তুই ভারত-মাঝারে ;
আজ যে প্রভাবে তোর ভাঙ্গিছে আমার প্রাণ
কবে তোর তেজ হবে এ দেশেতে অবসান?

তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর সমাজের সে কঠিন শাসন নাই! এখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীকে সমাজ সকল শ্রেণীতেই স্থান দিতেছে। অর্থের দ্বারা এখন সকলই সম্ভব হইয়াছে।

বিদায়-গ্রহণের সময় তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া দেখেন, তাঁর জননীকে ভাই-বোনে সান্ত্বনা দিতেছে। কন্যাকে আদর করিয়া অন্যে কোলে লইতেছে। দূরে স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতেছেন, স্ত্রী কি করেন! কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল, তবু কর্ত্তব্যে অটল হইয়া বলিলেন, (*জীবনের দৃশ্যমালা*)

দাঁড়াও ক্ষণেক নাথ,
করি শেষ প্রণিপাত,
মাতার চরণে মম, কন্যারে চুম্বন,
বেঁধেছি হৃদয় দেখ, কেটেছি বন্ধন।
ফিরিব তোমার সনে।
যথা যাবে মাঠে বনে,
স্বজন সমাজ তোমা ত্যজিল বলিয়া
ভেবো না ভার্য্যার প্রেম এ জগতে মায়া।

তারপর সেই স্বদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালীর কুলবধু, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ নারী বিদেশে স্বামীর সহিত যাইবার পথে সমুদ্র দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কার্য্যের বাসনায় মন পূর্ণ হইল। সেই স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দেখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল।

ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি নিজের সাধ্যমত স্বামীর সকল বাসনা পূর্ণ করিতে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন, রীতি-নীতি, মনের আদর্শ, ভাব, পুরাকালের সাধ্বী সতী নারীর মতই ছিল। তাঁর জীবনের কামনাও ছিল তাই।

সে সাধ তাঁর পূর্ণ হইয়াছে। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর জন্য জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল ইংলণ্ডে যখন ছিলেন, তখন অশেষ পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তাঁহার সময় গিয়াছে। একে অনভিজ্ঞা বঙ্গরমণী, তাঁর পক্ষে বিদেশীয় আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি, শিক্ষা কতদূর কঠিন হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেই সময় আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে, কন্যার বিরহে তিনি বলিয়াছেন :—

কেন না করিলে পিতঃ পাষাণ হৃদয়
অবস্থা যেমন,
কেন এ মায়ের হৃদে করিয়াছ দান
স্নেহ প্রস্রবণ?

বিলাতের শত চাকচিক্যময় বাহিরের দৃশ্যে কিন্তু তাঁর মন .ভোলে নাই। বঙ্গের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে ; তিনি তাই নিজের ভাষায় বলিয়াছেন :

কে বলে বিলাতে এসে মন ভুলে যায়?
বঙ্গ প্রাণ মুগ্ধ হয় মোহিনী মায়ায়!
মন যদি ভুলে যায়,
তবে কেন এ হৃদয়
হয়েছে ব্যাকুল মা তোমার তরে
দেখিতে সে জন্মভূমি বহুদিন পরে।

তবু তিনি নীরবে সকলি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সহসা তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁর শ্বশুর মহাশয় নবম বর্ষে গৌরীদানের ফল লাভ করিয়া এক ধনী-গৃহে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। পাত্র সুরূপ, কিন্তু সুপাত্র নহেন। সেই সংবাদ বজ্রাঘাতের মত তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সে দুঃখ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর যায় নাই, সে কথা একদিনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ক্রমাগত বলিতেন, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই বলিয়াই জীবনে এত পরীক্ষা এত কষ্ট সহিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া লেখেন—

সহসা বিদেশে আজ কি শুনিনু হায়
ভাবিতে যে সংবাদ প্রাণ ফেটে যায়।
সংসার-তুফান হতে বাঁচাবার আশে,
রেখেছিনু কন্যা মোর পিতার সকাশে।
হায় সে প্রাচীন পিতা, অবহেলি ভাল কথা,
ভাসাছেন সে তনয়া অপাত্র-সাগরে,—
এ হেন বারতা কি গো সত্য হতে পারে?

এই কবিতাতেই তিনি লিখিয়াছেন, যদি আগে জানিতেন তাহা হইলে মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিতেন, এ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। মেয়ের প্রাণের ব্যথায় তাঁর মর্ম্মস্থল পুড়িয়া গিয়াছিল, তাই তিনি অমন করিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সে কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, পরের মেয়েদের যাতনায় তাঁর প্রাণ যে কি অধীর হইত, আমি তা দেখিয়াছি, আমি তা জানি, তাই আজ তাঁর কথা এমন করিয়া লিখিতে পারিলাম। তিনি সকল বেদনাই নীরবে সহ্য করিতেন। সমুদ্রের গভীর জলের মত তাঁর মন স্থির ছিল, তাঁর গভীর বেদনা ভাষায় ফুটিত না। এই সহিষ্ণুতা-গুণ তাঁর জীবনে কি বেশীই ছিল!

ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া অনেক পরীক্ষাই গিয়াছে। অবশেষে সেই বিদেশে স্বামীর কঠিন পীড়ার সময় তিনি কাতর হইয়া বলিলেন,

নাহি পিতা লোক-বল নাহি বেশী অর্থ-সম্বল
একা আমি সাহস বা কত?
কর পিতা দয়াদান, বাঁচাব তাঁহার প্রাণ
চলে যাই স্বদেশে আবার।

ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন ; ১৮৯০ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সেখানকার শিল্প, স্বাধীন তনয় ও তনয়া সব দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেও তাঁর মনের অভাব ঘোচে নাই!

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁর প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, তিনি তাই বলিয়াছেন,

যদি প্রাণ দিয়া ওই দুঃখরাশি,
এক বিন্দু মাগো ঘুচাতে পারি।
করিব তা আমি সুখে-দুঃখে ভাসি
ব্যঙ্গ-উপহাসে ভয় না করি।

দেশে আসিয়া যদিও দূরে থাকিতেন, তবু জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু কন্যার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রহিল না। কন্যাকে তাঁহার নিকট কেহ পাঠাইল না। দূর হইতে একবার দেখিতে চাহিলেও, কন্যার শ্বশুর বা জামাতা কেহ তাহাকে দেখিতে দিল না।

এই অপমানে তাঁর জীবন জ্বলিয়া গিয়াছিল। শুধু কি তাঁরই এই যাতনা! কত ঘরে এই প্রকারে নিষ্ঠুরতার দাহনে কত শত মায়ের প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, তার ঠিকানা কোথায়? ধরিয়া বাঁধিয়া নিষ্ঠুর দেশাচারের নামে জাতি বাঁচাইবার জন্য বিবাহ দিয়া কত স্থানে কত কুফল ফলিতেছে, তাহার হিসাব কোথায়?

তিনি স্বামীর প্রণয়ে স্বর্গ-সুখে সুখী হইলেও, আর পুত্র-কন্যা না হওয়ায় মনের দুঃখে ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত যে, তিনি কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, অন্য সন্তান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাই লিখিয়াছেন—

আমি ত স্নেহের ভরে পরশিতে বুকে ধরে
শীতল করিতে চাই হৃদয় আমার।
জীবন ঘটনা বলে, তাহাতেও বাধা পড়ে
শোভিবে না কভু এ শূন্য সংসার?
সংসারের অভিজ্ঞতা বুঝিবার আগে পিতা
রাখিয়াছিলাম দূরে সন্তান আমার,
সে পাপের প্রতিফল এই কি উচিত ফল
দিতেছ জীবনে মম করুণা-আধার!

সেই একমাত্র কন্যা যদি সুখী হইত তাহা হইলে মাতৃবক্ষে এরূপ শেল বিঁধিত না। কন্যা জন্মদুঃখিনী হইল। ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্রবধূ হইয়াও কন্যা চিরদিন স্বামীর প্রণয়ে বঞ্চিতা ছিল। কন্যাও চিরকাল পিতার ভালবাসা কিরূপ জানিত না। যখন মিঃ দাস বিলাতে ছিলেন তখন কন্যার জন্ম হয়, কন্যার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি দেশে প্রত্যাগত হন। তাহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, পিতা মাতা দুজনেই ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। যখন ফিরিয়া আসেন, সে তখন বিবাহিতা, মাতা গিয়াও দর্শন পান নাই।

তারপর তিনি ও মিঃ দাস যখন সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন করেন, তখন সেই ছেলেদের দেখিয়া তাঁহার মনে হইত যে কি পাপে তাঁর এই দশা হইল, তাঁর গৃহ কলরব-শূন্য হইল!

শিশুহীন ঘরের শূন্যতায় প্রাণে ওই কথাই জাগিয়া উঠিত। শিশুহীন গৃহ বড় নিরানন্দময়, বড় জীবনশূন্য মনে হয়।

তার পরে তিনি অনেকগুলি শোকের আঘাতে কাতর হইয়াছেন। মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, আর নানা আত্মীয়-বিয়োগে হৃদয়ে অনেক আঘাত পাইয়াছেন ; স্বামীর মুখ চাহিয়া কিন্তু সব সহিয়াছিলেন।

স্বামীর অসুখের সময় তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া পথ্য রাঁধিয়া যে প্রকারে পারিয়াছেন, নিজে সব করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তাঁর মত সতী সাধ্বীর এই যে যন্ত্রণা, ইহা বড়ই হৃদয়ভেদী! স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখ-সাধ তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামী-কন্যাকে একসঙ্গে হারাইয়া কি যন্ত্রণাই পাইয়াছেন! তিনি বলিয়াছিলেন, একবারও ভাবি নাই যে আবার উঠিতে পারিব। কন্যা শ্বশুরালয়ে নানা প্রকারে নিগৃহীতা হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, আসিয়াও তিনি জুড়াইতে পারিলেন না। মরণ আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর করিয়া সেই অমৃতধামে লইয়া গেল। স্বামীর উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন—

জীবনের সর্ব্বসুখ সংসারের সার
দিবা-রাতি পূর্ণরূপে হৃদয়ে আমার
রয়েছ জীবিত তুমি—আগেতে যেমন
পূজেছি তোমায় নাথ! ভরিয়া জীবন
তোমারি স্মৃতির ধ্যান করিব এখন।

বিধবা হইয়া তিনি সকল প্রকার আরাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে তাঁর খাটে কখনো শয়ন করেন নাই, ভূমিতলে শয্যা পাতিয়া শুইতেন। কখনো ভাল দ্রব্য বা ভাল ফল ও মিষ্টান্ন খান নাই ; সব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কতবার বলিয়াছি, এরূপে শরীর থাকিবে কেন? মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মাথা ঘুরিত, কতবার একটু মাখন মিছরী, একটু ডাবের জল খাইতে বলিয়াছি, তিনি হাসিতেন।

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য তিনি কি অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কত দীন-দুঃখী বিধবার অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল বাটীতেই তাঁর অবারিত দ্বার। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য যখন শ্রীমতী সরলা দেবী 'সাত ভাই চম্পা'র অভিনয় করান, তখন তাঁহাকে সেজন্য কি রকম খাটিতেই হইয়াছিল। অথচ কখনো কোথাও বাহবা লইবার জন্য তাঁহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখি নাই, সকলের পিছনে লুকাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। যেখানে একটু কঠিন হইতে হইবে, সেখানেই আমার নিকট আসিয়া বলিতেন, 'আমার সঙ্গে চলুন।' চারিদিকে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিতেন, এক পেয়ালা চা আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম, কি তৃপ্তি কি আনন্দেই তাহা পান করিতেন। বলিতেন, সব ছাড়িয়াছি, এইটি পারি নাই।

আমার সহিত শেষ-দেখা তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে। জুলাই মাসে আমি পৃষ্ঠে Curbuncle লইয়া ডাঃ মিত্রের বাড়ীতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শয্যাগত ছিলাম, সেই সময় দুইদিন আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন কি জানিতাম যে সেই শেষ দেখা! তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে।

তিনি এত লেখাপড়া জানিতেন, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিত না। আট বৎসর একাদিক্রমে বিলাতে ছিলেন, তবু তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। ভাসুর ও বড় যাঁকে যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। কি সেবাই করিতেন! সেবা যেন তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল। কত কাজই তিনি করিতেন, কখনো ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অল্পাহারেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাঙলার এ দুর্দ্দিনে কৃষ্ণভাবিনীর মত একজন সেবাপরায়ণা কর্ম্মশীলা নারীকে হারাইয়া আমরা যে কতখানি হীনবল হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না।

সরোজকুমারী দেবী[৩৪]

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস *

এ বৈচিত্র্যময় সংসারে মানব নিত্য আসে নিত্য যায়, বিশ্বেশ্বরের নিত্যলীলায় নরনারীর জন্ম-মৃত্যু চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মতই সংঘটিত হয়, কিন্তু কখন্ কে আসে আর কেবা যায়, কে তাহার সংবাদ লয়? কে বা কাহাকে সঙ্গে রাখে? শিশু, বৃদ্ধ নরনারী নীরবে আসে, নীরবেই চলিয়া যায়; আপন ঘরে নিতান্ত আপনার জন ছাড়া সে সংবাদ বড় কেহ রাখে না। কিন্তু এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে এমন এক-একজনের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের কেহ পর ভাবিতে পারে না, যাঁহাদের জীবন জগতের সম্মুখে এমন এক আদর্শ রাখিয়া যায় যাহা অনেককেই আদর্শ-জীবন গঠন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যাঁহাদের কৃতকার্য্যের ও দত্ত উপদেশের ফলে মানব-জীবনের কত না উন্নতির পথ মুক্ত হয়, জগতের কত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং যাঁহাদের বিয়োগ-দুঃখ আত্মপরনির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণকেই ব্যথিত, শোকার্ত্ত করে। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও, যখনই সে পূতস্মৃতি মনের মধ্যে উদয় হয়, সারাচিত্ত মথিত করিয়া একটা 'হায়' 'হায়' ধ্বনি উঠে; অন্তরে এ প্রশ্ন উঠে—হায়, কেন সে-জীবন দীর্ঘ হইল না। এমনই একটি দিব্য আত্মা ছিলেন পূতশীলা স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস। তাঁহার বিয়োগে আজ নরনারীর চিত্ত ব্যথিত, তাঁহার অদর্শনে নারীসমাজ হইতে সেই 'হায়' 'হায়' ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে।

তাঁহাকে পাইবার ও জানিবার সৌভাগ্য আমার বেশী দিন হয় নাই; কিন্তু যতটুকু জানিয়াছি, তাঁহার মুখে অন্তরের যে-ছবি দেখিয়াছি, অল্পদিনের স্বল্প সময়ের আলাপে যতটুকু বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতেই তাঁহাকে নারীরূপে দেবী বলিয়াই জানিয়াছি ও আজ পর্য্যন্ত অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া আসিতেছি।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয়, তাঁহার শেষ জীবনে। শেষ দশ বৎসরের বৈধব্য-দশায়

---

* মেরী কার্পেন্টার হলে কৃষ্ণভাবিনী স্মৃতি-উপলক্ষে মহিলাসভায় পঠিত।

তাঁহার তপস্বিনী-জীবনের কতক বিবরণ শুনিয়াছি, কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছি। গৃহে, শিক্ষাগারে, স্ত্রীমহামণ্ডলের কর্ম্মে, অনাথ বালক-বালিকা ও নিরাশ্রয় নারী-সমাজে তাঁহার অক্লান্ত নিঃস্বার্থ সেবাব্রত দেখিয়াছি। যখনই তাঁহার পত্র পাইয়াছি অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, তাঁহার অপার স্নেহাদরে ধন্য হইয়াছি, মধুর আলাপে তৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছি ; আর সেই প্রতিভাময়ীর পবিত্র ও মহনীয় জীবনের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া হাসিতে-হাসিতে গৃহে ফিরিয়াছি। কিন্তু হায়, সেদিন তাঁহার চির-বিশ্রামের দিন তাঁহার আশ্রমস্থ এক বাল-বিধবার পত্রে—কয়দিন হইতে তিনি অসুস্থ এবং আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বহু মাতৃহীনা ও বালবিধবার বুকফাটা আর্ত্তনাদ এবং চতুর্দ্দিকে 'হায়' 'হায়' রব শুনিতে শুনিতে, চোখের জলে ভাসিয়া শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছি। ইহার ঠিক দশদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়, সেদিন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ-মনে আমাকে স্ত্রীমহামণ্ডল এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেন এবং আমায় তাঁহার স্বর্গগতা কন্যা তিলোত্তমার "আক্ষেপ"[৩৫] নামক পদ্যগ্রন্থ দেন। আর একদিন আসিতে প্রতিশ্রুত হইযা, সেদিন যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লই, তখন আমার কি তাঁহার নিজেরও মনে সন্দেহের উদয় হয় নাই যে এই দেখাই শেষ দেখা, আর ক'দিন পরেই তাঁহাকে সমুদয় অপূর্ণ আশা, অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিযা সহসা চলিয়া যাইতে হইবে!

নাবীর কল্যাণব্রতে, নিরুপায় বালকবালিকার উপায়-বিধানে বঙ্গজননী কৃষ্ণভাবিনী সমাজের কোন্ স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মগোপনের প্রবৃত্তি তাহা সাধারণকে জানিতে দেয় নাই। জীবিতকালে অতি সন্তর্পণে সকল কর্ম্মের পশ্চাতে যিনি আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, সমাজও যাঁহার নীরব সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়াছিলেন, আজ তাঁহার অভাবই তাঁহাকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই আত্মপ্রকাশে সঙ্কুচিতা নিঃস্বার্থ হিতকারিণীকে হারাইয়াই নারীজগৎ তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, সেই স্বর্গবাসিনীর পূতস্মৃতি সমাজ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার জন্য সজাগ হইয়াছেন। যদি আমরা তাঁহাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাকি, অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, তাঁহার বিয়োগে যথার্থ প্রাণে ব্যথা পাই, তাহা হইলে শুধু কথায় নহে, কাগজে নহে, কাজে তাহা প্রকাশ করিব, তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করিব, অন্যের জন্য সেই পথ মুক্ত ও সুগম করিয়া দিব, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রত আমরা উদ্‌যাপন করিব বা এতটা অগ্রসর করিয়া দিয়া যাইব যে ভবিষ্যৎ নারী-সমাজ তাঁহারই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তাঁহার পূতস্মৃতি রক্ষা-কল্পে তাঁহারই প্রিয় কর্ম্ম সাধনোদ্দেশে নীরব কর্ম্মীর দল পুষ্ট করিবে।

তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী। নারী-জন-হিতকর সকল কাজে তাঁহার যোগ ছিল ও ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডলের তিনি প্রধান কর্ম্মী ও প্রাণস্বরূপা ছিলেন কিন্তু আপনাকে জাহির করিতে কখন তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ভাব-প্রকাশের শক্তি ও মধুর ভাবে গুছাইয়া বলিবার ও লিখিবার ভাষা তাঁহার ভাল রকমই ছিল কিন্তু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে তাঁহাকে বড় কখনও দেখা যায় নাই। তিনি সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর ইংরাজীতে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনস্থল ব্যতীত কখন তাহার আশ্রয় লইতেন না। জীবনে তাঁহার স্কুল-

কলেজের শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ না ঘটা এবং উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ তাঁহার নামের পার্শ্বে না থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতই বিদ্যাবতী ছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও গ্রন্থ-লেখিকা ছিলেন। কিন্তু এমনই গর্ব্বহীন অনাড়ম্বর সংযত-জীবন তাঁহার ছিল যে তাঁহাকে বিলাত-ফেরত বিদুষী বলিয়া ধরা যাইত না। তাঁহার কথা-বার্ত্তা ও বেশভূষার মধ্যেও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় পাওয়া যাইত।

তিনি জন্মার্জ্জিত যে সকল সদ্‌গুণ লইয়া ১০ বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় উচ্চ শিক্ষিত, চরিত্রবলে বলীয়ান্ প্রতিভাসম্পন্ন আজন্ম-শিক্ষক (Born teacher) স্বামীর যত্নে ও কৃতিত্বগুণে বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তেত্রিশ বৎসরের সাধনার ফলে যে জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা শেষ জীবনে নারীজগতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া আত্ম-ত্যাগের মহিমায় চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল। হিন্দু গৃহ-বধূর বাঞ্ছিত ও চির প্রশংসিত গুণগুলির সহিত প্রতীচ্য শিক্ষিতা মহিলার কয়েকটি দুর্লভ গুণ তাঁহাতে আশ্রয় করিয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার জীবন এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল, যাহার স্বরূপ এদেশে বিরল। কিন্তু তাঁহাকে ভালরূপে জানিতে হইলে তাঁহার স্বামীর জীবনী অধ্যয়ন করিতে হয়, কারণ তিনি ছিলেন তাঁহার স্বামী-হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া, তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। সে জীবন মিষ্টার দাস নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। সে আত্মচরিত "পাগলের কথা",[৩৬] অকপট হৃদয়ের অভিব্যক্তি, সুখপাঠ্য ও শিক্ষাবিধায়ক। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি দম্পতি প্রথম বয়সে একবার নৌকা করিয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন, নদীবক্ষে স্বামীর সাদর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"কি বিপদে কি সম্পদে আমি তোমার চির-সহচরী থাকিব।" সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী কখনও তাহার অন্যথা করেন নাই।

জননীর মৃত্যুর পর মিঃ দাস একবার ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে থাকায় চিকিৎসক সমুদ্র-বায়ু সেবনের ব্যবস্থা দেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে মনোযোগী না হওয়ায়, তিনিও উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পত্নী কৃষ্ণভাবিনী এই সময় তাঁহাকে বিলাত যাইবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন এবং সেই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ দিতে বিশেষ আগ্রহান্বিতা হইয়া, সসঙ্কোচে স্বামীর নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। এই ঘটনাটি মিঃ দাসের আত্মজীবনীতে বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে এবং এই সূত্রেই তিনি লিখিয়াছেন—

> "আমার মতে যে স্বামীর নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এক মন, এক প্রাণ ও একাত্মা না হয়, তারা প্রণয়ী হ'লেও দম্পতি নামের অধিকারী নয়। যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্বন্ধের সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলন না হয়, তারা যথার্থ প্রেমিক হ'তে পারে না।"

যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে মিঃ দাসের পিতা তাঁহাকে সিবিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে বিলাত পাঠাইয়া দেন। প্রথমবার যখন তিনি বিলাত যান তখন তাঁহার দুটি সন্তান নিতান্ত শিশু। যাত্রাকালে মনে হইয়াছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী ও শিশু দুটির ভরণপোষণের জন্য পিতার কোন যত্ন বা অর্থব্যয়ের ত্রুটি হইবে না বটে, কিন্তু কোনরূপ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণভাবিনীকে মানসিক সান্ত্বনা ও বল কে দিবে? আবার তখনই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে "বয়স অল্প হইলেও তাহাকে যেরূপ সব কাজে ঈশ্বরের

প্রতি নির্ভর করিতে দেখিয়াছি তাহাতে নিশ্চয় তিনিই তাহাকে শক্তি দিবেন।"

হইয়াছিলও তাহাই। তিনি বিলাত প্রবাসে থাকিতে তাঁহার কন্যাটি জননীর কোল শূন্য করিয়া যায়। অবশ্য এই প্রথম শোকে জননী-হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার উপর স্বামীর উপদেশ কতদূর এবং কত শীঘ্র কার্য্যকরী হইত—স্বামীর উপদেশ ও সান্ত্বনাপ্রদ পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাহা বুঝা যায়,—

"কাজ মানব-জীবনে সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে ঔষধের ন্যায়, উহা দ্বারা কত দুর্ব্বল-হৃদয় সবল হয়, কত নিরাশ-অন্তরে আশা আসে, কত দগ্ধ-প্রাণে সান্ত্বনা আনে।"

তিনি সন্তানশোক ভুলিবার জন্য কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হইবার আশায় সাধ্যমত বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে স্বামীর নিকট তিনি কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও তিনি এই কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াই প্রিয়তম পতি ও কন্যারত্নের দুঃসহ শোক সহনীয় করিয়া লইয়াছিলেন।

পিতার পীড়ার সংবাদে মিঃ দাস ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছয় বৎসর ইংলণ্ড বাসের পর দেশে আসেন এবং পাঁচ মাস পরে পুনরায় সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। মিঃ দাস তথায় ভারতবাসী সিবিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তিনটি কলেজে অধ্যাপকতা করিতে থাকেন এবং বিলাতের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে বৈদিক ও প্রাচীন কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ব্যবহার ও চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ ও কলাবিদ্যা বিষয়ক বহু গবেষণাপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনা আলোচনা করিয়া বিলাতের বিখ্যাত 'এথিনীয়াম' পত্র-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"মি দাস জন্মে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ এবং উভয়েরই গৌরবস্থল। তাঁহার অবাধ-গতি স্বচ্ছ-সুন্দর ইংরেজীর রসমাধুর্য্য প্রভূত আনন্দ দান করে, তাঁহার অন্তরের হিন্দুত্ব ও স্বদেশ-প্রেম তাঁহার লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠে।"

কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে বিলাত-ফেরত সুশিক্ষকের অধিক কিছু বলিয়া জানিতেন না। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ তাই লিখিয়াছেন—"তিনি এরূপ আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন যে, আমরা তাঁর অতি আত্মীয় হইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। দেবেন্দ্রনাথ জীবনে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। যে কোন বিষয়েই হোক্ তিনি কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বর ও বিলাসিতাকে ঘৃণা করিতেন।"

স্বামীর চরিত্রের এই সকল বিশেষত্বও দেবী কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে জানিতে পারি, কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনী স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হইয়া স্বামীগৃহে সকল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি আজীবন সংযত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, বেশভূষার আড়ম্বর তাঁহার ছিলই না, বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই এবং অন্যের হিতকল্পে অর্থব্যয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল কিন্তু স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় তিনি ১৫৲ টাকার মধ্যেই নির্দ্ধারিত রাখিয়াছিলেন, গমনাগমনকালে গাড়ী-পাল্কীতে অর্থব্যয় না করিয়া প্রায় পদব্রজেই যাতায়াত করিতেন।

শিক্ষাবস্থায় তাঁহার স্বামী লণ্ডনের যে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে গ্রন্থসাগরমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতেন, ছয় বৎসর পরে সেই গ্রন্থাগারেই তিনিও দীর্ঘ ৮/৯ বৎসর

ধরিয়া তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। স্বামীর ১৪ বৎসরের এবং পত্নীর ৮/৯ বৎসরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দম্পতি দেশে ফিরিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তখন হইতে সুশিক্ষিতা স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালনে স্বামীর সহায় হন। এমনই গুরুর শিষ্যা হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ হিন্দু-গৃহবধূ স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীকে নারীজগতে যুগান্তর আনয়ন কার্য্যে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই দিব্য-আত্মার তিরোধানে লিখিয়াছিলেন—

"সেই নির্ম্মল আত্মা আজ পরম আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া চির-আনন্দ লাভ করিয়াছে, কিন্তু যাইবার সময় এই পরাধীন দেশের ললাটে যে মুক্ত-চিত্ততার দিব্য আলোক সে জ্বালিয়া গিয়াছে সে আলোক আর কখনো নির্ব্বাপিত হইবে না। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত অন্তঃকরণ, সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বন্ধনরহিত মন, স্পৃহাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য নিষ্কপট চিত্ত, দ্বিধাশূন্যভাবে লোকহিতে রত আত্মা, সর্ব্বজনপরিচিতা কৃষ্ণভাবিনী দাস আজ নিরাশ্রয়া অনাথা দুঃখিনী নারীগণকে কাঁদাইয়া ইহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে আর কেহ তাঁহাকে ফিরিতে দেখিবে না, কিন্তু যে পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা হইতে নারীজগত আর কখনো ভ্রষ্ট হইবে না। দেশের সমস্ত নারীগণের সম্মুখে আজ ধ্রুবতারা জ্বলিয়াছে, সে তারা আর কেহ নহে, স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস।"

—এই উক্তি প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য আমরা সকলেই তাহা অনুভব করিতেছি।

কৃষ্ণভাবিনী ১০ বৎসরকাল বৈধব্য-জীবন যাপন করিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পতি-বিয়োগের পর তাঁহার শেষ জীবনের অবলম্বন-স্বরূপ সংসার-তাপ-দগ্ধা একমাত্র কন্যাকেও হারাইতে হয়, বজ্রের উপর এই দারুণ বজ্রাঘাতেও কিন্তু তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। কন্যাহারা সর্ব্বস্বহারা তখন শোকের ভিতর দিয়াই তাঁহার হৃদয়-দেবতার উপদেশ অনুসরণ করিয়া বিশ্বশিশুর জননীরূপে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন।

প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় তাই বলিয়াছিলেন—

"শোকের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থিত তপস্বিনী মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মল আভায় লোকচক্ষুর গোচর হয়। বহু অনাথ বালকবালিকা, বহু বিপথগামিনী নারী, বহু অজ্ঞ অন্তঃপুরিকা এই তপস্বিনী লোকমাতার স্নেহ-প্রণোদিত সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছে।"

এই পুণ্যস্মৃতি-বাসরে যাঁহার একখানি শুভ্র থান পরা, ঘোমটায় মাথা ঢাকা, নগ্ন পদ, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃমালা পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি আজ আবার মানস-নয়নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করি এবং ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি, যিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, পরার্থে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ বঙ্গনারীতে সম্ভব ইহা স্বীয় জীবনে দেখাইয়া বঙ্গনারী-সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, প্রতি নরনারী-হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক থাকুক এবং প্রতি নারীপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক কর্ম্মীর জীবনের দ্বারা সেই তপস্বিনী কৃষ্ণভাবিনীর নাম অমরত্ব লাভ করুক।

শ্রীচারুবালা সরকার

প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৩

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন।... "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জ্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন স্ত্রীডাক্তার, স্ত্রীঅ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রীগ্রন্থকারদিগের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড় বড় ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ্জ এলিয়ট্ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি—কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্ম্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্ব্বত্র সেই শিক্ষার বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্ত্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রীপুরুষের বর্ত্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্ত্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক্ করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই "মানুষ করা" কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে।

অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্ত্তব্য ততই গৌরবজনক ও শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন, তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সে গুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! তাঁহার সেই সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চ্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এই জন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন—ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন পুরুষের সার্ব্বভৌমিক স্বার্থপরতা এবং উৎপীড়ন নহে—অতএব বাহিরের কর্ম্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াৎ করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যবসা, বিজ্‌নেস্। এই জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারী আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভাল, তাহার ফলাফল এখনও পরীক্ষা হয় নাই।

তবে একথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে "মানুষ করিয়া" তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমত শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরাণী করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে ; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করিত মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা ; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না বাড়্‌না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

অস্বাক্ষরিত

সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

'শিক্ষিতা নারী'র প্রতিবাদের উত্তর

প্রথম সংখ্যা 'সাধনায়' 'শিক্ষিতা নারী'—সম্বন্ধে যে দু চারিটি কথা আছে, তাহা পড়িলে বোধ হয় যে, সমালোচক মনোযোগের সহিত উক্ত প্রবন্ধটি পড়েন নাই, কিম্বা তিনি উহার মর্ম্ম ভুল বুঝিয়াছেন। কেন না, আমি উহাতে বরাবরই ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি ও এক স্থলে লিখিয়াছি যে,—'ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে জগতে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, হাজার লেখাপড়া শিখিলেও তাহারা কখনও পরমেশ্বরের সে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাইতে চাহে না।' অন্য স্থলে—'ইহাও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, স্ত্রীলোকের নম্রতা, সরলতা, লজ্জাশীলতাদি গুণই সর্ব্বত্র আদৃত হয়, কিন্তু নারীজাতির অজ্ঞতাকে কেহই মান্য করে না। সেই হেতু, প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীদের ঐ সকল গুণের আরও উৎকর্ষ লাভ ব্যতীত অপকর্ষলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। * * * প্রকৃত শিক্ষাই নারীকে স্বামীর সহায় ও উপযুক্ত ভার্য্যা করিয়া তুলে, * * * উহাই কেবল জননীকে তাঁহার পবিত্র কর্ত্তব্যে অধিকতর পারদর্শিনী করে।' ইত্যাদি।

সুতরাং, সাধনার সমালোচক যে বলেন,—'প্রকৃতি যে রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন'—ইহা কে অস্বীকার করিবে? অন্য দিকে, প্রকৃতি নারীকে 'গৃহবাসিনী' করিয়াছেন, কিন্তু 'পিঞ্জরবাসিনী'র অনুরূপ প্রবৃত্তিও দেন নাই ও চিরকারারুদ্ধা করিয়া সৃজনও নাই—ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? অতএব যখন জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া, পুরুষজাতি, নারীজাতির প্রতি সম্পূর্ণ শাসন ও অধিকার চালাইয়া থাকেন, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার কথা উঠিবামাত্র ঐ সামান্য অক্ষমতা অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতে থাকেন, তখন নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন—ইহা দেখিতেও অধিক বুদ্ধির আবশ্যক হয় না। অবশ্য, যেমন—হাতে মারা বা ভাতে মারা—এই দুই প্রকারেই মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া যায় ; সেইরূপ—সবল শারীরিক শক্তির চালনা বা কঠিন মানসিক বৃত্তির গঞ্জনা—এ দু' রকমেই এক জাতি অপরের প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারে।

আর, স্ত্রীলোক উচ্চশিক্ষা পাইলে বাহিরের কর্ম্মে যে কতদূর সফল হইতে পারেন, তাহা ত আমি 'শিক্ষিতা নারী'তেই ভাল করিয়া দেখাইয়াছি ; অতএব, ও বিষয়ে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তবে তাহাদের সুখী অসুখী হওয়ার মীমাংসা আমরা এখন করিতে পারি না। বিশেষ, সুখদুঃখ জীবনের সকল অবস্থাতেই আছে, তবে নারীজাতি শিক্ষিতা হইলেই যে সংসারের যত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, এরূপ বিবেচনা করাও যুক্তিসঙ্গত নয় ; অন্য দিকে, উহাতে তাহাদের কষ্ট বাড়িবে বলিয়া ভয় দেখানও জ্ঞানীর কাজ নয়।

সমালোচক বলেন,—'প্রকৃতির নির্দ্দেশে যিনি সংসারের মা হইয়া জন্মান, তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয়ের জন্য নহে, বিতরণের জন্য।'—ঠিক। কিন্তু নারীদিগকে উচ্চশিক্ষা দিলেই, তাহারা সকলে যে কানে কলম গুঁজিয়া আফিসে আফিসে কাজের উমেদারী করিয়া বেড়াইবে ও দু'চার টাকা পারিশ্রমিকের জন্য দু'এক ঘণ্টা খাটিবে—ইহা

কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন? তবে যাহাদের ভরণপোষণ করিবার কেহ নাই ও সহায়-সম্পত্তিরও অভাব, তাহারা যদি আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে নিজে উপার্জ্জন করিয়া, পরিবার পালন করিতে পারে, তাহা হইলে উহা নারীদিগকে অপমানের পরিবর্ত্তে আত্মমর্য্যাদা ও মহত্ত্বই শিক্ষা দিয়া থাকে, বিশেষ, যে নারীর শিশু সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, সে যদি তাহাদের কান্নায় উপেক্ষা করিয়া, অন্য স্থলে নিজের শিক্ষাজ্ঞান বিলাইতে যায়, তাহা হইলে লোকে যে তাহাকে বাতুল বলিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমি যে পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্ত্রীদের অর্থোপার্জ্জনের দৃষ্টান্তগুলি তুলিয়াছিলাম, তাহা নারীজাতিকে অর্থলোলুপ করিবার শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে—কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চোক খুলিবার জন্য ; কারণ, দেশীয় ভ্রাতাদের ন্যায়, আমার দেশীয় ভগিনীরাও যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত, যেরূপে হউক, দু' চারটি 'পাশ' করিয়া পুস্তকের পাত বন্ধ করেন ও সরস্বতীর কাছে বিদায় লন—তাঁহাদিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়াও আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃতি নারীকে যে 'সংসারের মা' এই উন্নত আখ্যা দিয়াছেন, সেই গুরুতর নামের ঠিক অর্থ বুঝিয়া, তাঁহারা যাহাতে ঐ পদবী সার্থক করিতে পারেন, তদনুরূপ উচ্চ শিক্ষাই নারীর যোগ্য। আর সে শিক্ষা কিরূপ ও কত উপকারী, অতঃপর তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার কথা উঠিলেই—সকলেই সমস্বরে—তাহাদের এটা শেখা উচিত, ওটা অনুপযোগী ইত্যাদি নানা মতে সায় দিয়া যান ; কিন্তু ঐ গুরুতর বিষয়ে অতি অল্প লোকই নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। মনে করুন, নারীজাতির বিষয়কর্ম্মের কাজ শেখায় অনেকেই অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, কাজের অভ্যাস কেবল দোকান, আফিসেই দরকার ; স্ত্রীলোকদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র পরিবারে সে শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, জীবনের ছোটবড় সকল বিষয়েই, সেই বিষয়কর্ম্ম, হিসাব-নিকাশের অভ্যাসটুকু না খাটাইলে চলে না। যে কোনও কর্ম্মে মিলন, শৃঙ্খলা ও আয়-ব্যয়ের আবশ্যক, সেইখানেই ঐ জমাখরচের কার্য্যতঃ জ্ঞানটুকু একান্ত উপকারী, ঐ সম্বন্ধে গৃহ ও পরিবার চালান, দোকান বা আফিস চালান অপেক্ষা কিছু আর অল্প বুদ্ধিতে পারা যায় না। অন্যান্য গুরুতর কর্ম্মের ন্যায় গৃহপালন ও সংসারশাসনেও শৃঙ্খলা, নির্ভুলতা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, নৈপুণ্য ও বিবেচনাশক্তি চাই—নতুবা কোন স্ত্রী গৃহের পরিচর্য্যায় সফল হইতে ও পরিবারে সুখশান্তি বিধান করিতে পারিবেন না। কাজকর্ম্মের অভ্যাসের ন্যায়, শৃঙ্খলাও নারীর আর একটি প্রধান শিক্ষণীয় গুণ, উহা দ্বারা সংসারের কাজ সময়ে সারিয়া উঠিতে পারা যায়, উহার প্রভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পায় না, ও এলোমেলোর নামও শুনা যায় না ; উহার জন্য সময়ের অপব্যবহারও কমিয়া আসে।

জীবনে সফল হইতে গেলে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও বিচক্ষণতা চাই ; কার্য্যতঃ জ্ঞান ও কর্ষিত বিচারশক্তি হইতেই উহার উৎপত্তি। উহা দ্বারা সকল বিষয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা, ঠিক ভুল, শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। উহা ব্যতীত তাহারা কখনও দৈনিক জীবনের কার্য্যে পারগ হইতে পারে না। বিশেষতঃ গৃহক্ষমতা ঠিক করিয়া চালাইবার জন্য—স্ত্রীলোকের একাধারে সেবিকা ও শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য—মানসিক কর্ষণ তাহাদিগের

যতদূর শক্তি ও সাহায্য দিতে পারে, সে সকল জ্ঞানশিক্ষার আমাদের একান্ত আবশ্যক। কেবল স্বাভাবিক জ্ঞান মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা নীচ জন্তু বাঁচিয়া থাকে, সে জ্ঞানলাভে শিক্ষার কোন দরকার নাই। কিন্তু পরিবারপালনে যে মানববুদ্ধির সতত আবশ্যক, তাহার কর্ষণ একান্ত উপকারী। মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের ভার প্রকৃতি স্ত্রীজাতির উপর অর্পণ করিয়াছেন, আর সেই শারীরিক অবস্থার ভিতরেই সকলের নৈতিক ও মানসিক স্বভাব আচ্ছাদিত থাকে ; সুতরাং প্রাকৃতিক বিধান বুঝিয়া, তদনুসারে চলিলেই সন্তানদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধান করিতে পারা যায়।

ইহা বলাও অসঙ্গত যে, পরমেশ্বর যে মানব বুদ্ধি, স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই, চালনার নিমিত্ত দান করিয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষের দ্বারাই অনুশীলিত হইবে, আর নারীজাতির সেই শক্তি মরিচা ধরিয়া যাইবে। ঈশ্বর এরূপ উচ্চ দান কখনও কোনও মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত আমাদিগকে দেন নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার দান অনেক সময়ে অসংখ্য বটে, কিন্তু তিনি কখনও অমিতব্যয়ী নহেন।

স্ত্রীজাতি এ জগতে জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া কেবল দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্তেও তাহারা গঠিত নহে। পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে। আর সংসারে যে গুরুতর কর্ত্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।

সাধারণতঃ বলিতে গেলে, বাল্যকালে পুরুষজাতির যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, নারীরাও তাহার অত্যন্ত উপযোগী ; আর যে বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চ্চা পুরুষের মনকে সৎচিন্তা ও সদিচ্ছায় পূর্ণ করে, তাহা স্ত্রীদের পক্ষেও তদনুরূপ স্বাস্থ্যজনক। বাস্তবিক, যে সকল যুক্তি বালকদের উচ্চশিক্ষার পক্ষে খাটান হইয়াছে, সে সমুদয় উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষেও এক ভাবে খাটে। গৃহের সকল বিভাগেই কর্ষিত জ্ঞান ও মার্জ্জিত বুদ্ধি গৃহিণীকে অধিকতর যোগ্য ও নিপুণ করিয়া তুলিবে। শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়াতে তাহারা সহজে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হইবে না। স্ত্রীরা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়াও কেমন সমনীতিশীলা থাকিতে পারেন, তাহা দেখিলে, পরিবারের স্বামী পুত্রেরা আপনা হইতেই পাপাচরণে বিরত হইবে; আর উপযুক্ত আত্মসাহায্যে ও আত্মনির্ভরতা দ্বারা, তাহারা গৃহে প্রকৃত সুখ, আরাম ও শান্তি আনিবে।

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও নীতিজ্ঞানের উপরেই পুরুষজাতির শিক্ষা একান্ত নির্ভর করে ; আর আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, কোনও লোকের চরিত্র সেই ব্যক্তির গৃহের, বিশেষতঃ জননীর, উদাহরণ দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে, তখন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও সুশিক্ষাই যে জাতির উন্নতি ও নীতিজ্ঞানের প্রধান মূল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আর মানুষের কেবল নৈতিক শিক্ষা নয়, মানসিক শক্তিও স্ত্রীলোকের জ্ঞানচর্চ্চা হইতে অনেক পরিমাণে কর্ষিত ও সবল হয়। সুতরাং, সমাজে উভয় জাতি যত সমভাবে আচরিত হইবে, উভয়ের শিক্ষা যত সমানরূপে সাধিত হইবে ও উভয়ের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান যত সম্পূর্ণরূপে

উন্নত হইবে, সমাজ তত অধিক শৃঙ্খলাময় ও সমতানিক হইয়া চলিবে ; তত অধিক সুখশান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হইবে।

শ্রী কৃষ্ণভাবিনী দাস

সাহিত্য, মাঘ ১২৯৮

বালবিধবা ও ব্রহ্মচর্য্য

বিগত মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী [যদ.] দাস মহাশয়া "বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য্য" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলাম। অনেক দিন হইতে বিষয়টি আমারও চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ও সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু ধারণা হইয়াছে, আজ তাহারই কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিলে অসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এ বিষয়টি যত বড়, আমার মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার তুলনায় ইহার আলোচনা অত্যন্ত কম। কদাচিৎ যদিও দুই চারিটি কথা আলোচিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়ই তাহাতে গভীরতা এবং আন্তরিকতার অভাব দৃষ্ট হয়। যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে যতখানি সম্ভব হৃদয় দিয়া বুঝিতে অনুভব করিতে হইবে। মোটামুটি যাহা চোখে লাগে তাহাই দেখিয়া দেখা শেষ করিলে আমরা ইহাকে কিছুই বুঝিতে পারিব না। গোড়ায় ব্যাধি কোথায় না ধরিতে পারিলে ঔষধের ব্যবস্থায় সুফল লাভের আশা কোথায়?

কেহ কেহ মত করেন যে বালিকা বিধবা হইবামাত্র তাহাকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাহাতে সে বুঝিতে পারে ভগবান তাহাকে অন্যরূপে জীবন যাপন করিতে পাঠাইয়াছেন, সংসারের সুখে তাহার কামনা রাখা অনুচিত। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি তবে কি ঐরূপ শিক্ষা লওয়া এবং ঐরূপ ধারণা করিয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না!

প্রথমে দেখিতে হইবে আমাদের দেশের কুমারীদের অবস্থা কিরূপ, এবং বিবাহের প্রথা কিরূপ। আমাদের ঘরে কন্যাটির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবামাত্র তাহাকে বিবাহের কথা ঘর-সংসারের কথা শুনাইয়া শুনাইয়া আত্মীয় স্বজন তাহার মনে একমাত্র সংসারকেই উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া দেন। ফল এই হয় যে তাহারা তখন হইতে একমাত্র সংসারকেই একান্ত করিয়া জানে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তা এবং মন উহার চারিপাশেই পাক খাইয়া বেড়ায়। তাহার পর কোন ক্রমে ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই সে শুনিতে পায় অমুক দিনে তাহার বিবাহ। এ সম্বন্ধে তাহার কোন ইচ্ছা বা মতের দরকার নাই।

আত্মীয় স্বজন একটি অপরিচিত বালককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, খেলাঘরের পুত্তলিকাগুলির মত তাহার জ্ঞানের এবং ইচ্ছার অগোচরে তাহার বিবাহ শেষ হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে তাহার কুমারী-জীবন অবসান হইয়া অকালে বধূজীবনের আরম্ভ হইল। স্বামীর

সহিত মনোমিলন বা প্রণয় ত দূরের কথা—পরিচয় হইতে না হইতেই একদিন সে খবর পাইল সে বিধবা হইয়াছে, আজ হইতে সে ভাগ্যহীনা হইয়া রহিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার কবে আসিল সে কথাটি সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরদিন হইতে যদি তাহাকে শুনিতে হয় তাহাকে ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে, পরহিতে জীবন দান করিতে হইবে, তবে ঐ কথাগুলি কি তাহার পক্ষে বিভীষিকার মত হইয়া উঠে না। এতদিন যাহাকে দিনরাত্রি পাখীর মতন শিখান হইল যে তোমাকে ঘর সংসার করিতে হইবে, সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে, আজ এক মুহূর্ত্তে যদি তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজিতে আদেশ করা যায়, তবে কথাগুলি যতই মহৎ এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত হউক না কেন ফল কিছুই হয় না।

আমি এমন কতকগুলি বালিকা জানি, যাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদের বৈধব্য ঘটিবার পরে তাহাদিগকে উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্য এবং বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা দিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। দরকার বুঝিয়া সুর ফিরাইলে তাহা হৃদয় স্পর্শ করে এমন আমার মনে হয় না।

ব্রহ্মচারিণী বিশ্বপ্রেমিকা সেবাব্রতধারিণী হওয়া কি সহজ কথা? সৌভাগ্যক্রমে এক একজনের প্রকৃতিতে স্বতঃই এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আর, যদি কোন অবস্থায় পড়িয়া মানুষ ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে পারে সে কেবলমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে! ব্রহ্মচর্য্য সেই সমস্ত বিধবাদের পক্ষেই সহজ যাঁহারা পতির সহিত যুক্তাত্মা হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা যথার্থ প্রেম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই স্বতঃ ব্রহ্মচারিণী থাকেন, কোন কৃত্রিম উপায় তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের জন্য প্রয়োজন হয় না।

আমি বলিতে চাহিতেছি না—শিক্ষার দ্বারা কোন ফল হয় না। ইহাই আমার বক্তব্য যে শিক্ষার উহাই উত্তম পন্থা নহে। কন্যাদিগকে যদি বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতা করা যায় তবেই কতকটা ভাল ফলের আশা করা যায়, অন্ততঃ সংযমের শক্তি ত্যাগের শক্তি কিছু না কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, নহিলে একটি ক্ষুদ্রমন অপরিণত অন্তঃকরণের বঞ্চিতাকে হঠাৎ অত হিতোপদেশ দিতে গেলে তাহার ফল ব্যর্থতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আরো একটি কথা আছে, ব্রহ্মচর্য্য শিখাইবে কে? শিক্ষক কোথায়? বড় বড় কথা যাঁহারা শিখাইবেন যদি দেখা যায় তাঁহাদের নিজের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব তবে তাঁহাদের কথায় কি কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে? স্বতঃই মনে হয় এ একটা খেলা চলিতেছে। মানুষের শূন্যমন পূর্ণ করিতে হইলে নিজেকেও যে পূর্ণ করিতে হয়। আমাদের সংসারে আজ সংযমের এবং ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অভাব হইয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারিণী গড়িতে হইলে যাঁহারা গড়িবেন আগে তাঁহাদিগকে সংযমী হইতে হইবে। নহিলে পিতা, ভ্রাতা, কন্যা, ভগ্নীকে মুখে উপদেশ দিবেন ব্রহ্মচারিণী হও, কিন্তু নিজেরা ৪০ বৎসর অতীত হইলেও স্ত্রী-বিয়োগে সংসার রক্ষার অছিলায় দ্বিতীয়বার পত্নীগ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না, চোখের উপর নিত্য ইহা দেখিয়া কাহার আর ঐসমস্ত শিক্ষকের কথায় শ্রদ্ধা থাকে?

পক্ষান্তরে, যাঁহারা সংসারের সুখকে অস্থায়ী এবং নশ্বর বলিয়া বিধবাদিগকে উহা তুচ্ছ করিতে বলেন তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখেন না যে সংসারের সুখকে যতই কেন নশ্বর বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু সংসার করিবার উদ্দেশ্য ত সুখভোগ নহে। সংসার যেমন চরিত্রের

বিকাশলাভের সুন্দর ক্ষেত্র এবং সহজ পন্থা, এমন আর কয়টি আছে? এই সংসারেই নারীর নারীত্ব ফুটিয়া ওঠে, এখানেই সে পত্নীত্বে অভিষিক্ত হয়, এখানেই সে মাতৃত্বের আস্বাদন লাভ করে। সন্তান লাভ করিয়া নারীহৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশির অভ্যুদয় হয় সে কি ছোট কথা? যে স্বর্গীয় স্নেহ, যে অকৃত্রিম বাৎসল্যের অমৃতধারা সে আপনার মধ্যে লাভ করে সে কি সুন্দর পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় নহে? তাহার মন সরস, চিত্ত স্নেহপূর্ণ, দৃষ্টি করুণ হইয়া যায়, ইহা কি উপেক্ষার যোগ্য? স্বামীর প্রণয়ও কি তাহাকে কম মহত্ত্ব দান করে? প্রেমই নারীকে ধৈর্য্যশালিনী, শান্তহৃদয়া ও আত্মবিসর্জ্জনক্ষমা করিয়া তোলে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। আমরা কি বলিয়া বালবিধবাদিগকে এইগুলি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে পারি?

কেহ কেহবা ইচ্ছা প্রকাশ করেন পাশ্চাত্য দেশের কুমারীদের দ্বারা যেরূপ ভাল ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের দেশের বালবিধবাগুলিকেও শিক্ষা দিয়া ঐরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিতে হইবে। কিন্তু আমি বুঝি না তাঁহারা একটা কথা কেমন করিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারেন? মানুষের কাজের সঙ্গে যে তাহার ইচ্ছার একটি প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যোগ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কুমারীরা আপন ইচ্ছায়ই কুমারী থাকেন এবং দেশের ও দশের জন্য আপনাকে দান করেন। কিন্তু যদি নির্ব্বিচারে কতকগুলি চিহ্নিত ব্যক্তিকে লইয়া ঐ উদ্দেশ্যে আমরা একটি দল বাঁধিয়া তুলিতে চেষ্টা করি তবে তাহাতে ফল কতটুকু হইবে? এবং তাহাতে সত্য কতটুকু থাকিবে? কোন রকমে চলনসই করিয়া তোলা ত অত বড় মহৎ কর্ম্মের উপযুক্ত হয় না। আর বাল্যকালের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া এবং প্রকৃতির তারতম্যে এক একটি মানুষ এক একটি পথের উপযুক্ত হয়। যে হয়ত সংসারের পথে গেলে আপনাকে সার্থক করিয়া লইতে পারিত, অন্যপথে তাহাকে জোর করিয়া চালাইতে গেলে সে ব্যর্থ হইয়া যায়। বিধাতা বিচিত্র মানুষকে বিচিত্র পথের জন্য সৃষ্টি করেন, আমরা যদি নির্ব্বিচারে সেই বিচিত্রতাকে লুপ্ত করিয়া সকলকে এক পথে চালাইতে চাই, তবে কি তাহা অপরাধ এবং অন্যায় হইবে না?

এদিকে কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর দেরী করা চলে না, একটা সত্য এবং মঙ্গলপূর্ণ বিধানের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। অকালমৃত্যুর জন্য দেশে বালবিধবা ধরিতেছে না। এদিকে সংসারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে বিধবাদের জন্য আর তাহাতে তিলমাত্র স্থান নাই। পিতৃগৃহে, শ্বশুরগৃহে সর্ব্বত্রই তাহারা অবমানিত, লাঞ্ছিত, এবং অধিকারহীনা। বিধবা হইবার পরে বিধবা [বিধাতা?] যেন সকলের আরামের জন্যই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। তাহার নিকট কাজ আদায়ই সকলের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। পিতামাতা থাকিলে সে কথঞ্চিৎ প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে পারে, নহিলে তাহার আর সান্ত্বনার স্থান দেখিতে পাই না। "সে অলক্ষণা, সে ভাগ্যহীনা, বাঁচিয়া তাহার লাভ নাই।" এই সমস্ত কথা প্রতিনিয়ত শুনিয়া শুনিয়া সে নিজেকে আর বহন করিতে পারে না। যাহার কোন অবলম্বন নাই, জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই, যে আনন্দহীন আশাশূন্য, তাহার জীবন কেমন করিয়া কাটে একথা যদি ভাবিয়া দেখিতাম, ইহা যদি অনুভব করিতাম, তাহা হইলে দিন আর অত আরামে কাটাইতে পারিতাম না। একটি দুইটি জীবন নহে, লক্ষ লক্ষ লোক যে

দেশে এমনি করিয়া প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? কতজন আত্মহত্যা করিতেছে, কতজন ভালবাসার প্রলোভনে সর্ব্বস্ব হারাইতেছে, দেশে সমাজে পাপ ধরে না, তবু কাহারো চৈতন্য নাই! পিতা, ভ্রাতা অসঙ্কোচে ভ্রূণহত্যার উদ্‌যোগ করিবে তথাপি কোন ভাল পথের কথা মনে আনিতে চাহিবে না। এমন পাপ, এত অপরাধ ভগবান বেশীদিন সহ্য করেন না। যাঁহাদের মন আছে শক্তি আছে, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে পথ করিবার সময় আসিয়াছে।

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে দেখিতে পাই ইহার একটি মাত্র পথ আছে। সে হইতেছে আমাদের দেশের স্ত্রীলোককে 'মানুষের অধিকার' দান করা। জ্ঞান বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইবার সুযোগ, ইহা না পাইলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। পরিণত বয়সে ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত যে বিবাহ তাহাই সকলের পক্ষে বিবাহপদবাচ্য। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকরা এমন কি অপরাধ করেন যে তাঁহারা বিবাহ কি তাহা না বুঝিয়াই বিবাহিতা হইতে বাধ্য হন? পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধেও কেন না তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে? যে স্বামীর প্রণয় লাভ করিতে পারিয়াছে সে আপন ইচ্ছায়ই চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থাকিবে। যে বালিকা এখনও পুতুল খেলিয়া বেড়ায় তাহাকেও যে জোর করিয়া তথাকথিত ব্রহ্মচারিণী করিয়া তুলিতে হইবে, ইহার মত জবরদস্তি আমি ত আর কোথাও দেখি না। অনেকে মনে করেন এবং বলিয়া থাকেন পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন হইলে দেশে সতী থাকিবে না। এমন সতী থাকিবার দরকার কি? যে উপায় নাই বলিয়া সতী, যে জ্ঞানহীন সংস্কারের দ্বারা সতী, তাহার সতীত্বের মূল্য কি? তাহার সতীত্ব অভাবাত্মক ধর্ম্মমাত্র।

একদিনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে এমন আশা করি না। সংস্কারের জাল মানুষের মন এমন করিয়া আবৃত করিয়া আছে যে, সহজ যে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ তাহাও প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া আছে। তাঁহারা সহস্র অন্যায় প্রতিনিমেষে অনুষ্ঠিত দেখিবেন তথাপি প্রতিকারের জন্য একটি অঙ্গুলি উত্তোলিত করিবেন না। মৃতআচারবদ্ধ সংস্কারের পায়ে মনুষ্যত্ব সহৃদয়তা সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, সমস্ত শক্তি লইয়া যদি মানুষ চেষ্টা করে তবে দুর্গতি যত বড়ই হউক, সংস্কার যতই কঠিন থাক্, কেন না তাহার কবল হইতে দেশ ও জনসমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে? মহৎ কর্ম্মে ভগবান সহায়। ইচ্ছা থাকিলে শক্তিও তিনিই দিয়া থাকেন।

দেশ যে এতগুলি নারীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে ইহা কি কম ক্ষতির কথা? শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা নারীজাতিকে সবল ও উন্নত না করিতে পারিলে দেশের পুরুষেরাই বা মানুষ হইবেন কি করিয়া? দেশের মঙ্গল চাহিলে সত্য ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্মক্ষেত্রও বিস্তৃত করিতে হইবে, ইচ্ছামত পুনর্ব্বিবাহে অধিকার দিতে হইবে। ইচ্ছা এবং জ্ঞানের দ্বারা যে বিবাহ তাহাই প্রচলিত করিতে হইবে। যতদিন এই সমস্তগুলির প্রত্যেকটি কার্য্যে পরিণত না করা হইবে ততদিন মঙ্গলের আশা দেখি না।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

কিণ্টার গার্টেন

আমি কোন মতেই আমার ছেলে দুটিকে স্কুলে দিতে চাহি না। Miss S. Miss D. প্রভৃতি আমার বন্ধুরা ঐ বিষয়ে আমাকে ক্রমাগত পেড়াপেড়ী করেন ; তাঁরা বলেন, "ছেলে দুটিকে চিরকাল মূর্খ করিয়া রাখাই কি তোমার অভিপ্রায়? এখনকার দিনে বিদ্যাতেই সব ; শৈশবকালে যেমন শিখিবার শক্তি থাকে, তেমন আর কখনও না। কেন বল দিকি, এমন সুন্দর সময়টি বৃথা নষ্ট করিতেছ?" আমি বলিলাম, বাড়ি থাকিলে সময় নষ্ট, আর স্কুলেতেই বুঝি ছেলেদের সময়ের ঠিক উপযুক্ত ব্যবহার হয়? বাড়িতে আমার ছেলেরা একতলা থেকে তেতালা, বাগান, পুকুর, সর্ব্বত্রে স্বেচ্ছাক্রমে ছুটাছুটি করে, খেলা করে ; পাখী, ভ্যাড়ার ছানা, ছাগল, বাছুর, হাঁস, প্রভৃতির সঙ্গে মেলে মেশে, তাদের প্রত্যেক ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, তাদের সুখে দুঃখে মমতা করে ; প্রতি বীজের অঙ্কুর, প্রতি কলির বিকাশ তাহারা কেমন আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে, অতি সন্তর্পণে, কত স্নেহের সহিত তাদের লালন পালন করে। কোন বিষয়ে ছেলেদের কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে অমনি দৌড়িয়া আমার নিকটে আসে, কত তর্ক বিতর্ক করিয়া, নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিয়া আমার কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করে। আমার ছেলেদের মুখে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তির আরক্তিম আভা দেখিতে পাই। আর, স্কুলে শিশুদের কি করিতে দেখা যায়, না একটি সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে ঘাড় গুঁজিয়া পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া, তাহাদের সেই আগ্রহপূর্ণ, সৌন্দর্য্য-লালায়িত চক্ষু দুটিকে সর্ব্বপ্রকার শ্রীবিহীন একখানা শ্লেটের উপর নিবিষ্ট করিয়া সঙ্কলন, ব্যবকলনের রহস্য ভেদ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নয়তো, ভয়ে জড়সড় ভাবে, বিশুষ্ক মুখে ব্যাকরণের অতি দুর্ব্বোধ নিয়ম সকল টিয়েপাখীর মত মুখস্থ করিয়া যাইতেছে। কতক শিশুর, শুদ্ধ স্কুলঘরে বদ্ধ থাকিয়া দিন কাটান মাত্র সার হয়, আর কতকগুলি, যাহাদের একটু অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, এই প্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ও সাধ্যাতীত শ্রমে তাহাদের মস্তিষ্কের সুকোমল অঙ্কুরগুলি শীর্ণ হইয়া আসে, তাহা আর কোন কালে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না। আর শুদ্ধ পুস্তক হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া শিশুদের মন কেবলই অন্যের মতের দাসত্ব করিতে শিখে, তাহাদের স্বাধীন চিন্তা আদবেই ফুটিতে পায় না। সকলেই দেখিয়া থাকেন, শিশু কত অনিচ্ছার সহিত, মুখটি কেমন চুন করিয়া স্কুলে যায়, আর কেমন শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে বাটী প্রত্যাগমন করে। শিশুর আহার যেমন সুমিষ্ট ও লঘু-পাক, তাহার শয্যা যেমন সুকোমল, তাহার কর্ণে যেমন স্নেহসিক্ত স্বর বর্ষিত হয়, তাহার খেলনা সকল যেমন টুকটুকে চক্‌চকে ও আমোদ দায়ক, তাহার শিক্ষা ও শিক্ষার উপকরণও কি তদনুরূপ হওয়া উচিত নহে? যিনি শিশুকে শ্লেটে

সঙ্কলন, ব্যবকলন কষান বা ব্যাকরণের কঠোর নীরস নিয়ম সকল অভ্যস্ত করান "ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্র ধারয়া সমীলতাং ছেত্তুম্ ব্যবস্যতি।" আমার এক বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "এত দিনে তোমার ভাবটা বুঝিলাম, তবে তোমার ছেলেদের কিণ্টার গার্টেনে দাও না কেন? সে তো ঠিক্ তোমার মনের মত স্কুল ;" আমি বলিলাম, "কিণ্টার গার্টেন কি তাতো আমি জানি না, আমি তো কখন তার কিছু দেখিওনি শুনিওনি।" তিনি বলিলেন "কিণ্টার গার্টেন কি তাহা দুচার কথায় বুঝাইয়া দেওয়া আমার কর্ম্ম নহে, কাল সকালে আমার সঙ্গে যাও তো তোমাকে দেখাইয়া আনিব, এই Camden Hill-এ তেই একটা আছে, বেশি দূর যেতে হবে না। জর্ম্মানিতে এ শিক্ষা প্রণালীর সৃষ্টি হয়, অল্প দিন হইল ইহা আমাদের দেশে প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে লণ্ডনের উন্নতিশীল মাতারা আপন আপন সন্তানদের এই স্কুলে দিতে বড়ই উৎসুক, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর অভাবে এখনও বহু সংখ্যক কিণ্টার গার্টেন স্থাপিত হয় নাই। এই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট নহে, ফ্রুবেলের উদ্দেশ্য সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করা, তাঁর ঠিক ভাবটি মনের সহিত অনুভব করা শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। শিক্ষয়িত্রীটি প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী হওয়া চাই।" পরদিন সকালে আমার বন্ধুর সহিত বাহির হইলাম। তিনি আমাকে সুসজ্জিত উদ্যান-বেষ্টিত একটি বাটীতে লইয়া গেলেন। শুনিলাম গৃহকর্ত্রীর একটি পাঁচ বৎসরের কন্যা আছে, তাহার জন্যে একটি কিণ্টার গার্টেন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন, আর স্কুলের নিমিত্ত বাড়ির একটি ভাল ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁর ইচ্ছা যে কতকগুলি প্রতিবাসী-সন্তান আসিয়া তাঁহার কন্যার সহিত শিক্ষা করে। তখন স্কুল চলিতেছে, আমরা গিয়া ঘরের এক পাশে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরটি লণ্ডনের পক্ষে বেশ বড়, অনেকগুলি জানালা আছে ; গ্রীষ্মকাল, তাই সকল জানালাই অর্দ্ধ উন্মুক্ত ; জানালা দিয়া নানা বর্ণের পাতা, ফুল, ফল, সবুজ ঘাসে ঢাকা উদ্যান-ভূমি দেখা যাইতেছে, ঘরের দেওয়ালে নানা জন্তু ও পাখীর রঞ্জিত চিত্র লাগান, এক পাশে একটি পিয়ানো, এক পাশে ছোট ছোট দু তিনটি কাঁচের আল্‌মারী, আল্‌মারীর ভিতরে শিশুদের হাতের কাজ, খেলেনার সামগ্রী-সকল অতি যত্নে রক্ষিত, সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আল্‌মারীর কাছাকাছি, একটি জানালার সামনে একটি টেবিল, টেবিলের তিন দিকে ছোট বেঞ্চিপাতা, আর এক দিকে শিক্ষয়িত্রীর চৌকি, ইহাতে সকল শিশুগুলিই শিক্ষয়িত্রীর চক্ষের সম্মুখে থাকে। ঘরের অধিকাংশ স্থান খালি পড়িয়া আছে, বৃষ্টি বা ঐ রূপ কোন কারণে বাগানে যাইবার প্রতিবন্ধক ঘটিলে দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাফেরা, খেলাধূলা, সকল ঘরের ভিতরেই হয়। সব শুদ্ধ আটটি শিষ্য। ইহারা ১২টির অধিক লইতে চাহেন না ; কেন না, তাহাতে ভিড় হয় ও একজন শিক্ষকের আয়ত্তাতীত হইবার সম্ভব। শিশুদের সকলেরই প্রফুল্ল মুখ, সকলের সম্মুখে নিজ নিজ শিক্ষা বা খেলিবার সামগ্রী, সকলেই আনন্দ ও উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। শিক্ষয়িত্রীর প্রসন্ন মুখে স্নেহ মাখা হাসিটুকু লাগিয়া রহিয়াছে, তিনি স্নেহময় দৃষ্টিতে শিষ্যদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, মাঝে মাঝে শিশুদেরই মত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাহাদের কাজের সহায়তা করিতেছেন। শিক্ষক যেমন স্নেহের সহিত শিখাইতেছেন, শিশুরাও তেমনি অসঙ্কোচ সরল ভালবাসার ভাবে

তাঁহার কথা শুনিতেছে এবং যখন যাহা ইচ্ছা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমি অতি তৃপ্তির সহিত এই সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। স্কুল শেষ হইলে শিক্ষয়িত্রী আমার বন্ধুর অনুরোধে কিণ্টার গার্টেনের বিশেষ বিবরণ-সকল আমাকে বলিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁরা সন্তানদের খেলিবার জন্য এই সুন্দর বাক্সগুলি ক্রয় করেন, তাঁরা মনে করেন, এই খেলেনাগুলিকেই কিণ্টার গার্টেন বলে। এই খেলেনাগুলি ছেলেদের নিকট খুব আমোদজনক বটে কিন্তু শুদ্ধ আমোদই ইহার সীমা নহে। এই সাদাসিধে খেলেনাগুলি দ্বারা যথাযথতা (Accuracy) পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির প্রথম নিয়ম সকল শিক্ষা দেওয়া হয়, খেলার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যদক্ষতা জন্মে, শ্রমেতে আনন্দ অনুভব করা অভ্যাস পায় ; শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে। স্বচ্ছন্দে অঙ্গচালনা, নৃত্য, গীত-ক্রীড়াতে শুদ্ধ যে স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে এমত নহে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি চটুলতা লাভ করে, চক্ষু কর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাহ্য জগতের সুনিয়ম, সৌন্দর্য্যের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে তাহাদের মনে ধর্ম্ম ও নীতির সংস্কার জন্মে, তাহারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পায়, এই প্রকারে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার উপযোগী বয়োপ্রাপ্তির অনেক পূর্ব্বেই শিশুদের মন তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লোকে হয় ত মনে করিবে, এ প্রণালীটিকে বড় বাড়ান হইয়াছে কিন্তু মানব প্রকৃতি যত্নপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া এ প্রণালীটি গঠিত হইয়াছে ; ইহা যদি সত্য হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উচ্চতম উৎকর্ষের অঙ্কুর ইহাতে নিহিত। এক একটি শিশুকে এক একটি বৃহৎ ব্যাপার করিয়া তোলা কিণ্টার গার্টেনের অভিপ্রায় নহে। শিশুর প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম বৃত্তিটিকে তাহার আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়া, তাহাকে তাহার স্বল্প শক্তি অনুসারে এমন স্থানে আনয়ন করা যাহা কখন পরিত্যাগ করিতে হইবে না, এমন শিক্ষা দেওয়া যে তাহা কখন ভুলিবার আবশ্যক হইবে না ; তাহার মনে জ্ঞান স্পৃহা উত্তেজিত করা এবং তাহাকে আত্মশিক্ষায় সমর্থ করা—ইহাই কিণ্টার গার্টেনের উদ্দেশ্য। আমরা খুব ভরসার সহিত বলিতে পারি যে এই প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুরা পরিণত বয়সে অন্যদের অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষার উপায় সকলের অধিকতর সদ্ব্যবহার করিবে এবং বুদ্ধি বিবেচনাতে ও কাজ কর্ম্মে ইহাদের অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অর্থাৎ, জীবনের যাহা যথার্থ লক্ষ্য—আত্মোন্নতি ও পরোপকার সাধনের সামর্থ্য, তদভিমুখে ইহাদের সমধিক উন্নতি হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সচরাচর লোকে, ফ্রুবেলের প্রণালীর প্রধান অঙ্গ স্বরূপ এই খেলানাগুলির যথার্থ মূল্য বুঝে না, এ গুলিকে শুদ্ধ খেলেনার মত গণ্য করাতে ইহা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। এ গুলি কেবলই খেলেনা নহে, কেন না শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য ; এগুলি শুদ্ধ শিক্ষার জন্যে নহে, খেলিবার অভিপ্রায়েও প্রস্তুত হইয়াছে ; দুয়েতে মিলিত। উভয় দিকেই শিশুদের মনের যে স্বাভাবিক গতি আছে তাহা উত্তেজিত ও সুনিয়মে চালনার নিমিত্ত এ গুলি প্রস্তুত। কার্য্য ও ক্রীড়া একত্রীভূত করা কিণ্টার গার্টেনের অভিপ্রায়, ক্রীড়ার সামগ্রীর মধ্যে মন ও শরীর সঞ্চালনার উপযোগী গুণ থাকিলেই এইরূপ ঘটনা

সম্ভব। এই খেলেনা সকল শৃঙ্খলের ন্যায় একটির সহিত আর একটি সংযুক্ত, ইহার এক একটিকে পৃথক্ করিলে ফল নষ্ট হয়, যে সকল শিক্ষয়িত্রীরা ফ্রুবেলের প্রণালী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁদের হস্তে এ খেলেনা কোন কাজেই আসে না, ইঁহারা কেবল ফ্রুবেলের উপর লোকের ঘৃণার উদ্রেক করেন।

ফ্রুবেলের মত-বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁর এই দান (এই সকল খেলেনাকে ফ্রুবেলের দান বলে।) কি, ইহার কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহার মধ্যে কতকগুলি ক্রীড়া শ্রমসাধ্য, এ গুলি না থাকিলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না। গীত ও নৃত্য, স্বচ্ছন্দে অঙ্গ চালনা, এই সমস্ত শ্রমসাধ্য ক্রীড়া। নিপুণতার কার্য্যে পারগ হইবার পূর্ব্বে শিশুরা কেবল এই সকলেতে যোগ দেয়। কোন সাদাসিধে গল্প, কোন কার্য্যের বর্ণনা, বাহ্য জগতের কোন বস্তু, পাখী, পশু, গাছ, ঋতুর পরিবর্ত্তন, কিম্বা যে যে ভাবের সহিত শিশুরা পরিচিত, এই সমস্ত বিষয় লইয়া গান গুলি রচিত। কোন কার্য্যের বর্ণনা বিষয়ক গান গাইবার সময় শিশুরা তালে তালে স্বচ্ছন্দে অঙ্গ চালনা দ্বারা সেই কার্য্যের অনুকরণ করে। এই সকল শ্রমসাধ্য ক্রীড়াতে শিশুরা অবিরাম আনন্দ উপভোগ করে। এক্ষণে, নিপুণতার ক্রীড়া সকলের কথা আনুপূর্ব্বিক বলি।

প্রথম দান—গোলা। প্রত্যেক শিশুকে একটি গোলা দেওয়া হয়, গোলা সকল সম আয়তন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের, গোলার একস্থানে এক গাছি সূতা বাঁধা, তদ্দ্বারা গোলাটিকে ঝুলান যায়। গোলা ও অন্যান্য খেলেনা দিবার প্রথম উদ্দেশ্য, চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের সহিত ইহাদের যে প্রভেদ তৎপ্রতি শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করা। গোলকের সাদাসিধে আকৃতিতে মনে শুদ্ধ একটী ভাব উদ্রেক করে, ভিন্ন ভিন্ন রেখা ও পৃষ্ঠা (Surface) একত্র করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় না ; ইহাও একটি কারণ। গোলা-খেলা এই রূপে হয়—গোলা কখন নামান, কখন উঠান, একবার বামে, একবার দক্ষিণে, এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে, এক শিশুর নিকট হইতে অন্য শিশুর নিকট দেওয়া হয়, এবং এইরূপ প্রতি পরিবর্ত্তনে অন্য দ্রব্যের ও স্থানের সহিত গোলার কি রূপ সম্বন্ধ-পরিবর্ত্তন ঘটে তৎপ্রতি শিশুদের লক্ষ্য থাকে। প্রত্যেক কাজটি শিক্ষকের অনুজ্ঞায় কৃত হয়, সকলেতেই সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা। যেমন শিক্ষক বলিলেন "এক" অমনি সকল শিশু এক হাত দিয়া নিজ নিজ খেলেনার বাক্স ধরিল, "দুই" তৎক্ষণাৎ অপর হস্ত দিয়া বাক্সের ডালা খুলিল ; "তিন" শিশুরা খেলেনাগুলি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। এই প্রণালীতে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ভাবে নৈতিক অনুশাসন সর্ব্বদাই বিরাজমান। সকলে মিলিয়া কাজ করাতে শিশুদের মনে একটি ভ্রাতৃভাব জন্মে, শিশুদের মধ্যে প্রশংসা স্পৃহা খুবই জাগ্রত থাকে কিন্তু তাহারা পুরস্কার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে না, আর তাহারা শ্রম ও অনুজ্ঞার প্রীতিকর ভাবটিই দেখে। একাকী বসিয়া নীরস পাঠ অভ্যাস ও দুরূহ বিষয় আয়ত্ত করিতে গিয়া শিশুদের শিক্ষার প্রতি সে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাদের স্বভাব যেরূপ খিট্‌খিটে হইয়া যায়, কিণ্টার গার্টেনের শিশুরা সে সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহতি পায়।

দ্বিতীয় দান একটি গোলক, একটি ঘনাকৃতি (Cube) ও নল। শিশুদের নিরীক্ষণ করিয়া

দেখিবার যে একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহার উত্তেজনায় তাহারা আপনা হইতেই এই বস্তু গুলির পার্থক্য ও বিভিন্ন কাজ প্রভৃতির আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়। গোলার সাদাসিধে গঠন, কিন্তু এ খেলেনা কয়টি পার্শ্ব, পৃষ্ঠা, রেখা, পরিধি বিশিষ্ট ; এ সকলের ভিন্নতা নির্ব্বাচন উপলব্ধি হইলে ইহাদের যথার্থ নাম শিশুদের বলা হয়। তাহাতে, এই সকল আকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান শিশুদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। সচরাচর লোকে যাহাকে শিক্ষা বলে, দ্বিতীয় দান হইতেই তাহা আরম্ভ হয়। যে সকল সত্য ও সম্বন্ধের উপর জ্যামিতি গঠিত, শিশুরা এই দান লইয়া খেলিতে খেলিতে তৎ সমুদয়ের সহিত পরিচিত হয় এবং এরূপ ভাবে কতকগুলি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাদের স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের অংশীভূত হইয়া পড়ে। ইহাতে ভবিষ্যতের শিক্ষার পথ সুগম হয়। আর, যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তি দ্বারা এক সত্য হইতে আর এক সত্য নির্ণয়, অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ উপলব্ধি করার যে একটি অভ্যাস জন্মে তাহা অতি মূল্যবান। বিজ্ঞানের কঠিন সত্য সকল সহজ ভাষায় পরিণত করিয়া শিশুদের শিক্ষা দেওয়া এ প্রণালীর উদ্দেশ্য নহে, শিশুদের সমক্ষে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে, তাহাদের মুকুলিত বুদ্ধি সহকারে তাহা বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য।

তৃতীয় দান ছোট ছোট আটটি ঘনাকৃতি-রচিত একটি ঘনাকৃতি। সমুদয় হইতে অংশ নির্ব্বাচন, অংশের সংস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ, তাহা গণনা করা এবং এই খণ্ড ঘনাকৃতি সকল লইয়া নির্ম্মাণের নানা উপায় আবিষ্কার করা এই ক্রীড়ার প্রধান অঙ্গ। এই প্রণালীতে অঙ্ক ও গঠনের সুষমা (Symmetry) এই দুইটি বিষয়ে স্থায়ী শিক্ষা লাভ হয় ; অঙ্কে এক এক পদ অগ্রসর হইয়া ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত উঠে ; এবং এই ছোট ছোট ঘনাকৃতি লইয়া নানা প্রকার সুন্দর আকৃতি গঠন করিয়া সুষমা বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। অঙ্কের অর্থ পরীক্ষা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে শিশু একটিও অঙ্কের নিয়ম শিখে না ; শিশু তাহার সম্মুখস্থ বস্তু লইয়া নিয়মানুযায়ী কতকগুলি কাজ করে, এবং এই ক্ষুদ্র স্তূপ লইয়া ভাগ করে, যোগ করে, হরণ করে, আবার সবগুলিকে একত্রীভূত করে, এইরূপে কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ; তখন একটি সংক্ষেপ নিয়ম বলিয়া দেওয়া হয়। সে পূর্ব্বে যাহা করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ করিতে পারে, তাহা কথায় পরিণত করাতে কাজের কিরূপ সহায়তা করে তাহা শিশু নিজেই বুঝিতে পারে। এই cube গুলি দিয়া যে কত কত প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করা যায়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। শিশুরা যে সমস্ত দ্রব্যের সহিত সুন্দর রূপে পরিচিত—টেবিল, বেঞ্চি, দরজা, জানালা, সিঁড়ি—তাহা নির্ম্মাণ করে, শিক্ষক ইহার প্রত্যেকটির দ্বারা শিশুদের সম্মুখে জ্ঞানের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহারা ইহাদের গঠনের সাম্য ও বৈষম্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এবং সুষমার আনুষঙ্গিক একটি পূর্ণতার ভাব, বা সুষমার অভাব জনিত একটি অপ্রীতিকর ভাব পর্য্যবেক্ষণ ও তাহা লইয়া আলোচনা করে। এই সকল বস্তু সম্বন্ধে কোন ঔপন্যাসিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা শিক্ষকের মনে আসিলে তিনি তাহা সহজ গল্পের মত করিয়া শিশুদের বলেন, শিশুরা আনন্দ ও মনোযোগের সহিত এই প্রকার খেলাতে নিযুক্ত থাকে ; কেন না, ইহাতে তাহাদের সমুদয়

মনোবৃত্তি সুন্দররূপে চালিত হয়, অথচ ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। শিশু যে চিন্তা করিতে অনিচ্ছুক বা অপারক নহে, প্রত্যেক নূতন ঘটনায় তাহাদের "কেন" জিজ্ঞাসাতেই তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু সে কেবল উপস্থিত সত্য সম্বন্ধে ভাবিতে সক্ষম, দূরকালের কোন কথা বা ঘটনার প্রতিমা মনে আনিতে পারে না।

শিক্ষাকার্য্য শেষ হইলে শিশুরা স্বেচ্ছাক্রমে রেষারিষি করিয়া নানা আকৃতি নির্ম্মাণ করে, যাহাতে তাহাদের মনের উদ্ভাবনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই দিকেই শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে। ফ্রুবেলের প্রণালী বিষয়ে প্রধান লেখক, B. von Marenholtz Bulow[৩৭] বলেন "শৈশবের স্বাভাবিক চঞ্চল বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখা বা যথোপযুক্ত উত্তেজনা না করাতেই মানুষের মনে নবোদ্ভাবনী শক্তির অভাব ঘটে, স্বাধীন কার্য্যই স্বাধীন চিন্তা সৃষ্টি করে।" কিণ্টার গার্টেনে, বুদ্ধির অরুণাভাস হইতেই এই প্রকার শিক্ষার সূত্রপাত হয়, এবং এই শিক্ষার ফল এই হয় যে মনোবৃত্তির চালনায় সততই আনন্দ অনুভব হয়—কখনই কষ্ট হয় না।

চতুর্থ দান—ইহাও একটি ঘনাকৃতি, আয়তনে পূর্ব্বটির ন্যায় কিন্তু আটটি ছোট ছোট দীর্ঘ চতুরস্র (Oblong) আকৃতির টুক্‌রায় বিভক্ত। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রসারের দ্বিগুণ এবং প্রসার গভীরতার দ্বিগুণ। ইহা দ্বারা রেখা ও পৃষ্ঠা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন জ্ঞান জন্মে। ঘনাকৃতির সহিত শিশু পরিচিত, কিন্তু আংশিক খণ্ডগুলি তাহার নিকটে নূতন। শিশু দেখে, পূর্ব্ব খণ্ডগুলির সকল পার্শ্বই আকৃতি আয়তনে সমান ছিল, এগুলির আকৃতি আয়তন ভিন্ন ভিন্ন ; কাজেই এক্ষণে তাহাকে নূতন আবিষ্কার করিতে হইবে ও নূতন নাম শিখিতে হইবে। আকৃতি গঠন ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি সকলই পূর্ব্বকার ন্যায়।

ইহার পর আর দুটি দান আছে। ১ম ছোট ছোট গোল কাটি। ২য় চেপ্টা কাটি। দুইটি একরূপ কাজে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একত্রে দুইটির উল্লেখ করা গেল। গোল কাঠি প্রায় ৩।।০ ইঞ্চি, চেপ্টা কাটি ১০ ইঞ্চির কিছু অধিক লম্বা। অঙ্কশিক্ষা, জ্যামিতির রেখাচিত্র প্রস্তুত, ও তৎসম্বন্ধে শিশুর নূতন সত্য আবিষ্কার, নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এ দানের কার্য্য। পূর্ব্বে কেবল নিরেট পদার্থ ও পৃষ্ঠার জ্ঞান ছিল, এক্ষণে এই কাটিগুলিতে রেখার বোধ জন্মিল। শিশুরা বস্তুর সীমান্ত রেখা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই দুই প্রকার কাটি দিয়া ত্রিকোণ প্রভৃতি গঠনের সুষমা-বিশিষ্ট নানা বস্তু প্রস্তুত করা যায়, নূতন নূতন আকৃতি উদ্ভাবনে শিশুদের মন ক্রমিকই উত্তেজিত হয়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে যে খেলেনার বর্ণনা করা হইল, কেবল গোলা ও নল ব্যতীত, সে সমুদয়ই সরল রেখা বিশিষ্ট। ইহার পর বক্ররেখা আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে মনুষ্য-নির্ম্মিত বস্তুর অনুকরণ করা হইত, মনুষ্য-নির্ম্মিত দ্রব্য প্রায়ই সরল রেখা বিশিষ্ট, এক্ষণে প্রকৃতি আদর্শস্থলে স্থাপিত হইলেন, প্রাকৃতিক পদার্থে বক্ররেখারই প্রাধান্য। চক্রের আয়তন, ভার, কি ধাতুতে নির্ম্মিত ও তাহার গুণাগুণ, এই সমস্তের আলোচনা দ্বারা খেলা আরম্ভ হয়। শিশুরা শিখে যে, নলের তলভাগে যাহা দেখা যায়, সেই আকৃতিব নাম চক্র। চক্রসকল সম-আয়তন, একটির পর আর একটি রাখিয়া শিশুদের সমক্ষে তাহা প্রমাণ করা হয়, দুইটি

চক্র পাশাপাশি রাখিয়া শিশুরা এই মূল্যবান সত্যটি সংগ্রহ করে যে একটার উপর আর একটা না রাখিলে আর কোন উপায়ে চক্রে চক্রে একটি স্থানের অধিক ঠেকাঠেকি হইতে পারে না। চক্র, চক্রার্দ্ধ, চক্রখণ্ড প্রভৃতি লইয়া আর তিনটি খেলা আছে। কখন ভিন্ন ভিন্ন অংশ দিয়া পরিধি প্রস্তুত হয়, কখন চক্রখণ্ড দ্বারা বিবিধ প্রকার বক্ররেখা সাজান হয়।

এইরূপে খেলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করা হয়, শিক্ষার প্রণালীটি অতি মূল্যবান। লোকে সচরাচর যাকে শিক্ষা দেওয়া বলে এ সেরূপ নহে, ইহা শিশুদিগকে আত্মশিক্ষার পথ প্রদর্শন করে, শিশুদের মনোবৃত্তি এরূপে উত্তেজিত করা হয় যে তাহারা আপনা হইতে পর্য্যবেক্ষণ, তুলনা ও ফল নির্দ্ধারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। যখনই নূতন কিছু শিখাইবার আবশ্যক হয়, তখন এমন কৌশলে বস্তু সকল স্থাপন করা হয় যে শিশু আপনা হইতে সেই সত্যটি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় ; তখন হইতে এই নূতন আবিষ্কৃত সত্যটি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকে। কোন মুখস্থ করা জ্ঞান তাহার নিকটে কোন কালে এতাদৃশ মূল্যবান হয় না। শিক্ষক বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে শিশুকে এরূপ অবস্থায় স্থাপিত করেন যে সে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারে না। এই উপায়ে শিশুর ক্রমিকই আত্মশিক্ষা হয় কিন্তু স্বশিক্ষিত লোকদের যে সকল ভ্রমে পতিত হওয়া সম্ভব, কিণ্টার গার্টেন-ছাত্রেরা প্রদর্শিত পথে অজ্ঞাতসারে গমন করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পায়। খেলেনার মধ্যে চক্র ও বক্ররেখা যোগ করাতে সুন্দর আকৃতির সংখ্যা যে সমধিক বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই খেলেনা লইয়া কত যে বিচিত্র চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহা মুখে বলিয়া বুঝান অসম্ভব। এই শিক্ষা প্রণালী শিশুদের মনে সৌন্দর্য্য জ্ঞান যে কি চমৎকার রূপে পরিস্ফুট করে তাহা তাহাদের রচনা দেখিলে স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। শুদ্ধ যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান জন্মে এমত নহে, সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতাও তীব্র করিয়া তোলে ; তাহাতে, কি প্রাসাদ কি কুটীর, সর্ব্বত্রই সুখের ভাগ সমধিক বৃদ্ধি পায়। চক্রেতে এক শ্রেণীর খেলা শেষ হয়।

এ পর্য্যন্ত শিশুরা প্রস্তুত দ্রব্য লইয়া খেলিয়াছে, স্থানান্তর করা ভিন্ন সে গুলির আর কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, এ খেলেনাগুলি কিণ্টার গার্টেনের এক অংশ মাত্র। শিশুদের হস্তের নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া, কার্য্যে আসক্তি জন্মাইয়া দেওয়া, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সুনিয়মে নিয়মিত করা ইহার উদ্দেশ্য। ফ্রুবেল সর্ব্বদাই বলেন যে "জানার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবন, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য অতীব আবশ্যক।"

অন্য শ্রেণীর কার্য্যের প্রথম, বিনান। কাগজের সরু সরু লম্বা টুকরা দিয়া বিনানি শিখান হয়, ইহাতে পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা অভ্যাস পায়। শিশুদের চঞ্চল আঙ্গুলের এরূপ অভ্যাস পাওয়া বড় সহজ নহে। তাহার পরে বুনানি। ইহাও উক্ত রূপ কাগজের টুকরা দিয়া করা হয়, কতকগুলি কাগজের টুক্‌রা একটা ফ্রেমের উপর আবদ্ধ থাকে, অন্য কতকগুলি টুক্‌রা মিলাইয়া বোনা হয়। নানা রঙ্গের কাগজ দেওয়া হয়। আর যত দিন আপনারা বুনিতে না শিখে, তত দিন সম্মুখে একটি আদর্শ থাকে। সূচিকর্ম্ম অপেক্ষা এই কাজের অনেক গুলি সুবিধা আছে, সূচিকর্ম্মেতে যেমন, ইহাতেও তদ্রূপ হস্ত নৈপুণ্য জন্মে, ইহাতে নানা বর্ণ মিলিত হওয়াতে সূচিকর্ম্মের মত নীরস বোধ হয় না, আর শিশুরা ইহাতে চিত্রবিদ্যার একটু

আভাস পায়। কাগজ ভাঁজ করা ও কাগজ কাটা এই শ্রেণীর শিক্ষার শেষ। কাগজ কাটা শিশুর পক্ষে একটু কঠিন, সে এই প্রথম এমন একটি অস্ত্র হাতে পায় যাহা অতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা আবশ্যক। কাগজ ভাঁজ-করা কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সৌন্দর্য্যহীন, কিন্তু ইহা জ্যামিতি শিক্ষার বিলক্ষণ সহায়তা করে। এক খণ্ড কাগজে ভাঁজ দ্বারা অনেক প্রকার আয়তন, গঠন ও কোণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কতকগুলির সহিত শিশুরা পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত, এই হেতু নতুন গুলির নাম অনায়াসে মনে রাখিতে সক্ষম হয়। টেবিল, চৌকি প্রভৃতি পরিচিত বস্তুর নাম মনে রাখিতে শিশুরা যেমন কোন কষ্ট অনুভব করে না, সমকোণ ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে এ সমস্ত নাম মনে রাখাও তাদের পক্ষে তেমনই সহজ হয়। এই প্রণালীতে শিক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা গৃহ সজ্জার সামগ্রীতে সমকোণ সূক্ষ্ম কোণ, দিগন্ত-রেখা সকল কেমন নির্দ্দেশ করে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিশুদের কিয়ৎ পরিমাণে হস্ত নৈপুণ্য এবং চক্ষু ও স্পর্শের সূক্ষ্মতা জন্মিলে তাহারা চিত্রবিদ্যায় প্রথম পদক্ষেপ করে। ফ্রুবেল বলেন সকল শিক্ষিত ব্যক্তির কতকটা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহা না হইলে লোকে বাহ্যবস্তু তেমন ভালরূপে দেখিতে সক্ষম হয় না, আর যাহারা স্বভাবতঃ শিল্পজ্ঞানবিহীন, শিক্ষা দ্বারা তাহাদের সে অভাব কতক পরিমাণে দূর হইতে পারে। আর, তাঁর মতে লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বে আঁকিতে শেখা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা পদার্থ-চিত্রবিদ্যা, চিহ্ন ও কথা চিত্রবিদ্যার অগ্রগামী হওয়া উচিত। এ মতটি একটু অদ্ভুত বটে, ইহার কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে আসা উচিত, এ বিষয়ে যাঁরা তর্ক করিতে প্রস্তুত থাকেন করুন, কিন্তু এ অবশ্যি সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে চিত্র-বিদ্যার যেরূপ প্রাধান্য থাকা উচিত, তাহা অদ্যাপি হয় নাই, ইহাতে অভ্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও যথাযথ অনুকরণ যে সুন্দররূপে অভ্যাস পায় তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত লেখক বলেন, সুনিয়মে শিক্ষিত ও অভ্রান্ত ইন্দ্রিয় সকল অভ্রান্ত জ্ঞান ও তুলনায় আমাদিগকে উপনীত করে, আর ইহাতেই যথার্থ চিন্তার উপাদান প্রস্তুত হয়। বালকেরা বই পড়িয়া যে প্রায়ই চিন্তা করিতে শিখে না, তার কারণ এই যে উপস্থিত ভাব সকল তাহাদের মনকে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার ক'রিতে পারে না। কিণ্টার গার্টেনের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা অতি সামান্য রূপে আরম্ভ হয়। শিশুর ক্ষুদ্র আঙ্গুলগুলি পেন্‌সিল চালনা করিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে এক খণ্ড রেখা বিশিষ্ট কাগজ বা কোন আদর্শের উপর পিন ফুটাইয়া ফুটাইয়া কোন বস্তুর সীমান্তরেখা প্রস্তুত করে। ছিদ্র সকল সম আয়তন ও সমদূরবর্ত্তী করাই শিশুদের লক্ষ্য। এই উপায়ে আঙ্গুলগুলি পেন্সিল ধরিবার উপযোগী হইলে প্রথমে রেখা বিশিষ্ট শ্লেট, পরে কাগজ দেওয়া হয়। কাগজ সমচতুষ্কোণ রেখা বিশিষ্ট হওয়াতে শিশুরা অনেক প্রকার ভুল হইতে নিষ্কৃতি পায়। যতদিন শিশুদের চক্ষু ও হস্ত যথার্থ দিকে ও পরিমাণে বিশুদ্ধ রেখা আঁকিতে না শিখে, ততদিন তাহারা এই কাজে নিযুক্ত থাকে। এই কাজে কতক পরিমাণ কৃতকার্য্য হইলে আগে কাটি ও চক্র দ্বারা যে সকল জ্যামিতির রেখাচিত্র এবং সুষমাবিশিষ্ট আকৃতি তাহারা নির্ম্মাণ করিত, এখন কাগজের উপর তাহা আঁকিতে প্রবৃত্ত হয়। সীমান্ত রেখা চিত্রে চক্ষু ও হস্ত সম্পূর্ণরূপে

অভ্যস্ত হইলে তখন কোন বস্তুকে আদর্শ করিয়া আঁকিতে শিক্ষা করে। কিন্তু কিণ্টার গার্টেনে শিশুদিগকে প্রায়ই এতদূর অগ্রসর হইতে দেখা যায় না, কারণ কিণ্টার গার্টেনে শিক্ষার সীমা ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। কিণ্টার গার্টেনের কার্য্য প্রণালীর বর্ণনা করিতেই অনেকটা সময় চলিয়া গেল, ফ্রুবেলের মত সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিতে পারিব না, তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, এখন তবে বিদায় হই।"

শ্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী[৩৮]

ভারতী, চৈত্র ১২৮৮

টীকা

১. **Leopardi, Giacomo** : 1798-1837, Italian poet and scholar. Devoted to the study of the classics and philosophy from early childhood, although plagued by illness and physical and spiritual frustration, Leopardi became one of the most formidable linguists, thinkers, and writers of his time. His pessimistic view of the world became increasingly uncompromising. His *Canti* [songs] (1816-37) represent the flowering of his poetry, which rests on a tension between past and present, innocence and rational consciousness. He spoke with romantic yearning for physical and spiritual oneness, even as he pointed to the unbridgeable gulf that separated people from one another and from salvation. Leopardi was a liberal and agnostic at a time when independence of thought was dangerous in Italy. Many of his works were deeply patriotic and contemptuous of the Italian rulers of his day. He wrote political and social satire in the ironic dialogues entitled *Operette Morali* (1826-27, tr. *Essays, Dialogues, and Thoughts,* 1893 and 1905). A complete edition of his works was issued in 1845 by his friend Antonio Ranieri. Leopardi is considered Italy's outstanding 19th-century poet.

২. **Steele, Sir Richard** : 1672-1729, English essayist and playwright, b. Dublin, after studying at Charterhouse and Oxford, he entered the army in 1694 and rose to the rank of Captain by 1700. His first book, a moral tract entitled *The Christian Hero,* appeared in 1701. The same year saw a production of his first play, *The Funeral,* a sentimental comedy, which he followed with two more comedies, *The Lying Lover* (1703) and *The Tender Husband* (1705). In 1722 he produced his last and most important play, *The Conscious Lovers*. He held several minor government positions before beginning his famous periodical, the *Tatler* (1709-11). This was followed by *Spectator* (1711-12), the *Guardian* (1713), and later periodicals of lesser importance. The partnership of Steele and Addison was one of the most successful in the history of English letters. Although Steele's prose lacks the polished grace of Addison's, his writings reflects his charm, spontaneity, wit and imagination.

Addison, Joseph : 1672-1719, English essayist, poet and statesman. He was educated at Charterhouse, where he was a classmate of Richard Steele, and at Oxford, where he became a distinguished classical scholar. His travels on the Continent from 1699 to 1703 were recorded in *Remarks on Italy* (1705). Addison first achieved prominence with *The Campaign* (1704), an epic celebrating the victory of Marlborough at Blenheim. The poem was commissioned by Lord Halifax, and its great success resulted in Addison's appointment in 1705 as under-secretary of state and in 1709 as secretary to the lord lieutenant of Ireland. He also held a seat in Parliament from 1708 until his death. Addison's most enduring fame was achieved as an essayist. In 1710 he began his contributions to the *Tatler*, which Richard Steele had founded in 1709. He continued to-write for successive publications, including the *Spectator* (1711-12), the *Guardian* (1713) and the new *Spectator* (1714). His contributions to these periodicals raised the English essay to a degree of technical perfection never before achieved. In a prose style marked by simplicity, order, and precision, he sought to engage men's thoughts toward reason, moderation, and a harmonious life. His works also include an opera libretto, *Rosamund* (1707): a prose comedy, *The Drummer* (1713), which had an immense success in its own time, but has since been regarded as artificial and sententious

[সর্বজনপরিচিতির কারণে আলেকজাণ্ডার পোপ এবং জনাথান স্যুইফটের জীবনী আলাদাভাবে দেওয়া হল না।]

৩. **Besant, Annie** : 1847-1933, English social reformer and theosophist, b. Annie Wood. She steadily grew away from Christianity and in 1873 separated from her husband, a Protestant clergyman. In 1879 the courts deprived her of her children because of her atheism and alleged unconventionality. As a member of the National Secular Society she preached free socialism. With Charles Bradlaugh she edited the *National Reformer* and with him reprinted an old pamphlet on birth control, *The Fruits of Philosophy*, for which they were tried (1877) on a charge of immorality and acquitted. In 1889 she embraced theosophy, becoming a disciple of Mme Blavatsky and, later, her biographer. She pursued her mission to India, where she soon became involved in nationalist politics. She founded the Central Hindu College at Benares (Varanasi) in 1898 and in 1916 established the Indian Home Rule League and became its president. She was president of the Indian National Congress in 1917, but later split with Gandhi. She travelled (1926-27) in England and the United States with her protege Jiddu Krishnamurti, whom she announced as the new Messiah. President of the Theosophical Society from 1907, she wrote an enormous number of books and pamphlets on theosophy. Her works include her autobiography (1893), *Four Great Religions* (1897), *The Ancient Wisdom* (1897), and a translation of the *Bhagavad Gita* (1905).

Garrett Fawcett, Millicent, the daughter Newson Garrett and Louise Dunnell, was born in Aldeburgh, Suffolk in 1847. Elizabeth's father had originally ran a pawnbroker's shop in London, but by the time she was born he owned a corn and coal warehouse in Aldeburgh. The business was a great success and by the 1850s Garrett could afford to send his children away to be educated.

When Millicent was twelve years old, her older sister, Elizabeth Garrett, moved to London in an attempt to qualify as a doctor. Millicent's visits to London to stay with Elizabeth and her other sister, Louise, brought her into contact with people with radical political views. In 1865 Louise took Millicent to hear a speech on women's rights made by the Radical MP, John Stuart Mill. Millicent was deeply impressed by Mill and became one of his many loyal supporters. John Stuart Mill introduced Millicent to other campaigners for women's rights. This included Henry Fawcett, the Radical MP for Brighton. Fawcett, who had been blinded in a shooting accident in 1857, had been expected to marry Millicent's older sister Elizabeth Garrett, but in 1865 she decided to concentrate of her attempts to become a doctor. Henry and Millicent became close friends and even though she was warned against marrying a disabled man, fourteen years her senior, the couple was married in 1867.

At first Millicent wrote articles for journals but later books such as *Political Economy for Beginners* and *Essays and Lectures on Political Subjects* were published.

Millicent Fawcett joined the London Suffrage Committee in 1868. Although only a moderate public speaker, Millicent was a superb organiser and by the early 1880s she had emerged as one of the leaders of the suffrage movement.

Millicent also took a keen interest in women's education. She was involved in the organisation of women's lectures at Cambridge that led to the establishment of Newnham College. Millicent's only child, Philippa, went to Newnham, where she was placed first in the mathematical tripos.

In 1890, she was elected president of the National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS).

Millicent Fawcett believed that it was important that the NUWSS campaigned for a wide variety of causes. This included helping Josephine Butler (1828-1906) in her campaign against the white slave traffic. Fawcett also gave support to Clementina Black (1854-1922) and her attempts to persuade the government to help protect low paid women workers.

Although Millicent Fawcett had always been a Liberal, she became increasing angry at the party's unwillingness to give full support to women's suffrage.

Two days after the British government declared war on Germany on 4th August 1914, the NUWSS declared that it was suspending all political activity until the conflict was over. Although Fawcett supported the First World War effort she did not follow the WSPU (Women's Social and Political Union) strategy of becoming involved in persuading young men to join the armed forces.
After the war Millicent concentrated on writing books such as *The Women's Victory* (1920), *What I Remember* (1924) and *Josephine Butler* (1927). Millicent Fawcett died in 1929.

Hill, Octavia : (1838-1912), Housing reformer. With help from friends, notably John Ruskin, in 1865 she began to acquire dilapidated houses in London for rehabilitation and letting to the poor. Octavia Hill was born at Wisbech on 3 December 1838, the eighth daughter of James Hill, corn merchant and banker. Her mother was Caroline Southwood Smith, daughter of Dr. Thomas Southwood Smith, well known as an authority on fever epidemics and sanitation. Octavia, who was an energetic, determined, and affectionate child with much artistic talent, began work in London about 1852 at the Ladies' Guild, a co-operative association promoted by the Christian Socialists, of which her mother became manager. She was soon put in charge of a branch engaged in teaching poor school-children to make toys, and thus gained her first experience of the lives of the very poor. At this time she naturally came under the influence of John Ruskin, whom she first met in 1853, and by whom she was greatly helped in her artistic training. For some years she employed much of her spare time in copying pictures for his Modern Painters, for the Society of Antiquaries, and for the National Portrait Gallery. In 1856 Octavia Hill became secretary to the classes for women at the Working Men's College in Great Ormond Street, and a few years later she and her sisters started a school at 14 Nottingham Place. It was while living here and visiting her poorer neighbours that Miss Hill first became deeply impressed with the urgency of the housing problem, and succeeded (1864) in interesting Ruskin in her schemes for improving the dwellings of the poor.
In 1874 a group of friends raised a fund which freed Miss Hill for the future from the necessity of earning money, and left her at liberty to devote herself to housing reform. Octavia Hill's influence, though centred in housing reform, was far from being limited to it. She was an active supporter of the work of the Charity Organization Society from its first beginnings. But her faith lay much more in the value of voluntary work, and it was with reluctance that she took part in political measures. It was an exception to this when, in 1873, she co-operated with the Charity Organization Society in active propaganda which resulted in Mr. (afterwards Viscount) Cross's Artisans' Dwellings Act (1875). But she refused to join the royal commission on housing (1889), and though she was induced to become a member of the royal commission on the poor laws (1905), she had little expectation of useful results.
No account of Octavia Hill would be complete without reference to the constant co-operation and assistance of her sisters. Of these Miranda, who lived with her, died in 1910 : and Octavia did not survive her long. She died in her house, 190 Marylebone Road, 13 August, 1912, having made very complete arrangements for her work to be carried on.

8. **Bluestocking** : derisive term originally applied to certain 18th-century women with pronounced literary interests. During the 1750s, Elizabeth Vesey held evening parties, at which the entertainment consisted of conversation on literary subjects. Eminent men of the day were invited to contribute to these conversations. Hannah More, Elizabeth Montagu, and Elizabeth Carter, among others, continued this tradition. Boswell, in his *Life of Dr. Johnson*, states that these "bluestocking clubs" were so named because of Benjamin Stillingfleet, who attended in unconventional blue worsted stockings rather than the customary black silk stockings. In time the name

bluestocking was applied solely to women of pedantic literary tastes.

৫. **দয়ানন্দ সরস্বতী** : কাথিয়াওয়াড় প্রদেশের মোরভি শহরে শৈবধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণবংশে ১৮২৭ সালে জন্মলাভ করেন। যৌবনে গৃহত্যাগ করে বারাণসী যান এবং নর্মদা নদীতীরে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'দয়ানন্দ সরস্বতী' নাম নেন। প্রথমে তিনি সমস্ত বেদকেই ঈশ্বরবাক্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকালে কেবল মন্ত্রাংশকেই ঈশ্বরবাক্য বলে বিশ্বাস করতেন। দয়ানন্দ আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কতকাংশে ধর্মসংস্কারকও ছিলেন। পরবর্তীকালে বৈদিকধর্মের যে অপপ্রয়োগ ঘটেছিল তার প্রতিকারে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর 'ঋগ্বেদভাষ্য' ও 'সত্যার্থপ্রকাশ' গ্রন্থদ্বয় সুপরিচিত। ১৮৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর আজমীরে তাঁর দেহাবসান হয়।

৬. **Cornelia** : fl. 2d cent. BC, Roman matron, daughter of Scipio Africanus Major. She was the wife of Tiberius Sempronius Gracchus and mother of the Gracchi. She refused to remarry after her husband's death, devoting herself to her children, whom she educated well and inspired with a sense of civic duty and a desire for glory. When a wealthy patrician woman spoke of her jewels, Cornelia pointed to her two sons, saying, "These are my jewels!" Whether she supported the revolutionary tendencies of her sons or tempered them is debated by historians.

৭. **Caligula** : AD 12-AD 41, Roman emperor (AD 37-AD 41); son of Germanicus Caesar and Agrippina the Elder. His real name was Caius Caesar Germanicus. As a small clild he wore military boots, whence his nickname [*caligula*=little boot]. On the death of Tiberius the army helped make Caligula emperor. Shortly afterward he became severely ill; it is widely believed that he was thereafter insane. He earned a reputation for ruthless and cruel autocracy, and torture and execution became the order of the day. He was responsible for serious disturbances among the Jews, and he nearly caused a rebellion in Palestine by attempting to erect a statue of himself in their temple. He was assassinated by a tribune of the Praetorian Guard and succeeded by Claudius I.

৮. **Tiberius** : (Tiberius Julius Caesar Augustus), 42 BC-AD 37, second Roman emperor (AD 14-AD 37). He was the son of Tiberius Claudius Nero and Livia Drusilla and was originally named Tiberius Claudius Nero. He campaigned (20 BC) in Armenia, became (19 BC) governor of Transalpine Gaul, and aided (12 BC) his brother Drusus on the Rhine and the Danube. Augustus, his stepfather, compelled him (12 BC) to divorce his wife, Vipsania Agrippina, and to marry Julia, the widow of Agrippa and daughter of Augustus. After the death of Drusus (9 BC) he campaigned in Germany, and following a second consulship (7 BC) he retired to Rhodes for seven years. On his return he was adopted as heir of the emperor and was sent (AD 4) into Germany. Five years later he subjugated Illyricum. Tiberius succeeded without difficulty on the death of Augustus in AD 14. He spent his efforts in continuing the policies of Augustus, with one exception; he drastically cut luxury expenses, including public shows. By so doing and by reforming the tax situation in the provinces he greatly improved the financial state of the government and made himself extremely unpopular in Rome. For years Sejanus was his chief aid and confidant. Tiberius retired to Capri in AD 26 and ruled thereafter by correspondence. He grew suspicious of intrigues and in AD 31 had Sejanus killed. Modern historians have been inclined to treat his administration more favourably than did Roman historians. He was succeeded by Caligula.

৯. **দ্বারকানাথ মিত্র** : ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা হুগলী আদালতে মোক্তারি করতেন। হুগলী কলেজ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পর ১৮৫৫ সালে ইনি কলকাতার অন্যতর ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষীর পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সদর দেওয়ানি আদালতে ইনি উকিল হিসেবে প্রবেশ

করেন। ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তিনি এই আদালতে আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৮৬৭ সালের জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুজনিত শূন্য বিচারাসন অধিকার করেন। ৭ বছর হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালের ২ মার্চ তিনি মারা যান।

১০. **Froebel, Friedrich Wilhelm August** : 1782-1852, German educator and founder of the kindergarten system. He had an unhappy childhood and very little formal schooling, learning what he could from wide reading and close observation of nature; he studied for a short time at the Univ. of Jena. He was studying architecture at Frankfurt (1805) when he was persuaded by the master of the model school at Frankfurt to become a teacher. He visited Johann Heinrioh Pestalozzi at Yverdon-les-Bains, Switzerland, and then returned to Germany to study at the universities of Göttingen and Berlin. In 1813 he joined Lützow's free corps and saw active service in the Napoleonic Wars. While serving in the army he met Heinrich Langethal and Wilhelm Middendorff, with whom he was associated throughout the rest of his career. He returned to the Univ. of Berlin in 1814 and was given a position in the school's mineralogical museum. In 1816 he founded at Griesheim, a school (later moved to Keilhau) called the Universal German Educational Institute where other teachers came to study his methods. Early in 1837 he went to Bad Blankenburg (near Keilhau), where he opened the first kindergarten. In 1849 he founded a kindergarten training school at Liebenstein. However, Froebel was unable to control constant disputes among his subordinates, and after a group of former associates accused him of propagating treason, the government issued an edict (1851) forbidding the establishment of kindergartens. The measure was repealed in 1860. Froebel was influenced greatly by the philosophy of Johann Gottlieb Fichte and Friedrich Wilhelm Schelling. His theories of education are based on a belief in the divine unity of nature, so that spiritual training is a fundamental principle. Froebel stressed the importance of pleasant surroundings, self-activity, and physical training in the development of the child. His most important work is *Menschenerziehung* (1826; tr. *The Education of Man*, 1877). The translation by Susan Blow of his *Mutter-und Kose-Lieder* (1844) is called *Mother Play* (1895). Other works translated into English are *Letters on the Kindergarten* (1891), *Froebel's Chief Writings on Education* (1912), and his fragmentary autobiography. His name is also written Fröbel.

১১. **Rousseau, Jean Jacques** : Rousseau was born at Geneva, the son of a watchmaker. His mother died shortly after his birth, and his upbringing was haphazard. At 16 he set out on a wandering, irregular life that brought him into contact (c.1728) with Louise de Warens, who became his patron and later his lover. She arranged for his trip to Turin, where he became an unenthusiastic Roman Catholic convert. After serving as a footman in a powerful family, he left Turin and spent most of the next dozen years at Chambéry, Savoy, with his patron. In 1742 he went to Paris to make his fortune with a new system of musical notation, but the venture failed. Once in Paris, however, he became an intimate of the circle of Denis Diderot (to whose *Encyclopédie* Rousseau contributed music articles), Melchior Grimm, and Mme d'Épinay. At this time also began his liaison with Thérèse le Vasseur, a semiliterate servant who became his common-law wife.

In 1749, Rousseau won first prize in a contest, held by the Academy of Dijon, on the question: "Has the progress of the sciences and arts contributed to the corruption or to the improvement of human conduct?" Rousseau took the negative stand, contending that humanity was good by nature and had been fully corrupted by civilization. His essay made him both famous and controversial. Although it is still widely believed that all of Rousseau's philosophy was based on his call for a return to nature, this view is an oversimplification, caused by the excessive importance attached to this first essay. A second philosophical essay, *Discours sur l'origine de*

l'inégalité des hommes (1754), is one of Rousseau's most mature and daring productions. After its publication, Rousseau returned to Geneva, reverted to Protestantism in order to regain his citizenship, and returned to Paris with the title "citizen of Geneva."

Mme d'Épinay lent him a cottage, the Hermitage, on her estate at Montmorency. But Rousseau began to quarrel with Mme d'Épinay, Diderot, and Grimm, all of whom he accused of complicity in a sordid plot against him, and left the Hermitage to become the guest of the tolerant duc de Luxembourg, whose château was also at Montmorency. There he finished his nóvel, *Julie, ou La Nouvelle Héloïse* (1761), written in part under the influence of his love for Mme d'Houdetot, the sister-in-law of Mme d'Épinay; his *Lettre à d'Alembert sur les spectacles* (1758), a diatribe against the suggestion that Geneva would be better off for having a theater; his *Du contrat social* (1762); and his *Émile* (1762), which offended both the French and Genevan ecclesiastic authorities and was burned at Paris and at Geneva.

Rousseau, with the connivance of highly placed friends, escaped, however, to the Swiss canton of Neuchâtel, then a Prussian possession. His house was stoned, and Rousseau fled once more, this time to the canton of Bern, settling on the small island of Saint-Pierre, in the Lake of Biel. In 1765 he was expelled from Bern and accepted the invitation of David Hume to live at his house in England; there he began to write the first part of his *Confessions*, but after a year he quarreled violently with Hume, whom he believed to be in league with Diderot and Grimm, and returned to France (1767). His suspicion of people deepened and became a persecution mania.

After wandering through the provinces, he finally settled (1770) at Paris, where he lived in a garret and copied music. The French authorities left him undisturbed, while curious foreigners flocked to see the famous man and be insulted by him. At the same time he went from salon to salon, reading his *Confessions* aloud. In his last years he began *Rêveries du promeneur solitaire*, descriptions of nature and his feeling about it, which was unfinished at the time of his death. Shortly before his death Rousseau moved to the house of a protector at Ermenouville, near Paris, where he died. In 1794 his remains were transferred to the Panthéon in Paris.

Pestalozzi, Johann Heinrich : 1746-1827, Swiss educational reformer, b. Zürich. His theories laid the foundation of modern elementary education. He studied theology at the Univ. of Zürich but was forced to abandon his career because of his political activity on behalf of the Helvetic Society, a reformist Swiss political organization. From 1769 to 1798 he lived at his farm "Neuhof" near Zürich, where he conducted a school for poor children. He then directed a school at Burgdorf (1799-1804), and from 1805 until his retirement (1825) to "Neuhof" he was director of the experimental institute at Yverdon-les-Bains, which was established on Pestalozzian principles. Pestalozzi's theory of education is based on the importance of a pedagogical method that corresponds to the natural order of individual development and of concrete experiences. To Pestalozzi the individuality of each child is paramount: it is something that has to be cultivated actively through education. He opposed the prevailing system of memorization learning and strict discipline and sought to replace it with a system based on love and an understanding of the child's world. His belief that education should be based on concrete experience led him to pioneer in the use of tactile objects, such as plants and mineral specimens, in the teaching of natural science to youngsters. Running through much of Pestalozzi's writing is the idea that education should be moral as well as intellectual. Never losing his commitment to social reform, Pestalozzi often reiterated the belief that society could be changed by education. His theories also influenced the development of teacher-training methods. Although he respected the individuality of the teacher, Pestalozzi nevertheless felt that there was a unified science of education that could be learned and practiced. His belief that teacher-training should consist of a broad liberal education followed by a period of research and professional training has been widely adopted throughout

Europe and the United States. Pestalozzi's writings in English translation include *The Hours of a Hermit* (1780, tr. 1912), *Leonard and Gertrude* (4 parts, 1781-87; rev. ed. 1790-92, 1819-20; tr. 1801, 1894), and *How Gertrude Teaches Her Children* (1801, tr. 1915).

১২. **Comte, Auguste** : 1798-1857, French philosopher, founder of the school of philosophy known as positivism, educated in Paris. From 1818 to 1824 he contributed to the publications of Saint-Simon, and the direction of much of Comte's future work may be attributed to this association. Comte was primarily a social reformer. His goal was a society in which individuals and nations could live in harmony and comfort. His system for achieving such a society is presented in his *Cours de philosophy positive* (1830-42; tr. *The Course of Positive Philosophy*, 1896 ed.). In this work Comte analyzes the relation of social evolution and the stages of science. He sees the intellectual development of man covered by what is called the Law of the Three Stages–theological, in which events were largely attributed to supernatural forces; metaphysical, in which natural phenomena are thought to result from fundamental energies or ideas; and positive, in which phenomena are explained by observation, hypotheses, and experimentation. The sciences themselves are classified on the basis of increasing complexity and decreasing generality of application in the ascending order: mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology, and sociology. Each science depends at least in part on the science preceding it; hence all contribute to sociology (a term that Comte himself originated). The sociology developed by the methods of positivism could achieve the ends of harmony and well-being which Comte desired Another work, *Le Système de politique positive* (1851-54; tr. *System of Positive Polity*, 1875-77), placed religion above sociology as the highest science; it was, however, a religion shorn of metaphysical implications, with humanity as the object of worship. For a modern edition of part of this work see *A General View of Positivism* (1957). Important among his other writings are *Catechisme positiviste* (1852, tr. 1858) and *Synthèse subjective* (1856). Published posthumously were his *Testament* (1884) and his letters (1902-05).

১৩. বঙ্গমহিলা সমাজ : বঙ্গমহিলাদের জ্ঞান, নীতি ও ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গমহিলা সমাজ গঠিত হয়। ১৮৮২ সালের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে একশোর বেশি মহিলা এতে যোগদান করেন। সম্পাদিকা সুবর্ণপ্রভা বসু সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। ১৮৮৩'র ৪ আগস্ট সিটি কলেজে প্রতিষ্ঠাদিবসে যে উৎসব হয় তাতে সংগীত, প্রার্থনা, রিপোর্ট পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অল্পবয়স্ক পাঠকদের জন্য সভা যেসব বই প্রকাশ করে তার মধ্যে 'সরল নীতিপাঠ' উল্লেখযোগ্য। ভাদ্র ১২৯২ থেকে শিশুদের সুনীতি ও ধর্মাচরণ শিক্ষা দেবার জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় খোলা হয়। ১৮৮৬-এর সপ্তম বাৎসরিক উৎসবে ফাদার লাফোঁ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছায়াবাজি এবং জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যুতালোকের মাধ্যমে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৮৯০ নাগাদ বঙ্গমহিলা সমাজের অবলুপ্তি ঘটে।

১৪. 'স্ত্রীলোকের কাজ' নামে কৃষ্ণভাবিনীর কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'ভারতী ও বালক' সাময়িকপত্রে "স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমান সংকলনগ্রন্থে সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫. **Marshall, Clara** : 1847-1931, physician and educator, born in West Chester, Pennsylvania, on May 8, 1847, Clara Marshall was of a prominent Quaker family. At the age of 24, after having taught at a school for a time, she enrolled in the Woman's Medical College of Pennsylvania. On graduating in 1875 she was appointed a demonstrator in materia medica (drugs or medical remedies) and practical pharmacy in the college, and in the same year she became the first woman admitted to the Philadelphia College of Pharmacy. After a year of study there, during which her

academic standing earned her the honour of arranging the pharmaceutical display at the Centennial Exposition of 1876. Marshall returned to the Woman's Medical College as professor of materia medica and therapeutics. She retained that post until 1905. In 1882 she served also as demonstrator in obstetrics at the Philadelphia Hospital; she was the first woman on the staff of that institution. From 1886 she was attending physician to the girls' department of the Philadelphia House of Refuge. In 1888 Marshall was named dean of the Woman's Medical College. Under her leadership the course and facilities of the school were greatly expanded and improved. The course was lengthened from three to four years in 1893, and from 1896 instruction and laboratory work in the new field of bacteriology and related subjects were added. To supply critical clinical experience. Marshall determined to open a hospital directly associated with the college.

The small Pavilion Hospital opened in 1904. A larger hospital in permanent quarters was completed in 1913. The success of Marshall's work to keep the school's standards up to the demands of modern scientific training was reflected in the laudatory comments of Abraham Flexner on the school in his influential and often scathing report, *Medical Education* (1910) After 1905 Marshall gave up teaching in order to devote more time to private practice. She retired as dean in 1917 and resigned her emeritus professorship in 1923 Marshall died in Bryn Mawr, Pennsylvania, on March 13, 1931.

[স্ট্যাকহাউস্ ও উইনেটস্-এর জীবনী আমরা পাইনি।]

১৬. **Girton College** : In 1866 Miss Emily Davies and others interested in the higher education of Women initiated a scheme for founding by public subscription a college for women 'designed to hold in relation to girls' schools and home teaching, a position analogous to that occupied by the Universities towards the public schools for boys'. On 16 October, 1869, the College was opened at Benslow House, Hitchin, under the name of the College for Women. In 1872 the present site was purchased, and the College was renamed Girton College, the removal to the new buildings took place in October 1873.

For reasons of Victorian respectibility, the College was located two miles north of the town centre to discourge marauding male undergraduates! It was originally seen as a Victorian country house, and the large size of the grounds relative to the other Colleges has allowed plenty of room for expansion since.

In 1872 an Association was formed 'to erect, maintain and conduct a College for the higher education of women' ; and 'to take such steps as from time to time may be thought most expedient and effectual to obtain for the students of the College admission to examinations for degrees of the University of Cambridge, and generally to place the College in connection with that University'. By a number of Graces of the Senate and changes of the University statutes, members of the College were admitted to an increasing number of privileges of members of the University until under Statutes approved by the Regent House on 6 December, 1947, and by H. M. the King in Council on 27 April, 1948, women were admitted to full membership of the University of Cambridge, and Girton College received the status of a College of the University.

১৭. ***Newnham College*** *: Newnham began in a house for five students in Regent Street*

in Cambridge in 1871. Lecture for Ladies had been started in Cambridge in 1870 and such was the demand from those who could not travel in and out on a daily basis, that the philosopher Henry Sidgwick (1838-1900), one of the organisers of the lectures, risked renting a house in which young women attending the lectures could reside. He persuaded Anne Jemima Clough (1820-92), who had previously run a school in the Lake District, to take charge of this house. Demand continued to increase and the supporters of the enterprise formed a limited company to raise funds, lease land and build a purpose-built building on it. Newnham Hall opened its doors in 1875, the first building on the site where Newnham still remains. The demand from prospective students remained buoyant and the Newnham Hall Company built steadily, providing three more Halls, a Laboratory and a Library, in the years up to the first world war. The same architect, Basil Champneys, was employed throughout and this has given the main college buildings an extraordinary unity. The early senior members also included some passionate gardeners and the buildings are grouped round a beautiful garden which many visitors to Cambridge never discover.

১৮. **Oliphant, Margaret Oliphant (Wilson)** 1828-97, Scottish author. She was widowed at the age of 31 and subsequently supported her own three children and her brother and his family. Astonishingly prolific, she wrote many novels, including a series about life in a Scottish village called *Chronicles of Carlingford* (1863-76); the best novels in the series were *Salem Chapel* and *Miss Marjori Banks*. She wrote guidebooks; semihistorical works, such as *The Makers of Modern Rome* (1895); and biographies of Sheridan (1883) and her cousin Laurence Oliphant (1891), among others.

Braddon, Mary Elizabeth : 1835-1915, One of the most successful of the Victorian sensation novelists, she wrote over 80 novels and nine plays during her 55-year career. In addition, she produced a huge number of articles and short stories, as well as editing *Belgravia* magazine. By the late 1880s her publishers were able to boast that she had "43 novels always in print".

Braddon was an actress for several years before giving up her stage career in 1860 to become a full-time writer. Her first novel, *Three Times Dead* (1861) was a sensational tale written in the style of Dickens. Reprinted as *The Trail of the Serpent*, it sold well, but real success came with her 1862 bestseller *Lady Audley's Secret*. The book was an immediate success, running to nine editions in the first three months after its publication in serial form and laying the foundation for Braddon's highly successful career. She followed it with the equally successful *Aurora Floyd* (1863), and regularly produced novels virtually every yeai for the rest of her life. Between 1861 and 1871 she wrote over 20 novels, prompting *The Mask* to caricature her as a circus performer jumping through multiple hoops, each hoop bearing the name of one of her novels.

In 1874 Braddon married John Maxwell, her publisher, with whom she had been living for many years.

As her career progressed, Braddon wrote in a variety of genres. *Eleanor's Victory* (1863) features one of fiction's earliest female detectives. *The Doctor's Wife* (1864) was an English adaptation of Flaubert's *Madame Bovary*. *Under the Red Flag* (1883) is a historical novel set in the Paris Commune. *Gerard, or The World, the Flesh and the Devil* (1891) is a nineteenth-century reworking of the Faust story. *Rough Justice* (1898) and *His Darling Sin*(1899) are detective stories, written during the 1890s detective fiction boom. *The Rose of Life* (1905) is a novel of character, loosely based on the downfall of Oscar Wilde, who Braddon knew personally.

Braddon's work translated to other media: before her death in 1915 she watched a film version of *Aurora Floyd*.

১৯. **Eliot, George** : pseud. of Mary Ann or Marian Evans, 1819-80, English novelist, b. Arbury, Warwickshire. One of the great English novelists, she was reared in a strict

atmosphere of evangelical Protestantism but eventually rebelled and renounced organized religion totally. Her early schooling was supplemented by assiduous reading, and the study of languages led to her first literary work, *Life of Jesus* (1846), a translation from the German of D. F. Strauss . After her father's death she became subeditor (1851) of the *Westminster Review*, contributed articles, and came to know many of the literary people of the day. In 1854 she began a long and happy union with G. H. Lewes , which she regarded as marriage, though it involved social ostracism and could have no legal sanction because Lewes's estranged wife was living. Throughout his life Lewes encouraged Evans in her literary career; indeed, it is possible that without him Evans, subject to periods of depression and in constant need of reassurance, would not have written a word. In 1856, Mary Ann began *Scenes of Clerical Life*, a series of realistic sketches first appearing in *Blackwood's Magazine* under the pseudonym Lewes chose for her, George Eliot. Although not a popular success, the work was well received by literary critics, particularly Dickens and Thackeray. Three novels of provincial life followed—*Adam Bede* (1859), *The Mill on the Floss* (1860), and *Silas Marner* (1861). She visited Italy in 1860 and again in 1861 before she brought out in the *Cornhill Magazine* (1862-63) her historical romance *Romola*, a story of Savonarola. *Felix Holt* (1866), a political novel, was followed by *The Spanish Gypsy* (1868), a dramatic poem. *Middlemarch* (1871-72), a portrait of life in a provincial town, is considered her masterpiece. She wrote one more novel, *Daniel Deronda* (1876); the satirical *Impressions of Theophrastus Such* (1879); and verse, which was never popular and is now seldom read. Lewes died in 1878, and in 1880 she married a close friend of both Lewes and herself, John W. Cross, who later edited *George Eliot's Life as Related in Her Letters and Journals* (3 vol., 1885-86). Writing about life in small rural towns, George Eliot was primarily concerned with the responsibility that people assume for their lives and with the moral choices they must inevitably make. Although highly serious, her novels are marked by compassion and a subtle humour.

Austen, Jane : 1775-1817, English novelist. The daughter of a clergyman, she spent the first 25 years of her life at "Steventon," her father's Hampshire vicarage. Here her first novels, *Pride and Prejudice*, *Sense and Sensibility*, and *Northanger Abbey*, were written, although they were not published until much later. On her father's retirement in 1801, the family moved to Bath for several years and then to Southampton, settling finally at Chawton Cottage, near Alton, Hampshire, which was Jane's home for the rest of her life. *Northanger Abbey*, a satire on the Gothic romance, was sold to a publisher for £10 in 1803, but as it was not published, was bought back by members of the family and was finally issued posthumously. The novels published in Austen's lifetime were *Sense and Sensibility* (1811), *Pride and Prejudice* (1813), *Mansfield Park* (1814), and *Emma* (1816). *Persuasion* was issued in1818 with *Northanger Abbey*. The author's name did not appear on any of her title pages, and although her own friends knew of her authorship, she received little public recognition in her lifetime.

Jane Austen's novels are comedies of manners that depict the self-contained world of provincial ladies and gentlemen. Most of her works revolve around the delicate business of providing husbands for marriageable daughters. She is particularly noted for her vivid delineations and lively interplay of character, her superb sense of comic irony, and her moral firmness. She ridicules the silly, the affected, and the stupid, ranging in her satire from light portraiture in her early works to more scornful exposures in her later novels. Her writing was subjected to the most careful polishing. She was quite aware of her special excellences and limitations, comparing herself to a miniaturist. Today she is regarded as one of the great masters of the English novel. Her minor works include her *Juvenilia*, the novel *Lady Susan*, and the fragments *The Watsons and Sanditon*.

Craik, Dinah Maria : 1826-87, English novelist, better known as the author of *John Halifax, Gentleman*, was born on the 20th of April 1826 at Stoke-upon Trent, in Staffordshire, where her father was the minister of a small congregation. She settled in London about 1846, determined to obtain a livelihood by her pen, and, beginning with fiction for children, advanced steadily until *John Halifax, Gentleman* (1857), placed her in the front rank of the women novelists of her day. *A Life for a Life* (1859), though inferior, maintained a high position, but she afterwards wrote little of importance except some very charming tales for children. Her most remarkable novels, after those mentioned above, were *Olive* (1850), *The Head of the Family* (1851), *Agatha's Husband* (1853). There is much passion and power in these early works, and all that Mrs Craik wrote was characterized by high principle and deep feeling. Some of the short stories in *Avillion and Other Tales* also exhibit a fine imagination. She published some poems distinguished by genuine lyrical spirit, narratives of tours in Ireland and Cornwall, and *A Woman's Thoughts about Women*. She married Mr G. L. Craik, a partner in the house of Macmillan & Company, in 1864, and died at Shortlands, near Bromley, Kent, on the 12th of October 1887.

[মিস ব্রন্ট বলতে কৃষ্ণভাবিনী শার্লট বা এমিলি কার কথা বলছেন বুঝতে না পারায় এঁদের দুজনের কারোরই জীবনী আমরা এখানে দিলাম না।]

২০. **Harrow** : The School was founded in 1572 under the Royal Charter granted by Elizabeth I to John Lyon, a local farmer. His new School House was completed in 1615 and his School, beginning with one recorded pupil, settled into its gradual, if not uninterrupted, growth towards fame.

By the beginning of the nineteenth century Joseph Drury could count among his pupils a quartet of future Prime Ministers. Later in the century two remarkable Head Masters, Charles Vaughan (disciple of Thomas Arnold) and H.M. Butler, brought to the School the far-reaching developments of Victorian education.

No great institution can simply rest on its history, and, particularly in the last 20 years, there has been significant modernisation and, thanks to the continuing generosity of our benefactors, much notable building.

Pupils have come from all over the world, and there is no 'typical Harrovian'. A favourite School Song celebrates the fact that "the range of Harrow" is a broad one: "Welcome poet and statesman too..," A list of famous Old Harrovians might indeed name many statesmen, including Peel, Palmerston, Churchill, Pandit Nehru and King Hussein of Jordan; poets and writers as diverse as Byron, Sheridan, Trollope, Dornford, Yates and Richard Curtis; Lord Rayleigh, the physicist and Nobel prize-winner; Fox-Talbot, the inventor of photography; the archaeologist Sir Arthur Evans and Bruce the explorer; Sir William Jones, father of philology; Admiral Rodney and Field Marshal Alexander; and nineteen winners of the Victoria Cross.

Eton : town (1991 pop. 3,559), Windsor and Maidenhead, central England, on the Thames River. It is known chiefly for Eton College, largest and most famous of the English public schools, founded with King's College, Cambridge Univ., by King Henry VI in 1440. Some of the buildings (chapel, lower school, cloisters) date back to the 15th cent. Eton is unlike other English public schools in that it does not have a prefect system. At Eton senior students have a larger voice in the selection of student leaders. Another distinctive feature at Eton is the tutorial system, by which each student has a personal tutor. Many of England's most notable men were schooled at Eton It maintains a close alliance with King's College, Cambridge; scholarships are offered between the institutions. The annual cricket match between Eton and Harrow attracts much attention.

Rugby : town (1991 pop. 59,039), Warwickshire, central England. An important railroad junction and engineering centre, Rugby is the seat of one of England's most esteemed public schools. Rugby School was founded in 1567 under the terms of the

will of Laurence Sheriff, a wealthy Rugby-born London merchant. Its present buildings date from the early 19th cent., when Rugby became well known under the headmastership of Thomas Arnold. His son Matthew Arnold wrote of the school in his poetry, and another Rugbeian, Thomas Hughes , wrote the schoolboy classic *Tom Brown's School Days*, which deals with life at Rugby. The sport of rugby originated at the school in 1823. Among the town's buildings is the war-memorial chapel, which commemorates the 682 residents who died in World War I.

২১. **South African War** : The British, after the appointment (1897) of Sir Alfred Milner as high commissioner for their South African territories, determined upon a showdown in defense of what they considered their commercial rights. Troops were dispatched from Britain, and, after Boer protestations were refused, the Transvaal and the Orange Free State declared war (Oct. 12, 1899). The Boer forces, well equipped by Germany, were larger than those immediately available to the British, and they scored impressive victories in the areas adjacent to the Boer territories. In the Cape Colony, Mafikeng was captured and Kimberley besieged; in Natal, Ladysmith was placed under siege. Reinforcements under the command of Sir Redvers Buller were sent from Britain.

Buller's failure to dislodge the Boers led to his replacement by Gen. Lord Roberts with Kitchener as his chief of staff. They landed in 1900 with heavy reinforcements and soon won victories; Kimberley and Ladysmith were relieved, and General Cronje was forced to surrender. Roberts advanced into the Orange Free State, captured its capital, Bloemfontein, and occupied the entire territory by May. By the end of June, Mafikeng had been relieved, the Transvaal invaded, and Johannesburg and Pretoria captured. The Boer states were formally annexed and Kruger, a fugitive in Europe, appealed in vain for help there.

Roberts, believing the war to be over, left South Africa and delegated the mopping up to Kitchener. The Boers, however, continued an extensive and coordinated guerrilla war. Under their leaders, including Smuts, De Wet, and Botha, they disrupted communications, attacked outposts and, with their intimate knowledge of the countryside, eluded capture Kitchener soon realized that final victory lay only in the systematic destruction of these guerrilla units. Boer women and children were herded into concentration camps (where many died), and chains of blockhouses were erected that cut off large areas. Dragnets of troops went through the guerrilla country section by section, and by 1902, the British force (about 350,000) had reduced to final submission the Boer troops (approximately 60,000). The Treaty of Vereeniging (May 31, 1902) ended hostilities.

Roberts, Frederick Sleigh, 1st Earl Roberts of Kandahar: 1832-1914, British field marshal. He joined the Bengal artillery in 1851 and fought with distinction in the Indian Mutiny (1857-58), earning the Victoria Cross. By 1875 he was quartermaster general of the Indian army and a strong advocate of the "forward" policy of controlling the Himalayan passes to forestall Russian encroachments; this became the general defensive policy of the British in India. He became a popular British hero for the relief of Kandahar in the second Afghan War (1878-80). Roberts was made commander in chief of the Madras army in 1880 and of the entire Indian forces in 1885. In 1893 he returned to England and wrote his reminiscences, *Fortyone Years in India* (1897). He became field marshal in 1895. In 1899, when the English were meeting reverses at the hands of the Boers in the South African War Roberts was appointed commander in chief. Aided by his chief of staff, Horatio Kitchener, Roberts reorganized the transport system, achieving a mobility that had been lacking. By late 1900 the war seemed near a successful conclusion, and Roberts was brought home, awarded an earldom, and appointed commander in chief of the British army His office was abolished in 1904, and thereafter he devoted himself to the advocacy of compulsory military service for home defense

২২. **Darwin, Charles Robert** : 1809-82, English naturalist, b. Shrewsbury; grandson of Erasmus Darwin and of Josiah Wedgwood (1730-95) . He firmy established the theory of organic evolution known as Darwinism . He studied medicine at Edinburgh and for the ministry at Cambridge but lost interest in both professions during the training. His interest in natural history led to his friendship with the botanist J. S. Henslow (1796-1861) ; through him came the opportunity to make a five-year cruise (1831-36) as official naturalist aboard the *Beagle*. This started Darwin on a career of accumulating and assimilating data that resulted in the formulation of his concept of evolution. He spent the remainder of his life carefully and methodically working over the information from his copious notes and from every other available source.
Independently, A. R. Wallace (1823-1913) had worked out a theory similar to Darwin's. Both men were exceptionally modest; they first published summaries of their ideas simultaneously in 1858. In 1859, Darwin set forth the structure of his theory and massive support for it in the superbly organized *Origin of Species*, supplemented and elaborated in his many later books, notably *The Descent of Man* (1871). He also formulated a theory of the origin of coral reefs.

Huxley, Thomas Henry : 1825-95, English biologist and educator, grad. Charing Cross Hospital, 1845. Huxley gave up his own biological research to become an influential scientific publicist and was the principal exponent of Darwinism in England. An agnostic he doubted all things not immediately open to logical analysis and scientific verification. He held up truth as an ideal and spoke and wrote frequently on its tool, the scientific method, and its yield, the evolutionary theory. He placed human ethics outside the scope of the materialistic processes of evolution; he believed that civilization is man's protest against nature and that progress is achieved by the human control of evolution. Huxley held numerous public offices, serving on 10 royal commissions (1862-84). His many works include *Evolution and Ethics* (1893), *Collected Essays* (9 vol., 1893-94), *Scientific Memoirs* (4 vol., 1898-1902), and an autobiography (1903).

Gladstone, William Ewart : 1809-98, British statesman, the dominant personality of the Liberal Party from 1868 until 1894. A great orator and a master of finance, he was deeply religious and brought a highly moralistic tone to politics. To many he represented the best qualities of Victorian England, but he was also passionately disliked, most notably by his sovereign, Queen Victoria and by his chief political rival, Benjamin Disraeli.·

Müller, Max : (Friedrich Maximilian Müller, Friedrich Max Müller, or Friedrich Max-Müller), 1823-1900, German philologist and Orientalist, b. Dessau; son of the poet Wilhelm Müller. After specializing in Sanskrit in Germany, he went to Oxford, where he lived for the remainder of his life. Müller did more than any other scholar to popularize philology and mythology, particularly in his lectures *Science of Language* (1861, 1863). He advanced the theory that myths originated from metaphors describing natural phenomena. Greatly interested in comparative religion, he wrote works on Indian religion and philosophy, including the standard edition of the *Rig-Veda with Commentary*(6 vol., 1849-73). From c.1875 until his death Müller was engaged in his greatest work, the editing of *Sacred Books of the East* (51 vol.), being translations of important Asian religious writings.

২৩. **Schiller, Friedrich von** : 1759-1805, The son of an army captain, Schiller attended the duke of Wattemberg's military academy, the Karlsschule, and was forced by the domineering duke to study medicine. After graduating in 1780 he became an army surgeon, attached to a military life he abhorred. Turning to writing, he created a striking attack on political tyranny in *Die Rauber* (1781), one of the great plays of the Sturm und Drang period. Its performance (1782) in Mannheim won him public

acclaim as well as the wrath of the duke, who forbade him to write.
Schiller fled from his post in Stuttgart and, after great deprivation, worked as a dramatist (1783-84) for the Mannheim theater. His second youthful success, *Don Carlos*, appeared in 1785 and was performed in revised form in 1787. While living in the great cultural centre of Weimar, Schiller wrote a history (1788) of the revolt of the Netherlands against Spain. This work, together with the mediation of Goethe, gained him (1789) a professorship of history at the Univ. of Jena (now Friedrich Schiller Univ. of Jena). In 1790 Schiller married the gifted writer Charlotte von Lengefeld. Plagued by poor health, Schiller rejected subsequent offers of positions and from 1793 to the end of his life lived in Weimar, enjoying the friendship of Goethe.

২৪. **Bacon, Francis** : 1561-1626, English philosopher, essayist, and statesman, b. London, educated at Trinity College, Cambridge, and at Gray's Inn. He was the son of Sir Nicholas Bacon, lord keeper to Queen Elizabeth I. Francis Bacon was a member of Parliament in 1584 and his opposition to Elizabeth's tax programme retarded his political advancement; only the efforts of the Earl of Essex led Elizabeth to accept him as an unofficial member of her Learned Council. At Essex's trial in 1601, Bacon, putting duty to the state above friendship, assumed an active part in the prosecution—a course for which many have condemned him. With the succession of James I, Bacon's fortunes improved. He was knighted in 1603, became attorney general in 1613, lord keeper in 1617, and lord chancellor in 1618; he was created Baron Verulam in 1618 and Viscount St. Albans in 1621. In 1621, accused of accepting bribes as lord chancellor, he pleaded guilty and was fined £40,OOO, banished from the court, disqualified from holding office, and sentenced to the Tower of London. The banishment, fine, and imprisonment were remitted. Nevertheless, his career as a public servant was ended. He spent the rest of his life writing in retirement. Bacon belongs to both philosophy and literature. He projected a large philosophical work, the *Instauratio Magna*, but completed only two parts, *The Advancement of Learning* (1605), later expanded in Latin as *De Augmentis Scientiarum* (1623), and the *Novum Organum* (1620). Bacon's contribution to philosophy was his application of the inductive method of modern science. He urged full investigation in all cases, avoiding theories based on insufficient data. He has been widely censured for being too mechanical, failing to carry his investigations to their logical ends, and not staying abreast of the scientific knowledge of his own day. In the 19th cent., Macaulay initiated a movement to restore Bacon's prestige as a scientist. Today his contributions are regarded with considerable resp In *The New Atlantis* (1627) he describes a scientific utopia that found partial realization with the organization of the Royal Society in 1660. His *Essays* (1597-1625), largely aphoristic, are his best-known writings. They are noted for their style and for their striking observations about life.

২৫. **Tenterden, Charles Abbott** : First Baron (1762-1832), lord chief justice of England, was born at Canterbury on October 1762, his father having been a hairdresser and wigmaker of the town. He was educated at Canterbury King's School and Corpus Christi College, Oxford, of which he afterwards became fellow and tutor.
He entered at the Middle Temple in 1787. For several years he practised as a special pleader under the bar, and was finally called at the Inner Temple in 1796. He joined the Oxford circuit and soon made rapid headway. In 1801 he was appointed recorder of Oxford. In 1802 appeared his *Law Relative to Merchant Ships and Seamen*, a concise and excellent treatise, which has maintained its position as an authoritative work. On the resignation of Lord Ellenborough in 1818 he was promoted to the chief justiceship of the king's bench. He died on the 4th of November 1832, and was buried, by his own desire, in the Foundling Hospital, London, of which he was a governor.

Arkwright, Sir Richard : 1732-92, English inventor. His construction of a machine for spinning, the water frame, patented in 1769, was an early step in the Industrial

Revolution. His machines and his gift for organization enabled him and his partner, Jedediah Strutt (1726-97), to establish huge cotton mills and thus helped to start the factory system. He became very wealthy and was knighted in 1786.

২৬. **Turner, Joseph Mallord William** : 1775-1851, English landscape painter, b. London. Turner was the foremost English romantic painter and the most original of English landscape artists; in watercolour he is unsurpassed. He received almost no general education but at 14 was already a student at the Royal Academy of Arts and three years later was making topographical drawings for magazines. In 1791 for the first time he exhibited two watercolours at the Royal Academy. In the following 10 years he exhibited there regularly, was elected a member (1802), and was made professor of perspective (1807). By 1799 the sale of his work had freed him from drudgery and he devoted himself to the visionary interpretations of landscape for which he became famous. In 1802, Turner made a trip to the Continent, where he painted his famous *Calais Pier* (National Gall., London). From then on he travelled constantly in England or abroad, making innumerable direct sketches from which he drew material for his studio paintings in oil and watercolour. Turner showed a remarkable ability to distill the best from the tradition of landscape painting and he helped to further elevate landscape (and seascape) as important artistic subject matter. The influence of the Dutch masters is apparent in his *Sun Rising through Vapour* (National Gall., London). In the vein of the French classical landscape painter, Claude Lorrain, he produced the *Liber Studiorum* (1807-19), 70 drawings that were later reproduced by engraving under Turner's supervision. Among the paintings evocative of Claude's style are his *Dido Building Carthage* (National Gall., London) and *Crossing the Brook* (Tate Gall., London). Despite his early and continued success Turner lived the life of a recluse. As his fame grew he maintained a large gallery in London for exhibition of his work, but continued to live quietly with his elderly father. Turner's painting became increasingly abstract as he strove to portray light, space, and the elemental forces of nature. Characteristic of his later period are such paintings as *The Fighting Téméraire* and *Rain, Steam, and Speed* (both: National Gall., London). His late Venetian works, which describe atmospheric effects with brighter colours, include *The Grand Canal* (Metropolitan Mus.) and *Approach to Venice* (National Gall., Washington, D.C.). Turner encountered violent criticism as his style became increasingly free, but he was passionately defended by Sir Thomas Lawrence and the youthful Ruskin. Visionary, revolutionary, and extremely influential, these late paintings laid the groundwork for impressionism, postimpressionism, abstract expressionism, colour-field painting, and a myriad of other art movements of the late 19th and 20th cents. Turner's will, which was under litigation for many years, left more than 19,000 watercolours, drawings, and oils to the British nation. Most of these works are in the National Gallery and the Tate Gallery, London. Many of Turner's oils have deteriorated badly.

২৭. **Cook, James** : 1728-79, English explorer and navigator. After an apprenticeship to a firm of shipowners at Whitby, he joined (1755) the royal navy. He surveyed the St. Lawrence Channel (1760) and the coasts of Newfoundland and Labrador (1763-67). Cook was then given command of the *Endeavour* and sailed (1768) on an expedition to chart the transit of Venus: he returned to England in 1771, having also circumnavigated the globe and explored the coasts of New Zealand, which he accurately charted for the first time, and E Australia. He next commanded (1772-75) an expedition to the South Pacific of two ships, the *Resolution* and the *Adventure*. On this voyage he disproved the rumour of a great southern continent, explored the Antarctic Ocean and the New Hebrides, visited New Caledonia, and by the observance of strict diet and hygiene prevented scurvy, heretofore the scourge of long voyages. Cook sailed again in 1776; in 1778 he visited and named the Sandwich Islands (Hawaii) and unsuccessfully searched the northwest coast of North America for a Northwest Passage. On the return voyage he was killed by natives on the island of

Hawaii.

২৮. **Burns, Robert** : 1759-96. The son of a hard-working and intelligent farmer, Burns was the oldest of seven children, all of whom had to help in the work on the farm. Although always hard pressed financially, the elder Burns, until his death in 1784, encouraged his sons with their education. As a result, Burns as a boy not only read the Scottish poetry of Ramsay and the collections compiled by Hailes and Herd, but also the works of Pope, Locke, and Shakespeare. By 1781, Burns had tried his hand at several agricultural jobs without success. Although he had begun writing, and his poems were circulated widely in manuscript, none were published until 1786. At this time he had already begun a life of dissipation, and he was not only discouraged but poor and was involved simultaneously with several women.

Burns decided to marry Mary Campbell and migrate to Jamaica. To help finance the journey, he published at Kilmarnock *Poems, Chiefly in the Scottish Dialect* (1786), which was an immediate success. Mary Campbell died before she and Burns could marry, and Burns changed his mind about migration. He toured the Highlands, brought out a second edition of his poems at Edinburgh in 1787, and for two winters was socially prominent in the Scottish city. In 1788 he married Jean Armour, who had borne him four children, and retired to a farm at Ellisland. By 1791 Burns had failed as a farmer, and he moved to nearby Dumfries, where he held a position as an exciseman. He died at 37 after a severe attack of rheumatic fever.

Jonson, Ben : 1572-1637, English dramatist and poet, b. Westminster, London. The high-spirited buoyancy of Jonson's plays and the brilliance of his language have earned him a reputation as one of the great playwrights in English literature. His first important play, *Every Man in His Humour* was produced in 1598, with Shakespeare, in the cast. Jonson's great period, both artistically and financially, began in 1606 with the production of *Volpone*. This was followed by his three other comic masterpieces, *Epicoene* (1609), *The Alchemist* (1610), and *Bartholomew Fair* (1614). He became a favourite of James I and wrote many excellent masques for the court. His final plays were failures, and with the accession of Charles I in 1625 his value at court was less appreciated. Jonson exerted a strong influence over his contemporaries. Examples of his conversation weie recorded in *Conversations with Ben Jonson* by Drummond of Hawthornden (1585-1649).

২৯. প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটির নাম "হিন্দুপত্নী" নয়, "দুইটি হিন্দুপত্নী" (পৃ. ৩৩-৪৪)। চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)-প্রণীত 'ত্রিধারা' নামক প্রবন্ধপুস্তকে এই রচনাটি আছে। 'ত্রিধারা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে, বইটি 'কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত' হয়েছিল।

৩০. কলিকাতার শিল্পসমিতি [বিধবা-শিল্পাশ্রম] : আশ্রমটি সখিসমিতির অনুক্রম। সখিসমিতির উদ্দেশ্য সঞ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সালে রূপান্তরিত আকারে বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুকাল (১৯২৫) পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এর নামকরণ হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম'। এরপর স্বর্ণকুমারী দেবীর অধ্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে থাকে। স্বর্ণকুমারী ১৯৩১ সালে তাঁর রচিত যাবতীয় গ্রন্থস্বত্ব এই সমিতিকে দান করেন।

পুনার হিন্দু বিধবাশ্রম বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : "পুনার হিন্দু বিধবাশ্রম", 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩১৩, পৃ. ৬৩০-৬৩৫ [সচিত্র এবং অস্বাক্ষরিত]।

সারদা সদন : After sailing from San Francisco, Ramabai reached India in February

1889. She settled down ... in Mumbai and almost immediately, on 11th March 1889, opened a widow's home, the Sharada Sadan (Home of Learning), at Chowpatty The enormous venture underscored Ramabai's enterprising spirit, organizational capability and nationalistic credentials and generated excitement in which her conversion was at least temporarily forgotten. All leading social reformers of the Bombay Presidency supported the Sadan; many such as Ranade, Bhandarkar and Telang, served on its Advisory Board.

In November 1890, the Sadan was shifted to Pune for reasons of economy and direct access to the orthodox Brahmin community, a move that sharpened the conservative attack on its secular credentials and for its perceived 'pampering' of widows. In 1891, a storm broke out over allegations of proselytization—a sensitive issue that snow balled rapidly into a regular verbal warfare with all prominent newspapers of the time engaging in 'investigative journalism' by trying to collect information from current or past inmates of the Sadan. In its bitter aftermath, members of the Advisory Board resigned, and most girls were withdrawn from the Sadan by their guardians. The Ramabai Association of Boston sent Mrs. Andrews, chairperson of the Executive Committee, to inquire into the matter. Ramabai was exonerated, but the breach between her and mainstream Hindu society—and later, even the social reformers—never healed.

[Meera Kosambi (compiled and edited, with translations): *Pandita Ramabai Through Her Own Words: Selected Works*, New Delhi, OUP, 2000, introduction, p 10-13]

৩১. **হেমলতা দেবী (ঠাকুর, ১৮৭৩-১৯৬৭)** : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী ছিলেন। তাঁর বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি পিতৃগৃহ ও শ্বশুরালয়ে সমান উৎসাহ পেয়েছিল। তিনি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে যশস্বিনী হন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'জ্যোতিঃ' (১৩১৭ : বইটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথের), 'অকল্পিতা' (১৩১৯ : বইটির নামকরণ দ্বিজেন্দ্রনাথের)। গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'দুনিয়ার দেনা' (১৯২৫ : কৃষ্ণভাবিনী দাসের নামে উৎসর্গীকৃত), 'দেহলি' (১৩৪৭ : বইটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথের)। প্রবন্ধ-পুস্তক 'মেয়েদের কথা' (১৩৩৬) সুপরিচিত। তিনি সরোজনলিনী-নারীমঙ্গলসমিতির সম্পাদিকা, পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের পরিচালিকা ও 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার পান।

৩২. **দেবেন্দ্রনাথ দাস** (২১.৪.১২৬৩-১৩১৫ ব.) :— পিতা : কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল শ্রীনাথ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। বি.এ. পাশ করে বিলাতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পাশ করলেও নিয়ম অনুসারে বয়স বেশি বলে কাজে যোগ দিতে পারেননি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। বিলেতযাত্রার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হন। পাঁচ মাস পর সস্ত্রীক বিলাত চলে যান। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী শেখানোর জন্য একটি স্কুল খোলেন। এই সময়ে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থতার জন্য দেশে ফিরে সিটি ও রিপন কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। পরে নিজে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল ও 'সেঞ্চুরী' কলেজ খুলেছিলেন। আর্থিক অসুবিধার জন্য দুটিই পরে বন্ধ হয়ে যায়। ইতালীয় ভাষা থেকে 'মিরোগী' নামে একটি বাংলায় অনুবাদ করেন। রচিত 'পাগলের কথা' গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী। তিনি এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার অনেকগুলি নোট লিখেছিলেন। লেখিকা ও সমাজসেবী কৃষ্ণভাবিনী তাঁর স্ত্রী। 'সময়' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ তাঁর দুই ভ্রাতা।

৩৩. **'জীবনের দৃশ্যমালা'**। ইংলণ্ডে "বঙ্গমহিলা"র লেখিকা-প্রণীত। কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়ম্‌স্ লেন দাস যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রকাশতারিখ ১৩১৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০৩। স্বামী দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে এই কবিতার বইটি—তাঁর রচিত কবিতার একমাত্র সংকলনটি—কৃষ্ণভাবিনী উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ অংশটি নিচে মুদ্রিত হল :

উৎসর্গ

*দেবেন্দ্রনাথ দাস।

শ্রীচরণেষু।

প্রিয়তম!

সংসারে বাসকালে দুজনে যখন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সাম্যভাবের কথা উঠিত, তুমি বলিতে, "আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়াছে, তারা কিছুতেই স্বামীর সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ব্যবহার করিতে পারে না।" আমি বলিতাম—তোমরা এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া যতই আমাদের পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে ইচ্ছা কর না কেন ও নারীজাতির প্রতি উন্নত ব্যবহার কর না কেন—যে হিন্দু স্বামী একবার হিন্দু ভার্য্যার পতি পূজার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সে দেবতার সিংহাসন ছাড়িয়া কখনই 'সখা'র পদে নামিতে চাহিবেন না। তখন তুমি হাসিয়া বলিতে—সে কথা ঠিক। আজ এক বৎসর হইল তুমি এ মর জগতের নশ্বর দেহ ত্যজিয়া অনন্ত রাজ্যের আরো উচ্চ দেবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছ; তোমার গলায় দিয়া পূজা করিবার জন্য আমার জীবনের ঘটনাগুলি লইয়া যে মালা গাঁথিয়াছিলাম, আজ তোমার চরণে সেই 'দৃশ্যমালা' অঞ্জলি দিতেছি—লও।

চিরকাল তোমারি

২৭শে পৌষ। ১৩১৬ সাল।

মৃত্যুদিন—২৭শে পৌষ। ১৩১৫ সাল।

৩৪. **সরোজকুমারী দেবী** (১৮৭৫-১৯২৬) : ভাগলপুরে জন্ম। পিতা মথুরানাথ গুপ্ত সাবজজ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন নামকরা উপন্যাস ও গল্প-লেখক। ১৮৮৬ সালে কলুটোলার সেন-পরিবারের যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সরোজকুমারীর বিবাহ হয়। যোগেন্দ্রনাথ ওড়িশার সম্বলপুরের সরকারী উকিল ছিলেন। 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫) সরোজকুমারীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'অশোকা' (১৯০১) এবং 'শতদল' (১৯১০)। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলির নাম : 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প' (১৩১২), 'ফুলদানি' (১৯১৫) ইত্যাদি।

৩৫. **আক্ষেপ**। /দুঃখিনী বেদনা, অনাথা রোদন।/না শুনে যদি রে, মানব নিচয়,/সকলের উচ্চ, আছে একজন,/শুনিছেন সব, হইয়ে সদয়।।/স্বর্গীয় তিলোত্তমা দাসী-লিখিত।/১৩২০ সাল।/কলিকাতা,/৪ নং উইলিয়ম্‌স্ লেন।/দাস-যন্ত্রে,/শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/পৃষ্ঠা সংখ্যা ; ১৫৬।

সূচি : ভাঙ্গিল স্বপন মোর, তত্ত্ব কুসুম, পতির উদ্দেশে, পুত্র জন্ম দিন [১৩০০ সাল, ১১ই পৌষ রাত্রি এগারটা।], কোন বন্ধুর প্রতি, মার প্রতি, মা দুর্গার প্রতি, শায়িত শয্যায়, স্বামী, উচ্ছ্বাস, বাল্যকাল, সংসার, কাঁদে প্রাণ, মান অপমান [বেলঘরিয়ার বাগানে বসিয়া।], ফুল, চিন্তা, সাবিত্রী, স্বামীর প্রতি, ঋতু বর্ণনা, বারেক বলহে, বড় জ্যেঠামহাশয়ের বিয়োগ, শকুন্তলা, বড় ভালবাসি, মায়া, পতির উদ্দেশে, দেখি কোথা পাই এ ভবের কূল, দুর্গোৎসব,

হিমালয়ের অংশ দার্জ্জিলিং, ঈশ্বর বন্দনা, অশ্রুধারা, কাঞ্চনজঙ্ঘা [বর্ষায়], দিন যায়, শিশুর হাসি, প্রকৃতি রাণী, স্বপ্নদেবী, প্রশান্ত মূরতি, [৩৫ অক্ষরে] স্বামীর উদ্দেশে, দয়াময়, শুধু মম কথা, শেষে ডাকিহে তোমায়, দয়া ও শান্তি, ভ্রান্ত পথিক, যমুনা তটিনী, স্বার্থ, অট্টালিকা ও কুটীর, স্নেহের ভ্রাতা [শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহ উপলক্ষে লিখিত। ১৩০৬ সন : ২৮এ বৈশাখ।], কাশীধাম [১৩০৬ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে কাশীতে বসিয়া লিখিত], শোকের উচ্ছ্বাস [১৩০৬ সাল ১৫ই মাঘ রবিবার। পূজ্যপাদ শ্বশুর ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গলাভ উপলক্ষে লিখিত।], শ্রীমান নিরঞ্জন মিত্রের বিবাহ উপলক্ষে লিখিত [সন ১৩০৮ ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার।], স্তোত্র, ভক্তি দে মা!, শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দাসীর বিবাহ উপলক্ষে লিখিত [১৩০৯ সন, ৬ই মাঘ, মঙ্গলবার।], কোথা তুমি দয়াময়, মাতৃরূপা, জগদ্ধাত্রীরূপা, যোড়শীরূপা, কালীরূপা, তারারূপা, ভুবনেশ্বরীরূপা, ভৈরবীরূপা, ছিন্নমস্তারূপা, ধূমাবতীরূপা, বগলামুখীরূপা, মাতঙ্গীরূপা, কমলারূপা, অন্নপূর্ণারূপা, শিব বন্দনা, বিষ্ণু বন্দনা, গঙ্গা বন্দনা, ব্যঞ্জনবর্ণে নাম জপ, ধর্ম্ম বন্দনা, অনাথ বালিকা, অনুযোগ, শূন্য প্রাণ, আমি কার, তুমি কি আমার প্রাণের ঈশ্বর।

কাব্যপুস্তিকাটির প্রারম্ভে তিলোত্তমা দাসীর মা কৃষ্ণভাবিনী একটি মুখবন্ধ লিখেছেন। লেখাটি এরকম :

> মা! তুমি জীবনে সতী স্ত্রীর যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছ, তাহা হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজমান, কিন্তু তুমি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরকম মনস্তাপ ও আক্ষেপের ভিতরে বত্রিশ বৎসর কাটাইয়া গিয়াছে সে রকম ঘটনা সংসারে প্রায় দেখা যায় না। সেই আজীবন কষ্টের ভিতরেও তুমি যে সারবস্তু ধর্ম্মকে চিনিতে পেরেছিলে, জগৎকে সেইটুকু দেখাবার জন্য তোমার কবিতাগুলি ছাপালাম। জীবনে ত তোমার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই, এখন আর কিছুই করিবার নাই। তোমার স্মৃতি রক্ষা ও সেই স্মৃতি স্মরিয়া অভাগিনী স্ত্রীলোকদের অশ্রু মুছাবার চেষ্টা জীবনের ব্রত করিয়াছি, ভগবান আমায় বল দিন এই প্রার্থনা।
>
> তোমার দুঃখিনী মা।

৩৬. **পাগলের কথা।**/ দেবেন্দ্রনাথ দাস-প্রণীত।/(ডি. এন. দাস. বি. এ. কেম্ব্রিজ।)/"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই/পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"/কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন,/দাস যন্ত্রে/শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১৩১৭ সাল।/মূল্য—১ , এক টাকা।/পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৭৯।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস-লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

সূচি : প্রথম অধ্যায় (শিশুকাল), দ্বিতীয় অধ্যায় (মামার বাড়ী), তৃতীয় অধ্যায় (যমদূত শিক্ষক), চতুর্থ অধ্যায় (পাঠ-তৃষ্ণা), পঞ্চম অধ্যায় (স্কুল ও স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী), ষষ্ঠ অধ্যায় (ভেল্কিখেলা), সপ্তম অধ্যায় (জগদম্বা), অষ্টম অধ্যায় (ইতিহাস), নবম অধ্যায় (শ্বশুরবাড়ী), দশম অধ্যায় (বিদ্যাশিক্ষা), একাদশ অধ্যায় (ভ্রমণ), দ্বাদশ অধ্যায় (আরাবলী), ত্রয়োদশ অধ্যায় (মা), চতুর্দ্দশ অধ্যায় (চাকরী), পঞ্চদশ অধ্যায় (নূতন জীবন), ষষ্ঠদশ অধ্যায় (সংসার-খেলা), সপ্তদশ অধ্যায় (প্রলাপ-বাক্য)।

৩৭. **Marenholtz-Bülow, Baroness Bertha von** : The advancement of kindergarten education was a major focus for the energies of female reformers in Germany during the 1848 revolution and the rest of the nineteenth century Friedrich Froebel (1782-1852), an educator and philosopher who had studied with Swiss pedagogue Johann Heinrich Pestalozzi, formulated the educational philosophy of the kindergarten He founded the first kindergarten in Blankenburg, Thuringia in 1840. The kindergarten differed from existing preschool institutions, most of which were church-run day-care centres These institutions provided chiefly custodial services for the children of the

very poor. Their pedagogy was based on traditional Christian doctrines of original sin, and their teaching staff was largely male; beginning in the 1830s, Protestant deaconesses were also sometimes employed in these institutions. Froebel, having failed to interest the male-dominated teaching profession in his ideas, called upon women to staff the kindergarten. Strongly believing that child rearing skills, though resting on an innate mat ial instinct, must nonetheless be developed through training, he set up the first institute to train women kindergarten teachers at Keilhau, Thuringia in the early 1840s.

Meanwhile, 31 kindergartens were founded, many by women's organizations, in German cities between 1848 and 1852. The women who staffed these institutions expressed the utopian spirit of this era by their commitment to overcoming class differences. Unlike other educational institutions, many kindergartens were open to children of all social classes and religious denominations, Jewish as well as Christian. The kindergarten movement also influenced the most radical experiment in women's education of the revolutionary period, *Hochschule für das weibliche Geschlecht*. Hamburg citizens Emilie Wüstanfeld, Johanna Goldschmidt (1806-84), and Bertha Meyer Traun (1818-63) founded the academy in 1849. Thus the kindergarten movement became associated with radical feminist movements. For this reason, the conservative regime that crushed the revolutionary movement in Prussia issued an order prohibiting all Froebel kindergartens in 1851. The decree, promulgated by Prussian minister of culture and education Karl von Raumer, condemned the kindergarten as a centre of atheistic and socialist subversion. Many other German states followed the Prussian example.

After the ban, kindergarten founder Bertha von Marenholtz-Bülow(1811-93) embarked on an ambitious campaign to spread the kindergarten to other European countries. She helped to found kindergartens in England, France, Belgium and Italy before returning Berlin after the recision of the kindergarten ban to set up charity kindergartens and a training school in Berlin (the school was later moved to Dresden). German liberal activists who went into exile after the failure of the Revolution introduced the kindergarten to other countries. Thus, the kindergarten movement became an international network, encouraging contact and cooperation among female reformers in many different countries. Meanwhile, the 1860s and 1870s were a period of renewed activism for German kindergarten founders, some of whom, like Henriette Goldschmidt (1825-1920) became leaders within the national feminist organization, the General Association of German Women. Froebelian views of women's social mission thus had a considerable influence on the later development of German feminism.

৩৮. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১) : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। ১৮৫৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সহযোগিতায় জ্ঞানদানন্দিনী ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধিকারের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। তিনি বঙ্গমহিলাদের মধ্যে একটি উল্লেখনীয় নতুন প্রথার সূচনা করেন—সেটি হল, নতুন ধরনে শাড়ি পরা। বঙ্গসাহিত্যের সেবায় তিনি তৎপর ছিলেন। 'ভারতী'-তে নানা সময়ে তাঁর কিছু গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। বৈশাখ ১২৯২ থেকে এক বছর তিনি 'বালক' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখা দুখানি শিশুপাঠ্য নাটিকা হল : 'টাক ডুমা ডুম্ ডুম্' (১৯১০) এবং 'সাত ভাই চম্পা' (১৯১১)।

[টীকা নং ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ৩৭-এর জন্য দ্রষ্টব্য www.encyclopedia.com. অন্যান্য টীকাগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে, কয়েক স্থানে টীকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।]